Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাজিয়া সুলতানা

রোলঃ 227021776

২৭ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাজিয়া সুলতানা
রোলঃ 227021776

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সিরাহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাজিয়া সুলতানা, আইডিঃ 227021776 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সিরাহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রাজিয়া সুলতানা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

রাজিয়া সুলতানা

আইডিঃ 227021776

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী 1
সীরাহ অধ্যায়নের প্রয়োজনীয়তাঃ..2
সীরাহ-র উৎসঃ..7
সীরাহশাস্ত্র ও হাদীসশাস্ত্রের পার্থক্য 8
পবিত্র জন্ম 8
রাসূল সাঃ এর নামসমূহঃ 9
রাসূল (সা) এর দৈহিক গঠন ও অবয়বঃ..12
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য...14
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবন-জীবিকা সম্পর্কে..18
রাসূল (সা) এর দিনলিপি ও দৈনন্দিন আমল..20
রাসূল (সা) এর সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন 27
সাদ গোত্রের অবস্থান...33
রাসূল সাঃ কর্তৃক ছাগল চরানো- সকল নবীর সুন্নাহঃ 33
বক্ষবিদারণের ঘটনা...35
আমিনার মৃত্যু ও দাদার কোলে শিশু মুহাম্মাদ সাঃ...36
চাচা আবু তালিবের সাথে বাণিজ্য সফরে শাম গমনঃ..36
হারবুল ফুজ্জার (ফিজার যুদ্ধ-Evil War): 37
নবীজির বৈবাহিক জীবন 41
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর যৌবনকালে কাবা ঘর পুনঃনির্মাণের বর্ণনাঃ 42
নবুওয়াত ও রিসালাতের শীতল ছায়ায়...44
সাময়িকভাবে ওহী আসা বন্ধ হয়ে যাওয়াঃ...48
একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাঃ 49

ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দলঃ 51
প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম আহ্বানঃ...52
প্রকাশ্যে দাওয়াতের দ্বিতীয় আহ্বানঃ..53
হজযাত্রীদের কে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত:...54
রাসূল (সাঃ) এর সাথে উতবা ইবনে রাবিয়ার আলোচনাঃ 55
ইহুদী আলিমদের কাছে কুরাইশদের গমনঃ...57
কুরাইশ নেতাদের গোপনে কুরআন পাঠ শ্রবণঃ 58
আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতঃ 59
হিজরতের ভূমি হিসেবে কেন আবিসিনিয়াকে পছন্দ করা হলঃ 60
একটি ভুল বোঝাবুঝি ও মুহাজির সাহাবীদের খেসারতঃ....................................61
আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতঃ 62
আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমদের থেকে আমাদের জন্য শিক্ষাঃ 66
হামজা ও উমার রাঃ এর ইসলাম গ্রহণ..67
বয়কট 68
বয়কটের অবসান 69
বয়কটের ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষাঃ..71
দুঃখের বছর 72
তায়েফের ঘটনাবলী...74
ইসরা ও মিরাজঃ..79
আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনটি হাদিয়াঃ...83
আবু বকর রাঃ এর 'সিদ্দীক' উপাধি লাভঃ...84
বিভিন্ন গোত্রের প্রতি দাওয়াত,...85
ইয়াসরিবের সূর্যোদয়-খাজরাজের ৬ জন যুবকের ইসলাম গ্রহণঃ 85
বুআস যুদ্ধ-কিছু কথাঃ..86

আকাবার প্রথম শপথ (বাইয়াতুল আকাবা আল উলা) بيعة العقبة الأولى 86
আকাবার দ্বিতীয় শপথ (বাইয়াতুল আকাবা আস সানিয়াহ) بيعة العقبة الثانية..................88
হিজরতের পটভূমিঃ 90
মদিনার পথে যাত্রাঃ 99
মদিনায় প্রবেশঃ..100
তৎকালীন মদীনার অবস্থাঃ 102
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রজেক্ট 104
সামরিক অভিযানের শুরুঃ..112
বদর যুদ্ধের পূর্ববর্তী সারিয়াসমূহঃ..113
যুদ্ধের ঘনঘটা..114
যুদ্ধমঞ্চ: বদর 117
উহুদের যুদ্ধঃ প্রেক্ষাপট ও প্রস্তুতি 121
বী'রে মা'উনার ট্রাজেডিঃ..139
খন্দক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটঃ...143
যুদ্ধকালীন ঘটনাবলীঃ..145
ইফক্বের ঘটনাঃ 153
হুদায়বিয়ার সন্ধিঃ প্রেক্ষাপট...157
হুদাইবিয়ার সন্ধির দফাসমূহ...161
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নবীজির চিঠি..165
খাইবারের যুদ্ধঃ কারণ, যুদ্ধের ঘটনাবলী ও ফলাফল.................................166
সন্ধির প্রস্তাবনা 170
খাইবার যুদ্ধঃ কিছু টুকরো ঘটনা, খায়বার পরবর্তী সামরিক অভিযানসমূহ এবং কাযা উমরাহ পালন..172
মুতাহর যুদ্ধঃ প্রেক্ষাপট, ফলাফল ও শিক্ষা,..178

মক্কা বিজয়ঃ প্রেক্ষাপট ও অভিযান..182
মক্কা বিজয়ঃ বিজয়, সাধারণ ক্ষমা ও কালো তালিকা..187
কুরাইশ নেতাদের ইসলাম গ্রহণ, মূর্তি ভাঙতে প্রতিনিধি প্রেরণ ও মক্কা বিজয় থেকে শিক্ষা
....193
হুনাইনের যুদ্ধঃ প্রেক্ষাপট, প্রস্তুতি ও কিছু ঘটনা 197
তাবুকের যুদ্ধঃ পটভূমি ও যুদ্ধ প্রস্তুতি..204
সীরাতে নববীর আলোকে একজন আদর্শ নেতৃত্বের গুণাবলী...215
সীরাতে নববীর আলোকে একজন দা'ঈর কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যসমূহ...................................216
বিদায় হজ্ব ও এর শিক্ষা 219
সর্বশেষ সামরিক অভিযানঃ 224
জীবনসায়াহ্নে নবীজি (সা) ও তাঁর ইন্তিকাল 225

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ، أَمَّا بَعْدُ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী

ভূমিকা

সীরাহ] سِيرَة [শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা। সীরাহ বলতে এমন একটি পথ বুঝায় যার উপর দিয়ে একজন ব্যক্তি তার জীবনভর হেঁটে চলতো। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে জানা হয়, ততক্ষণ মূলত ওই ব্যক্তির জীবনপথেই ভ্রমণ করা হয়।

সীরাহ বলতে শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনী বোঝায় না বরং তা দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির জীবনীকেই বোঝানো যাবে। কিন্তু মুহাম্মাদ সাঃ -এর জীবনীর সাথে সীরাহ শব্দটি এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, সীরাহ বলতে অধিকাংশ সময় আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর জীবনীকেই বোঝানো হয়।

পবিত্র সিরাতের সান্নিধ্য :কেন ও কিভাবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর পবিত্র সিরাত পাঠের সময় তার মহান পরিচয় মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। খাতা মুন্না বিন রহমাতুল্লিল আলামিন। সমগ্র মানবতার তিনি মহান শিক্ষক। মানুষের চেতনা বিশ্বাস স্বভাব চরিত্র আচার-আচরণ সবকিছুর জন্য তিনি সর্বোত্তম আদর্শ। এই পৃথিবীতে বারবার তার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তার আদর্শের সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। এই রোগাক্রান্ত পৃথিবীর মুক্তির কোন উপায় নেই।

কেমন ছিলেন তিনি? কি ছিল তার জীবন আদর্শ? এক কথায় এই প্রশ্নের জবাব -

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।'সূরা কালাম ৬৮ :8

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ.

অর্থাৎ তিনি ছিলেন (বাস্তব) কুরআন।২

কুরআন মাজিদে আদর্শ মানুষের বিশ্বাসও ব্যক্তিত্বের যে রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে, তিনি ছিলেন তারই বাস্তব দৃষ্টান্ত। তার পবিত্র জীবন আদর্শের আলোকেই কুরআনকে বুঝতে হবে। সেইভাবে জীবন ও কর্মকে গড়ে তুলতে হবে। তিনি আল্লাহ অভিমুখী বান্দাদের সর্বোত্তম আদর্শ। কুরআন নাযিলের সময় যেমন ছিল, দেড় হাজার বছর পরও তার জীবন আদর্শ প্রাসঙ্গিক ও অনিবার্য। কেয়ামত পর্যন্ত তা এরকমই অনিবার্য ও প্রাসঙ্গিক থাকবে।সব যুগের সকল মানুষের জন্য তিনি অনিবার্য।

সীরাহ্ অধ্যায়নের প্রয়োজনীয়তাঃ

১।সীরাহ অধ্যায়ন করা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশঃ

রাসূল সাঃ এর সীরাহ অধ্যায়ন করা নিছক শখের বিষয় নয় কিংবা আগ্রহের বশে জানার বিষয়ও নয়। বরং তা আল্লাহর সরাসরি

নির্দেশ। **আল্লাহ বলেন-**

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অর্থঃ যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর সাঃ মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (সূরা আল আহযাব, ৩৩:২১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও

কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (সূরা আন নিসা, ৪:৫৯) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي

قُلْ وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الأمي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ৃ আমি আল্লাহ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তার রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস

স্থাপন করো আল্লাহর উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল

পথপ্রাপ্ত হতে পার। (সূরা আল আরাফ, ৭:১৫৮)

তাই রাসূল সাঃ কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হলে তাঁর সীরাহ অধ্যায়নের কোন বিকল্প নেই।

২। সীরাহ অধ্যায়ন করলে রাসূল সাঃ এর প্রতি মুমিনদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়ঃ

সীরাহ অধ্যায়ন করলে আমরা দেখব রাসুল সাঃ এর জীবন কত বৈচিত্র্যময়, কত ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ আর এসবের মাঝেও তিনি কত সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গেছেন। আমরা দেখব তিনি একদিকে যেমন বাতিলের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন ঠিক তেমনি মদীনার রাস্তায় শিশুদের হাত ধরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, শিশুদের নামের সাথে মিলিয়ে কবিতা পড়ে তাদেরকে হাসিয়েছেন, নাতিকে নিজ পিঠের উপর বসিয়ে ঘোড়া হয়ে তাদের সাথে খেলেছেন, সাহাবীদের দ্বীনের যাবতীয় আক্বীদা-আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন আবার একই সাথে স্ত্রীর সাথেও দৌড় প্রতিযোগীতা করেছেন। সারাটা জীবন তাহাজ্জুদে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের হিদায়াতের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সালাতে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে দাড়ি ভিজিয়েছেন আবার সেই মানুষটাই মৃত্যুর সময় আল্লাহর কাছে "উম্মাতি উম্মাতি" করে ফরিয়াদ করেছেন। এমন বহুমাত্রিক অসাধারণ জীবন যে মানুষটার তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানলে তাঁকে ভালো না বেসে কি পারা যায়?

৩। সীরাহ অধ্যায়ন করা কুরআন বুঝতে সহায়কঃ

রাসূল সাঃ এর জীবনী অধ্যায়ন করলে তা আমাদেরকে কুরআন বুঝতে সহায়তা করবে। সীরাহ অধ্যায়ন করলে আমরা জানতে পারব যে, সূরা আলে ইমরান এর যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতগুলি উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, সূরা আনফালের যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতগুলি বদর যুদ্ধের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, সূরা দুহা নাযিল হয়েছে রাসূল সাঃ এর কাছে সাময়িকভাবে ওহী আসা বন্ধ থাকার প্রেক্ষিতে, সূরা আহযাবের অধিকাংশ আয়াত নাযিল হয়েছে খন্দকের যুদ্ধের প্রেক্ষিতে, নাযরান থেকে আগত একটি বড়সড় খৃস্টান প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথোপকথনে সমর্থন যোগানোর জন্য সূরা আলে ইমরানের অনেকগুলি আয়াত নাযিল হয় ইত্যাদি। একমাত্র সীরাহ অধ্যায়ন করার মাধ্যমেই আয়াতগুলোকে যথাযথ পরিস্থিতির নিরিখে বোঝা সম্ভব।

৪। সীরাহ অধ্যায়ন করা হাদীস বুঝতে সহায়কঃ

সীরাহ অধ্যায়ন করলে তা কুরআনের সাথে সাথে হাদীস বুঝতেও সহায়ক হয়। হাদীসের গ্রন্থগুলিতে রাসূল সাঃ এর জীবনের খণ্ডিত ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি হাদীস একত্র করে একটি ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। তাই হাদীসের বিধিবিধান ও শিক্ষাকে উপলব্ধি করার জন্য রাসূল সাঃ এর সীরাহ-র উপর দখল থাকা জরুরি।

৫। সীরাহ আমাদের জীবনে আশার আলো ও উন্নত জীবনের প্রেরণা যোগায় এবং মুসলিম হিসেবে নিজেদের পরিচয় উপলব্ধি করতে সহায়তা করেঃ

বর্তমানে সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ যখন চরমভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত, মুসলিমদের জীবন যখন পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিকভাবে হতাশা ও সমস্যায় জর্জরিত তখন রাসূল সাঃ এর সীরাহ আমাদের জীবনের জন্য হতে পারে আশার আলোকবর্তিকা, আমাদের দেখাতে পারে উন্নত জীবনের প্রেরণা, আত্মপরিচয় উপলব্ধির মাধ্যম।

কুরআনে আল্লাহ অনেক জায়গায় পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের কথা ও দাওয়াতের পথে তাদের বাধা-বিপত্তির কথা রাসুল সাঃ কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁকে সাহস ও আশা দেওয়ার জন্য। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের জীবনী যেমন রাসূল সাঃ এর জন্য আশার উপকরণ ছিল, তেমনি রাসূল সাঃ এর জীবনের পরতে পরতে আমাদের জন্য রয়েছে আশার উপকরণ।

৬। সীরাহ রাসূল সাঃ এর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা ও নবুওয়াতের প্রমাণঃ

রাসূল সাঃ এর পুরো জীবনটাই তাঁর সবচেয়ে বড় মুজিযা। অনাচার-ব্যভিচার-যুদ্ধ-বিগ্রহ-অশিক্ষা-অজ্ঞতা-খুন ও মূর্তিপূজার অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি বর্বরতম সমাজ থেকে একদল মানুষ তাদের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করে কীভাবে মাত্র ২৩ বছরের মাথায় সমগ্র আরবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং রোমান সভ্যতার দরজায় করাঘাত করেছিল, ৩০ বছরের মাথায় তৎকালীন পারস্য সভ্যতাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এবং আর মাত্র ১০০ বছরের মাথায় সারা বিশ্বে ইসলামের শাসন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তা

ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে উপায় নেই। যত বড় বুদ্ধিজীবীই হোক না কেন, মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোন প্রজন্ম এমনটা করে দেখাতে পারেনি যা সাহাবীগণ করে দেখিয়েছেন রাসূল সাঃ এর নেতৃত্বে।

৭। মুসলিম উম্মাহ-র পুনর্জাগরণের পথ দেখায় সীরাতে রাসূল সাঃ

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুসলিম উম্মাহর শোচনীয় অবস্থার উত্তরণকল্পে কী করণীয় আর কী বর্জনীয় তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা-সংলাপ- সংগঠন-তত্ত্বের অভাব নেই। অথচ বর্তমান সময়ে এই উম্মাহর অবস্থার উত্তরণ হবে ঠিক সেই পন্থায় যে পন্থায় উত্তরণ হয়েছিল সাহাবীগণের ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের। আর সেই পন্থা জানা ও শেখার জন্য আমাদের ফিরে আসতে হবে সীরাতে রাসূল সাঃ এর কাছে।

৮। রাসূল সাঃ এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য সীরাহ-র জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেইঃ

রাসূল সাঃ যেদিন থেকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন কুরাইশ গোত্র সেদিন থেকেই তাঁর বিরোধীতায় লিপ্ত হয়। রাসূল সাঃ কে অবমাননার এই ধারা বর্তমান যুগেও বহাল আছে। বর্তমান পাশ্চাত্যবিদগণ রাসূল সাঃ কে রক্তপিপাসু, যুদ্ধবাজ, নারীলোভী ইত্যাদি নানাবিধ অপবাদ আরোপ করেই যাচ্ছে এবং অনেক মুসলিমও অজ্ঞতাবশত তাদের এই অপপ্রচারের শিকার হচ্ছে।

তাই এসব অবমাননার বেড়াজাল থেকে রাসূল সাঃ এর সম্মান রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে রাসূল সাঃ এর জীবনী গভীরভাবে অধ্যায়ন করতে হবে। অন্যথা, আমরাও পাশ্চাত্যবিদদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যাব।

৯ । সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি আস্থা ও দৃঢ় মনোবল (তাওয়াক্কুল) রাখার শিক্ষা আমরা পাই সীরাহ থেকেঃ

সীরাহতে আমরা দেখি যে, রাসূল সাঃ সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে দাওয়াতের কাজ করে গেছেন। হিজরতের সময় যখন তিনি আবু বকর রাঃ কে নিয়ে সাওর গুহায় লুকিয়ে ছিলেন তখন কুরাইশ কাফেররা একেবারে গুহার দরজার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তা দেখে আবু বকর রাঃ চিন্তায় পেরেশান হয়ে পড়লে রাসূল সাঃ তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন, "দুশ্চিন্তা কোর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

একবার এক অভিযানকালে রাসূল সাঃ একটি গাছের নিচে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন, সাহাবীরা তাঁর থেকে কিছুটা দূরে ছিল। তখন এক শত্রু এসে রাসূল সাঃ এর তরবারি তুলে নিয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয় এবং জিজ্ঞেস করে, "আমার হাত থেকে এখন কে তোমাকে বাঁচাবে?" রাসূল সাঃ খুব শান্তভাবে উত্তর দেন, "আল্লাহ"। এই জবাব শুনে সেই শত্রুর হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়।

সমগ্র সীরাহতে এক আল্লাহর প্রতি রাসূল সাঃ এর এমন অটুট বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুলের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে যা যুগে যুগে উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতিটি সদস্যের জন্য শিক্ষা ও প্রেরণার মাধ্যম।

১০। সীরাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধভাষী, সদালাপী ও উন্নত আখলাকের অধিকারী হওয়ার শিক্ষা দেয়ঃ

আমরা সীরাহতে দেখব যে, রাসূল সাঃ এর ভাষাশৈলী ও বাচনভঙ্গি কতটা উন্নতমানের ও বিশুদ্ধ-প্রাণবন্ত ছিল। প্রথম দর্শনেই যে কেউ তাঁর কথায় মুগ্ধ হয়ে যেত। তিনি অপ্রয়োজনে যেমন কথা বলতেন না তেমনি প্রয়োজনীয় কথাও অনর্থক দীর্ঘ করতেন না। তাঁর ভাষণ ছিল সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল এবং শ্রোতাদের জন্য আকষণীয়। গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি তিনবার বলতেন যেন শ্রোতা তা ভালভাবে বুঝতে ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি তিনি যখন কথা বলতেন তখন সাহাবীগণ এমনভাবে নিশ্চুপ থেকে শুনতেন যে মনে হত তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে। কখনও কখনও তাঁর বক্তব্য শুনে সাহাবীগণ কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেলতেন আবার কখনও কোন সুসংবাদ পেলে খুশিতে সশব্দে তাকবীর দিয়ে উঠতেন।

একজন সচেতন সীরাহ পাঠকের অবশ্য কর্তব্য হল সীরাহ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের ভাষাশৈলী, বাচনভঙ্গি ও সার্বিক আখলাককে রাসূল সাঃ এর আদলে সাজানো।

১১। সীরাহ অধ্যায়ন করলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, সর্বশ্রেষ্ঠ সময় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের জ্ঞানার্জন হয়ঃ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন রাসূল সাঃ, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হল সাহাবীদের প্রজন্ম, সর্বশ্রেষ্ঠ সময় হল সাহাবীদের সময় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হল মক্কা ও মদীনা। সীরাহ অধ্যায়ন করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এই ৪ শ্রেষ্ঠ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন হয়ে যায়।

সীরাহ-র উৎসঃ

১। আল কুরআনঃ

সীরাহ-র প্রথম ও প্রধান উৎস হল আল কুরআন। অথচ অনেকেই সীরাহ-র উৎস হিসেবে কুরআনকে উপেক্ষা করে। সমগ্র কুরআনই নাযিল হয়েছে রাসূল সঃ এর সীরাহ-র বিভিন্ন পর্যায়ে। তাই কুরআন ও সীরাহ একে অপরের পরিপূরক।

২। হাদীসঃ

প্রতিটি হাদীসই মূলত সীরাতে রাসূল সাঃ এর একটি খণ্ডচিত্র। এছাড়াও রাসূল সাঃ এর সমগ্র জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানা যায় হাদীস থেকে। তাই নিঃসন্দেহে হাদীস সীরাহ-র দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৩। সীরাহ-র গ্রন্থসমূহঃ

নিদিষ্টভাবে সীরাহ হিসেবে লিখিত গ্রন্থসমূহ সীরাহ-র তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সীরাহ-র উপর প্রথম গ্রন্থ লিখা শুরু হয় তাবি'ঈদের সময় থেকে।

৪। শামায়েল গ্রন্থসমূহঃ

রাসূল সাঃ এর চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং শারীরিক গড়ন ও দৈনন্দিন আচার-আচরণের উপর লিখিত গ্রন্থসমূহকে বলা হয় 'শামায়েল'। এই বিষয়ে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল 'শামায়েলে তিরমিযী'। এই গ্রন্থগুলিও সীরাহ-র উৎস।

৫। দালাইল গ্রন্থসমূহঃ

রসূল সাঃ এর মুজিযা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিকে বলা হয় 'দালাইল'। এই বিষয়ে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল ১২ খণ্ডে ইমাম বায়হাকি রচিত 'দালাইলুন নাবুওয়্যাহ'।

৬। সাহাবাদের ইতিহাস

৭। মক্কা ও মদীনার ইতিহাস

সীরাহশাস্ত্র ও হাদীসশাস্ত্রের পার্থক্য

সীরাহ ও হাদীসশাস্ত্র জ্ঞানের দুটি ভিন্ন শাখা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দুটি শাখার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু এই দুইটি শাখার নিয়মরীতি একে অপর থেকে অনেকাংশে আলাদা।হাদীসের আলিমগণ নিয়মনীতির ব্যাপারে বেশ কঠোরতা অবলম্বন করেন। কিন্তু সীরাহর আলিমগণ এ ব্যাপারে বেশ ছাড় দেন। এর কারণ হলো, হাদীসের সত্যতা বা ইসনাদ যাচাই করার পর তা থেকে হুকুম-আহকাম প্রতিপাদন করতে হয়, তাই মুহাদ্দিসগণ সর্বদা হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকার চেষ্টা করেন যেন হাদীসগুলোর ইসনাদ ঠিক থাকে। দুর্বল ইসনাদের হাদীসের উপর ভিত্তি করে যেন কাউকে ইবাদাত করতে না হয় তা চিন্তা করেই আলিমগণ হাদীসের নিয়মনীতির ব্যাপারে এত কড়াকড়ি আরোপ করেন।কিন্তু সীরাহর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন নয়। সীরাহকে ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে দেখা হয়, তাই হুকুম-আহকামের উপর এর কোনো প্রভাব থাকে না। যেহেতু সীরাহর উপর ভিত্তি করে কোনো হুকুম-আহকাম নির্ধারণ করা হয় না তাই এর নিয়মকানুনের ব্যাপারে সীরাহর রচয়িতাগণ এতটা কড়াকড়ি করেন না। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, যিনি হাদীসশাস্ত্রের একজন আলিম ছিলেন, তিনি বলেছেন, 'যখন আমরা ইতিহাস নিয়ে কথা বলি তখন বেশ ছাড় দিই।' তাই দেখা যায় যে, সীরাহর রচয়িতাগণ এমন অনেক বর্ণনা সীরাহর অন্তর্ভুক্ত করেন, যেগুলো তাঁরা হাদীস হিসেবে হয়তো গ্রহণ নাও করতে পারেন। সুতরাং সীরাহ ও হাদীসের ক্ষেত্রে এটাই ছিল পূর্ববর্তী আলিমগণের গৃহীত পন্থা।

পবিত্র জন্ম

রাসুলুল্লাহ সা. মক্কায় বনু হাশিম বংশে ৯ রবিউল আওয়াল সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে বছরই হাতির যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছিল। সে সময় সম্রাট নওশেরওয়ার সিংহাসনে আরোহণের চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। জন্ম তারিখ ছিল ২০ অথবা ২২ এপ্রিল। ৫৭১ ঈসায়ি সাল। ইবনু সাদের বর্ণনায় রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা.-এর মাতা বলেছেন, যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন দেহ থেকে একটি নুর বের হলো, সেই নুর দ্বারা শামদেশের মহলগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, নবুওয়াতের পটভূমি হিসেবে আল্লাহর রাসুলের জন্মের সময় কিছু কিছু ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল। কিসরার রাজপ্রাসাদের ১৪টি পিলার ধসে পড়েছিল, অগ্নিউপাসকদের অগ্নিকুণ্ড নিভে গিয়েছিল, বহিরার গির্জা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

জন্মের পর মা আমিনা দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে নাতির জন্মের সুসংবাদ দেন। তিনি খুব খুশি হলেন এবং সানন্দে তাঁকে কাবাঘরে নিয়ে আল্লাহর দরবারে দুআ করলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। এ সময় তিনি তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ।

, লোকেরা মুহাম্মাদকে নিয়ে নানা রকম কথা বলতো। যেমন তারা বলতো যে, মুহাম্মাদ যেন শুষ্ক মরুভূমিতে জন্ম নেওয়া একটি সবুজ সতেজ গাছ। তারা বোঝাতে চাইতো যে তিনিই তাদের বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইবনে আব্বাস বলেন, 'লোকেদের কিছু কথা রাসূলুল্লাহর নিকট পৌঁছালো, তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা বলো, আমি কে?' তারা বললো, 'আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন,

'আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির সেরা অংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি সব সৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, এবং আমাকে সেই দুইয়ের মাঝে উত্তম দলটিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি মানুষকে অনেক গোত্রতে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ গোত্রের মাঝে স্থান দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে অনেকগুলো বংশে ভাগ করেছেন এবং আমাকে সেরা বংশে জন্ম দিয়েছেন যারা তাদের গোত্রের মাঝে সেরা এবং চেতনায় অগ্রগামী।'

রাসূল সাঃ এর নামসমূহঃ

রাসূল সাঃ এর বিশেষত্বের কথা বললে প্রথমেই তাঁর নামের কথা বলা প্রয়োজন। জুবায়ের ইবনে মুত'ঈম রাঃ থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাঃ বলেছেন, "আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ; আমি আল মাহি যার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরকে নিশ্চিহ্ন করেছেন; আমি আল হাশির, মানুষ আমার পেছনে পুনরুত্থিত হবে; আমি আল আকিব, যার পরে আর কোন নবী নেই।"

ভিন্ন একটি বর্ণনায় রয়েছে, "এবং আমি নাবিয়্যুর রাহমাহ, নাবিয়্যুত তাওবাহ, আল মুকাফফাহ এবং নাবিয়্যুল মালাহিম"।

কুরআনে রাসূল সাঃ এর দুটি নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে-

১) মুহাম্মাদ (কুরআনে ৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে) এবং ২) আহমাদ (ঈসা আঃ এর জবানে কুরআনে ১ বার উল্লেখ করা হয়েছে)

রাসূল সাঃ এর নামগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের জানা উচিত।

মুহাম্মাদ :

মুহাম্মাদ শব্দের অর্থ সর্বাধিক পরিমাণে (Highest Quantity) প্রশংসিত। অর্থাৎ যাকে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করা হয়। স্বয়ং আল্লাহ, ফেরেশতাকূল, পূর্ববর্তী নবীগণ এবং পৃথিবীর সকল মানুষ (হাতে গোণা কিছু মানুষ ব্যতীত) তাঁর প্রশংসা করে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রতিটি মুহূর্তে আযানের মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাঃ এর নাম ধ্বনিত হচ্ছে। তর চেয়ে অধিক প্রশংসার হকদার আর কেউ নেই। আর এটাই মুহাম্মাদ নামের তাৎপর্য।

আহমাদ)أحمد(:

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আহমাদ অর্থ সর্বোত্তম মানে (গুণে) (Highest Quality) প্রশংসিত। রাসূল সাঃ এর প্রশংসার জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং স্বয়ং আল্লাহ যে ভাষাশৈলী ও শব্দাবলী দিয়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন তার কোন তুলনা হয় না। তাঁর চেয়ে উত্তম মানের প্রশংসা কাউকে করা যেতে পারে না আর না কেউ তার হকদার।

আল মাহি)الماحي(:

আল মাহি অর্থ 'যে কোনকিছুকে মুছে ফেলে'। রাসূল সাঃ এর মাধ্যমে শির্ক ও কুফরকে মুছে ফেলা হয়েছে। এজন্য তাঁর নাম আল মাহি।

আল হাশির)الحاشر(:

আল হাশির অর্থ 'যার পেছনে একত্রিত করা হয়'। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম রাসূল সাঃ কে পুনরুত্থিত করা হবে এবং সমগ্র মানবজাতি তাঁর পরে উত্থিত হবে। এজন্য তাঁর একটি নাম আল হাশির।

আল আকিব)العاقب(:

আল আকিব অর্থ 'কোন ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে যিনি আসেন'। রাসূল সাঃ নবী ও রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে এসেছেন এবং তাঁর পর আর কোন নবী-রাসূল আসবে না। তাঁর মাধ্যমেই রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আল্লাহ বলেন-

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

আহযাব, ৩৩:৪০)

অর্থঃ মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (সূরা এজন্য তাঁর একটি নাম আল আকিব।

নাবিয়্যুর রহমাহ)نبي الرحمة

নাবিয়্যুর রহমাহ অর্থ 'রহমতের নবী'। রাসূল সাঃ কে আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

অর্থঃ আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। (সূরা আল আম্বিয়া, ২১:১০৭)

নাবিয়্যুত তাওবাহ)نبي التوبة

নাবিয়্যুত তাওবাহ অর্থ 'তাওবাহ-র নবী'। রাসূল সাঃ কে কেউ মেনে নিয়ে তাওবাহ করে যদি ইসলামের পথে ফিরে আসে তবে সে দুনিয়া পরকালে সফলকাম হবে। তাই তিনি নাবিয়্যুত তাওবাহ।

আল মুকাফফাহ)المقفى**:**

আল মুকাফফাহ অর্থ 'যিনি কোনকিছুকে পূর্ণতা দেন'। রাসূল সাঃ এর আগমনের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের বানী ও রিসালাতের পূর্নতা পেয়েছে। এজন্য তিনি আল মুকাফফাহ।

নাবিয়্যুল মালাহিম)نبي الملاحم

নাবিয়্যুল মালাহিম অর্থ 'ফিতনার নবী'। রাসূল সাঃ এর আগমনই কিয়ামতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন এবং কিয়ামতের পূর্বে আসবে প্রচুর পরিমাণে ফিতনা, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিতনা হল দাজ্জালের ফিতনা। এছাড়াও কিয়ামতের পূর্বে একের পর এক ফিতনার আবির্ভাব হবে। এজন্য তিনি নাবিয়্যুল মালাহিম।

রাসূল সাঃ এর কুনিয়াত বা উপনামঃ

রাসূল সাঃ এর সর্বাধিক পিরিচিত কুনিয়াত ছিল আবুল কাসিম। তাঁর বড় পুত্র কাসিমের নাম থেকেই এই নাম এসেছিল। তাঁর দ্বিতীয় কুনিয়াত ছিল আবু ইব্রাহীম। রাসূল সাঃ এর

ক্রীতদাসী মারিয়া কিবতিয়্যা এর গর্ভজাত সন্তান ইব্রাহীম এর নাম থেকে এই নাম এসেছিল। কাসিম ও ইব্রাহীম উভয়েই শিশু অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

রাসূল (সা) এর দৈহিক গঠন ও অবয়বঃ

রাসূল সাঃ এর সার্বিক দৈহিক গঠন ও অবয়ব সম্পর্কে জানার আগে একটি ঘটনা ও সেই সংক্রান্ত হাদীসটি জেনে নেওয়া আমাদের জন্য উপকারী হবে।

রাসূল সাঃ, আবু বকর রাঃ, আমির বিন ফুহাইরাহ রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন উরাইকাত (পথপ্রদর্শক) হিজরতের সময় পথ চলতে। চলতে এক পর্যায়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে মরুভূমির মাঝে একটি তাঁবুতে গেলেন। সেখানে উপস্থিত জনৈকা বৃদ্ধার (তার নাম- উম্মে মাবাদ রাঃ, তিনি পরে মুসলিম হয়েছিলেন) কাছে তিনি সাঃ খাবার চাইলে বৃদ্ধা জানালেন যে তার কাছে খেতে দেওয়ার মত কিছুই নেই। অদূরে একটি হাড় জিরজিরে শুকনো বকরিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বৃদ্ধার কাছে সেটির দুধ দোহন করার অনুমতি দিলেন। বৃদ্ধা হতাশার সাথে অনুমতি দিলেন। রাসূল সাঃ বকরির ওলানে হাত দেওয়ার সাথে সাথে তা স্ফীত হয়ে উঠল এবং রাসূল সাঃ একটি বাটি ভর্তি দুধ দোহন করলেন। সেটি বৃদ্ধাকে খেতে দিয়ে এরপর পুনরায় দোহন করলেন এবং নিজে ও সঙ্গীদের খেতে দিলেন। এরপর পুনরায় দোহন করে এক বাটি ভর্তি দুধ বৃদ্ধার কাছে রেখে বিদায় নিলেন। পরবর্তীতে বৃদ্ধার স্বামী আবু মাবাদ রাঃ (তিনিও পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছিলেন) ঘরে ফিরলে বৃদ্ধা এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তার স্বামীকে জানায়। সব শুনে স্বামী কৌতূহলী

হয়ে আগন্তুকের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। উম্মে মাবাদ তখন তার স্বামীকে রাসূল সাঃ এর যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তাকে রাসূল সাঃ এর ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অনুপম বর্ণনা বললেও ভুল হবে না।

উম্মে মাবাদ এর বর্ণনা শোনার আগে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে, উম্মে মাবাদ রাঃ যখন রাসূল সাঃ কে দেখেন তখন তিনি মরুভূমির দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্ত-শ্রান্ত-ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছিলেন। এমন অবস্থায়ও একটি মানুষ কতটা অপরূপ হতে পারে তার সাক্ষাৎ প্রমাণ উম্মে মাবাদ রাঃ এর এই বর্ণনা-

একজন মানুষকে দেখলাম,চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্ন,আলোকজ্জল মুখ,সর্বোত্তম দেহসৌষ্ঠব,পেট অস্বাভাবিক মোটা নয়,মাথার আকার দৃষ্টিকটু ছোট নয়,চেহারা জীবনভর দেখলেও প্রশান্তি হয় না,সর্বাংগ জীবনভর দেখলেও প্রশান্তি হয় না,তাঁর চোখে ছিল একটি বৈপরিত্য,তাঁর চোখের পাতার লোম লম্বা,তাঁর কণ্ঠে ছিল না কর্কশতা,তাঁর গলা ছিল পরিমিত লম্বা,তাঁর দাড়ি ছিল পরিপূর্ণ এবং ঘন,কালো অংশ কুচকুচে কালো, সাদা অংশ ধবধবে সাদা,মনে হয় যেন চোখের পাতায় সুরমা লাগানো,

ভ্রু ছিল মোটা এবং ধনুকের মত বাঁকানো,দুই ভ্রুর মাঝে জোড়া ছিল না,চুল ছিল কুচকুচে কালো,যখন নীরব থাকতেন তখন এক শ্রদ্ধাপূর্ণ গাম্ভীর্য ভর করত,কথা বলার সময় ছিলেন চমৎকার, বঝলমলে,দূর থেকে তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও স্মার্ট, সুন্দর ও

কাছে থেকে মনে হত তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ,মুখের কথা ছিল সুমিষ্ট, পরিষ্কার, যৌক্তিক,কথার মাঝে ছিল দৃঢ়তা, কথা না ছিল অতি সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট,আর না ছিল অপ্রয়োজনীয় লম্বা, তাঁর কথা শুনে মনে হত যেন নেকলেস থেকে একের পর এক মুক্তো খুলে পড়ছে,মধ্যম গড়নের,তাঁর দিকে তাকানোর জন্য মাথা নিচু করতে হত না আবার উচুও করতে হত না,তিনি ছিলেন দুই ডালের মধ্যে একটি ডাল: অনেকের মধ্যে থাকলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র

তাঁর চারপাশে একদল সাহাবী ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন তখন তাঁরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন আর যখন তিনি কিছু আদেশ করতেন তখন তাঁরা তা পালনের জন্য ছুটে যেতেন তাঁর যত্নের ঘাটতি ছিল না, চারপাশে সাহাবীদের ভিড় লেগে থাকত,তাঁর মুখ দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিল না,আর না তিনি ছিলেন বাচাল

রুক্ষ ও তপ্ত মরুভূমির মধ্যে উটের পিঠে সফররত, ক্লান্ত-শ্রান্ত-ক্ষুধার্ত এক মধ্যবয়সী যুবকের এমন আকষণীয় দেহ সৌষ্ঠব ও আখলাক কি আল্লাহর রাসূল সাঃ ছাড়া আর কারো হতে পারে? আল্লাহু আকবার!

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি দীর্ঘ দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খেদমত করেছি। তিনি কখনো আমাকে উহ্ পর্যন্ত বলেননি (বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি)। আমার কৃত কোনো কাজের জন্য তিনি আমাকে কখনো বলেননি, এটা তুমি কেন করলে অথবা কোনো কাজ না করায়েও তিনি কখনো বলেন নি, এটা তুমি কেন করলে না? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমি রেশম ও পশমের মিশ্রণে তৈরি কাপড়ও নিজ হাতে স্পর্শ করে দেখেছি এবং খাঁটি রেশমী কাপড়ও স্পর্শ করেছি কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাতের চেয়ে অধিক নরম ও মোলায়েম কিছু স্পর্শ করিনি। আমি কস্তুরীর ঘ্রাণও নিয়েছি এবং আতরের ঘ্রাণও নিয়েছি কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শরীরের ঘাম থেকে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত কিছুই পাইনি।

আইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। আমি তখন তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, সে তাঁর গোত্রের নিকৃষ্ট দাস। তারপর তিনি তাঁকে আসার অনুমতি দেন এবং তাঁর সাথে কোমল ব্যবহার করেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তাঁর সম্পর্কে যা মন্তব্য করার করেছেন, অতঃপর তাঁর সাথে কোমল ব্যবহার করলেন। তিনি বলেন, হে আইশা। যার রূঢ় আচরণের ভয়ে লোকেরা তাঁকে ত্যাগ করে বা এড়িয়ে চলে, সে নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

আল-হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) বলেছেন, আমি আমার পিতা আলী (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহর সাথে তাঁর সাহাবিগণের আচরণ কীরূপ ছিল তা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও নম্র স্বভাবের। তাঁর ব্যবহার ছিল অতিশয় কোমল। তিনি কটুভাষী ও পাষাণ হৃদয় ছিলেন না, ঝগড়াটে ছিলেন না, অশ্লীলভাষীও ছিলেন না, ছিদ্রান্বেষীও ছিলেন না, কৃপণও ছিলেন না। তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত কথার প্রতি কর্ণপাত করতেন না। কারও কোনো আবেদন অনাকাঙ্ক্ষিত হলে তাঁকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিতেন না আবার প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। তিনি অবশ্যই তিনটি জিনিস থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন: ঝগড়া, অহংকার ও নিরর্থক কথাবার্তা। তিনি মানুষকেও তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত রেখেছেন: কারও দুর্নাম করতেন না, কাউকে দোষারোপ করতেন না এবং কারো দোষ অনুসন্ধান করতেন না। তিনি এরূপ কথাই বলতেন যা থেকে সওয়াবের আশা আছে। তিনি যখন কথা বলতেন, উপস্থিত লোকজন এমনভাবে নীরব থাকতেন যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। তিনি কথা বন্ধ করার পর তারা কথা বলতেন। তাঁর সামনে তারা কেউ কথা বলতে থাকলে তাঁর কথা শেষ না হওয়া

পর্যন্ত অন্যরা নীরব থাকতেন। তাদের প্রত্যেকের কথা তাঁর নিকট তাদের প্রথম ব্যক্তির (কথার) ন্যায় ছিল। কোনো কথায় সকলে হাসলে তিনিও হাসতেন এবং কোনো বিষয়ে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। আগন্তুকের কর্কশ কথাবার্তায় বা অসংগত প্রশ্নে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন এমনকি তাঁর সাহাবিগণও আগন্তুককে (তাঁর দরবারে) নিয়ে আসতেন এবং তাঁর দ্বারা প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তিনি বলতেন, কেই কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য এলে তোমরা তাঁর সাহায্য করবে। তিনি চাটুকারিতার প্রশ্রয় দিতেন না, অবশ্য উপকারের কৃতজ্ঞতাসূচক প্রশংসায় তিনি নীরব থাকতেন। তিনি কারও কথায় বাধা দিতেন না, যাবত না সে সীমা লঙ্ঘন করত, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি মুখে বাধা দিতেন না যাবত না সে সীমা লঙ্ঘন করত, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি মুখে বাধা দিতেন অথবা উঠে চলে যেতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাক্যালাপের ধরন

আল-হাসান ইবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবু হালা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করে বললাম, আমার নিকট নবী (সাঃ) এর কথোপকথন সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) সর্বদা (উম্মতের) চিন্তায় ও (আল্লাহর) ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁকে শান্ত নিশ্চিন্ত দেখা যেত না। দীর্ঘ নীরবতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি কথার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ মুখে কথা বলতেন এবং সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যে কথা বলতেন। তাঁর কথার শব্দ একটি অপরটি থেকে পৃথক ও সুস্পষ্ট হত। তিনি কারও প্রতি কঠোরভাষীও ছিলেন না এবং কাউকে হেয় প্রতিপন্নও করতেন না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইবাদত-বন্দেগী

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি একদা তাঁর খালা মাইমূনা (রাঃ) এর নিকট রাত কাটান। তিনি আরও বলেন, আমি বালিশের প্রন্থের দিকে মাথা দিয়ে শুলাম। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দৈর্ঘ্যের দিকে শুইলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘুমিয়ে রইলেন, অবশেষে অর্ধরাত অথবা তাঁর কিছু পূর্বে বা পরে জাগ্রত হলেন। তিনি তাঁর চেহারা থেকে ঘুমের ভাব দূর করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি সূরা আল-ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন, তারপর টাংগানো একটি পানির মশকের দিকে উঠে গেলেন এবং তা থেকে পানি নিয়ে উত্তমরূপে উযূ করেন অতঃপর নামাযে দাঁড়ান। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমিও উযু করে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ডানহাত আমার মাথার ওপর রাখেন অতঃপর আমার ডানকাধে তা মলেন। তারপর তিনি দুই রাক'আত নামায পড়েন, তারপর দুই রাক'আত,

তারপর দুই রাক'আত, তারপর দুই রাক'আত, তারপর দুই রাক'আত, তারপর দুই রাক'আত। মাআন (রাঃ) বলেন, ছয়বার। তারপর তিনি বিতর নামায পড়ে শয্যাগত হন। অতঃপর তাঁর নিকট মু'আযযিন আসেন। তিনি উঠে হালকাভবে সংক্ষেপে দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায পড়েন, অতঃপর বের হয়ে গিয়ে ফজরের নামায পড়েন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কান্নাকাটি প্রসঙ্গে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন, আমাকে কুর'আন থেকে পড়ে শুনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে আমি কুর'আন পড়ে শুনাব অথচ আপনার উপরই কুর'আন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করছি। তখন আমি সূরা আন-নিসা পড়তে শুরু করলাম। আমি পড়তে পড়তে এই আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছলাম, "এবং আমি তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব" (৪: ৪১), তখন নবী (সাঃ) এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চক্ষুদয় থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিছানা

আইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ঘুমানোর বিছানাটি ছিল চামড়ার তৈরি। তাঁর ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়শা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহর বিছানা কীরূপ ছিল? তিনি বলেন, চামড়ার বিছানা ছিল তাঁর ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল। অনুরূপভাবে হাফসা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহর বিছানা কীরূপ ছিল? তিনি বললেন, একখানা চট ছিল। আমি সেটিকে দুই ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম এবং তিনি তাঁর ওপর ঘুমাতেন। এক রাতে আমি ভাবলাম, এ চটখানা যদি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিই তাহলে তা তাঁর জন্য আরেকটু আরামদায়ক হবে। তাই আমি সেটিকে চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলাম। সকালবেলা তিনি বলেন, এ রাতে তুমি আমাকে কি বিছিয়ে দিয়েছিলে? আমি বললাম, আপনার বিছানায়। তবে সেটিকে আপনার জন্য কিছুটা নরম ও আরামদায়ক করার জন্য আমি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি বলেন, এটিকে পূর্বাবস্থায় রেখে দাও। কারণ এর কোমলতা আমার রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাজের বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিনয়-নম্রতা

হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ঘরে প্রবেশের বিবরণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি যখন তাঁর ঘরে আশ্রয় নিতেন, তখন তাঁর ঘরে অবস্থানকে তিনভাগে ভাগ করে নিতেন। একভাগ মহামহিম আল্লাহর (ইবাদতের) জন্য, এক ভাগ তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য এবং একভাগ তাঁর নিজের জন্য। তাঁর নিজের জন্য নির্ধারিত অংশকে আবার তিনি নিজের ও জনগণের জন্য বিভক্ত করতেন। এ সময় তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাক্ষাত দিতেন এবং তাদের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতেন। কোনো জিনিস তিনি তাদেরকে না দিয়ে পুঞ্জীভূত করতেন না। উম্মাতের বেলায় তাঁর একই নিয়ম ছিল যে, তিনি জ্ঞানী ও গুণীদের অগ্রাধিকার দিতেন এবং নিজের সময়টুকু তাদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের মধ্যে বন্টন করতেন। তাদের কেউ একটি প্রয়োজন নিয়ে, কেউ দুটি প্রয়োজন নিয়ে আবার কেউ অনেক প্রয়োজন নিয়ে হাযির হতেন। তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং তাদেরকে এমন কাজে নিয়োজিত করতেন যা তাদের ও এই উম্মাতের জন্য কল্যাণকর। তাদের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তিনি তাদের উপযোগী বিষয় সম্পর্কে তাদের অবহিত করতেন। তিনি আরও বলতেন, তোমাদের উপস্থিতরা যেন তোমাদের অনুপস্থিতদের নিকট এ বিষোয়গুলো পৌঁছে দেয়। যারা তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়ে আমার নিকট পৌঁছাতে অক্ষম, তোমরা যেন তাদের সেই প্রয়োজনগুলো আমার নিকট পৌঁছে দাও। যারা নিজেদের প্রয়োজন শাসকের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম নয়, যারা তাদের প্রয়োজনসমূহ তাঁর নিকট পৌঁছে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের পদযুগল মজবুত ও স্থিতিশীল রাখবেন। তাঁর দরবারে এরূপ জরুরি বিষয়েরই আলোচনা হত। তিনি অপ্রয়োজনীয় আলোচনার সুযোগ দিতেন না। সাহাবিগণ তাঁর নিকট দীন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে আসতেন এবং তাঁর স্বাদগ্রহণ না করে বিচ্ছিন্ন হতেন না। এভাবে তারা হেদায়েত ও কল্যাণের দিশারী হয়ে (তাঁর দরবার থেকে) বেরিয়ে পড়তেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর লজ্জাশীলতা

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্দানশীল কুমারীর চাইতেও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোনো জিনিস অপছন্দ করলে তা তাঁর চেহারা থেকেই আমরা বুঝতে পারতাম।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবন-জীবিকা সম্পর্কে

নাওফাল ইবনে আইয়াস আল-হুযালী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ছিলেন আমাদের সহচর আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত উত্তম সহচর। একদিন তিনি আমাদের সাথে প্রত্যাবর্তনের পথে আমরা তাঁর বাড়িতে গেলাম। তিনি অন্দরে গিয়ে গোসল করেন, অতঃপর বের হয়ে আসেন। আমাদের জন্য একটি বড় পাত্রে করে রুটি ও গোশত পরিবেশন করা হল। আহার শুরু হলে আবদুর রহমান (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবু মুহাম্মদ! কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন কিন্তু তিনি ও তাঁর পরিজনবর্গ যবের রুটি দ্বারাও পেট ভরে আহার করতে পারেন নি। এখন যে প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে তা আমার মতে আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পোশাক

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জামার হাতা ছিল কব্জি পর্যন্ত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জুতা পরিধানের বর্ণনা

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে চলাচল না করে। সে হয় দুই পায়ের জুতা পরবে অথবা দুই পা-ই খোলা রাখবে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (সাঃ) বলেন, তোমাদের যে কেউ জুতা পরিধানকালে যেন আগে ডান পায়ে পরিধান

করে এবং তা খোলার সময় বাঁ পায়ের জুতা আগে খোলে। অতএব জুতা পরিধানে ডান পা প্রথমে এবং খুলতে দ্বিতীয় হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আংটির বর্ণনা

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) একটি রূপার আংটি গ্রহণ করেন। তিনি সেটি দ্বারা সীলমোহর করতেন, পরতেন না।

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) এর আংটির এক লাইনে 'মুহাম্মাদ' এক লাইনে 'রাসূল' এবং এক

লাইনে 'আল্লাহ' অংকিত ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রুটি সম্পর্কে

মাসরূক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি আইশা (রাঃ) এর নিকট গেলাম। তিনি আমার জন্য খাবার আনালেন এবং বললেন, আমি কখনো পেট ভরে আহার করি না। এজন্য আমি কাঁদতে চাইলে অবশ্যই কাঁদতে পারি (অর্থাৎ এখন পেট ভরে আহার করতে গেলেই পূর্বেকার অবস্থার কথা মনে পড়ে কান্না এসে যায়, তখন আর পেট ভরে খাই না)। মাসরুক (রাঃ) বলেন,আমি বললাম, কেন (কান্না আসে)? তিনি বলেন, যে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন তা স্মরণে এসে যায়। আল্লাহর শপথ! কোনোদিনই তিনি পরপর দুই বেলা রুটি-গোশত দ্বারা পেট ভরে আহার করেন নি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তরকারি (সালন) সম্পর্কে

সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হাসান ইবনে আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে জাফর তাঁর নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে খাবার পছন্দ করতেন এবং আগ্রহের সাথে খেতেন তা আমাদের তৈরি করে খাওয়ান। সালমা (রাঃ) তাদের বলেন, স্নেহের বৎসগণ! আজ সে খাবার তোমাদের পছন্দ হবে না। তারা বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই পছন্দ হবে। আপনি আমাদের জন্য তা তৈরি করুন। তারপর সালমা (রাঃ) উঠে গিয়ে কিছু যব নিয়ে পিষলেন। সেগুলো একটা ডেকচিতে ঢাললেন এবং তাতে কিছু যাইতুনের তৈল, সামান্য মরিচের গুড়া ও গরম মশলা মিশালেন। রান্না হওয়ার পর তিনি তাদের সামনে তা পেশ করলেন এবং বললেন, এছিল নবী (সাঃ) এর প্রিয় খাদ্য, যা তিনি আগ্রহ সহকারে খেতেন।

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পাতিল ও পেয়ালার অবশিষ্ট খাদ্য খেতে বেশ পছন্দ করতেন।

রাসূল (সা) এর দিনলিপি ও দৈনন্দিন আমল

মধ্যরাত ও ভোর

* মধ্যরাতে বা এর কিছু আগে ঘুম থেকে উঠতেন।

* এরপর মেসওয়াক করে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরান এর ১৯০-২০০ আয়াত পাঠ করতেন।

* অতঃপর উযু করতেন।

* এরপর কিছুক্ষণ যিকর করে ২ রাকাত সংক্ষিপ্ত সালাত দিয়ে কিয়ামুল লাইল শুরু করতেন।

* রাতের ১/৬ বাকি থাকতে তিনি সামান্য বিশ্রামের জন্য বিছানায় ডান কাত হয়ে ডান হাতের তালুতে গাল রেখে শুয়ে থাকতেন।

* বিলাল (রা) এর আযানের শব্দে তিনি উঠে যেতেন এবং আযানের জবাব দিতেন।

* এরপর ফজরের ২ রাকাত সুন্নাহ আদায় করতেন এবং মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হতেন।

সকাল

* ফজরের সালাত আদায় করে তিনি যিকরে মশগুল হতেন।

* যিকিরের পর সাহাবীদের নিয়ে বসতেন এবং তাঁদের কথোপকথন শুনতেন।

* কখনও কখনও সাহাবীদের স্বপ্নের বাখ্যা দিতেন, কেউ অসুস্থ থাকলে তার খবর নিতেন।

* এভাবে তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদেই অতিবাহিত করতেন।

সকাল ও দুপুরের মাঝে

* মসজিদ থেকে বের হয়ে একে একে সকল স্ত্রীর কক্ষে যেতেন এবং তাঁদেরকে সালাম দিতেন, তাঁদের জন্য দূয়া করতেন।

* সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে পুনরায় তিনি মসজিদে ফিরে আসতেন এবং ২ রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন।

* এরপর সাহাবীদের সাথে আলাপ করতেন, তাদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন ও শিক্ষা দিতেন, নাসীহা করতেন।

* কখনও কখনও ছোট শিশুদের তাঁর কাছে নিয়ে আসা হত, তিনি শিশুদের জন্য দুয়া করতেন।

* বেদুইনরা দ্বীন সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে এসময়ে আসত এবং মদীনার বাইরের প্রতিনিধিদলও এসময়ে আসতেন।

* জরুরী মুহুর্তে এই সময়টায় পরামর্শসভা বসত। মজলিস শেষে সাহাবীগণ কেউ কেউ জীবিকার কাজে বেরিয়ে পড়তেন, কেউবা বাসায় বিশ্রাম নিতেন।

* নবীজি কখনও বাসায় বিশ্রাম নিতে যেতেন, কখনও মদীনার রাস্তায় হাঁটতেন।

* কারও দাওয়াত থাকলে দাওয়াত রক্ষা করতে যেতেন বা কেউ অসুস্থ থাকলে তাকে দেখতে যেতেন।

দুপুর

* সকালের শেষে দুপুর গড়িয়ে এলে নবীজি স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে থাকার পালা থাকত তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন।

* ঘরে ঢুকে মিসওয়াক করে সবাইকে সালাম দিতেন।

* এরপর দুহার সালাত আদায় করতেন এবং নাস্তা করতেন।

* এই সময়টায় পরিবারের সাথে একান্তে কাটাতেন।

* অন্য মুসলিমা নারীগণ মেয়েদের ব্যক্তিগত মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে আসতেন এই সময়।

* কখনও কখনও ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণ আসতেন।

* নবীজি সাংসারিক কাজ করতেন এই সময়। তিনি নিজের জুতা ও কাপড় সেলাই করতেন, নিজ হাতে ছাগলের দুধ দোহন করতেন।

* যুহরের সালাতের আগ পর্যন্ত হালকা একটু ঘুমিয়ে নিতেন।

দুপুর ও বিকালের মাঝে

* ঘুমিয়ে থাকলে যুহরের আযানের শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙত।

* উযু করে তিনি যুহরের ৪ রাকাত সুন্নাহ সালাত ঘরেই আদায় করতেন।

* যুহরের জামাতের জন্য বিলাল (রা) ডাক দিলে তিনি মসজিদে যেতেন।

* সালাতের পর সাহাবীদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং তাদেরকে নাসীহা করতেন।

* এরপর ঘরে ফিরে যুহরের ২ রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায় করে কিছুক্ষণ পর আবার মসজিদে চলে যেতেন।

* আসর পর্যন্ত তিনি বহুবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাতেন।

বিকাল

* আসরের সালাত আদায় করে সাহাবীদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং কখনও কখনও খুব সংক্ষিপ্ত নাসীহা করতেন।

* যুহরের তুলনায় আসরের পর নবীজি অনেক কম কথা বলতেন।

* আসরের সালাত শেষ করে তিনি একে একে সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁদের সাথে খুনসুটি করতেন।

* এরপর সেদিন যার ঘরে থাকার পালা থাকত তাঁর ঘরে চলে যেতেন। কখনও আবার যার ঘরে থাকার পালা থাকত সকল স্ত্রী তাঁর ঘরে জমা হতেন।

* কখনও আবার সাহাবীরা তাঁকে আসরের পর দাওয়াত দিতেন। তিনি দাওয়াত কবুল করতেন।

* মাগরিবের সালাত নবীজি সংক্ষিপ্ত করতেন।

সন্ধ্যা

* মাগরিবের সালাতের পর সাহাবীদের সাথে সাধারণত কথা বলতেন না। ঘরে ফিরে ২ রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায় করতেন। এরপর রাতের খাবার গ্রহণ করতেন।

* তবে সিয়াম থাকলে মাগরিবের সালাতের পূর্বেই ইফতার করে নিতেন।

* পর্যাপ্ত খাবার থাকলে তিনি অন্তত ১০ জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে খেতেন,

* সাহাবীদের নিয়ে খাওয়ার সময় তাদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন।

রাত

* ইশার সালাতের আগ পর্যন্ত নবীজি ঘরেই থাকতেন।

* ইশার সালাত কিছুটা দেরিতে আদায় করতেন।

* ইশার সালাতের পর সাহাবীদের সাথে খুব কম দিনই কথা বলতেন।

* ইশার সালাত শেষ করে ঘরে ফিরে ২ রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায় করতেন।

রাতে ঘুমের আগে

* এরপর স্ত্রীর সাথে খোশ-গল্পে সময় কাটাতেন।

* মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সাথেও সময় কাটাতেন আবার কিছু রাতে আনসারদের সাথে সময় কাটাতে যেতেন।

* এরপর পবিত্রতা অর্জন করে তিনি ঘুমের দূয়া পড়তেন এবং ঘুমিয়ে যেতেন।

* রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে পুনরায় ঘুমানোর পূর্বে মিসওয়াক করে নিতেন।

* তিনি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতেন।

রাসূল (সা) এর সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন

স্ত্রীদের সাথে যেমন ছিলেন নবীজি (সাঃ)

স্ত্রীদের সাথে নবীজির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। স্ত্রীদের সকল ধরণের আচরণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দয়ালু ও সহনশীল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

নবীজি (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের প্রতিদিন সময় দিতেন, গল্প করতেন এবং দ্বীন শিক্ষা দিতেন

খাদিজার (রাঃ) নাম বলার সময় তাঁর প্রশংসা করতেন

তিনি সর্বদা তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা) এর প্রশংসা করতেন, তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও।

স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করতেন না

রাসূল (সা) স্ত্রীদের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা প্রকাশে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না কিংবা লজ্জা পেতেন না। দাঁত লাগিয়ে ছিঁড়তেন। [মুসলিম]

তিনি আদর করে স্ত্রীদের উপনামে ডাকতেন। আয়িশা (রাঃ) কে 'হুমাইরা, বলে ডাকতেন

হুমাইরা একটি উপনাম। এটি এসেছে আরবি শব্দ আল-হামরা থেকে। যার অর্থ লালচে সাদা রঙ।

স্ত্রীদের নিয়ে দাওয়াত কবুল করতেন

স্ত্রী অসুস্থ হলে রুকইয়া করতেন

স্ত্রীদের কেউ অসুস্থ হলে নবীজি (সা) তাঁকে দেখতে যেতেন এবং রুকইয়াহ করতেন [বুখারী ও মুসলিম]। এভাবে তিনি তাঁর সকল স্ত্রীদের শারীরিক অসুস্থতার খোঁজ খবর নিতেন এবং তাঁদের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করতেন।

স্ত্রীর অনুপযুক্ত আচরণও সহ্য করতেন

নুমান ইবনে আল-বশির থেকে বর্ণিত, "আবু বকর (সাঃ) আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এ সময় বাইরে থেকে তিনি শুনতে পেলেন আয়শা (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সাঃ) এর সাথে উঁচু গলায় কথা বলছে। ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে তিনি আয়িশাকে (রাঃ) কিছুটা রাগান্বিত হয়ে নিজের দিকে টেনে বললেন, "তোমার সাহস কত! আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সাথে উঁচু গলায় কথা বল!" আল্লাহর রাসূল তাঁকে রক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবু বকর (রাঃ) চলে গেলে রাসূলুল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "দেখলে, কীভাবে তোমাদের মাঝে এসে তোমাকে রক্ষা করলাম!" কিছুক্ষণ পর আবু বকর ফিরে এসে তাদের দুজনকে হাস্যোজ্জ্বল দেখলেন। আবু বকর বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনাদের যুদ্ধে যেমন শরিক হয়েছিলাম, আপনাদের খুশিতেও তেমনি আমাকে শরিক করুন।" [আহমাদ]

শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও সুবাসের ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন

বাসায় ফিরেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন যেন তাঁর স্ত্রী তাঁর মুখ থেকে দুর্গন্ধ না পায়।

নবীজি (সাঃ) রসুন ও পেঁয়াজের মতো হালাল জিনিসকে পরিহার করে চলতেন শুধু এ-কারণেই যে, এগুলো মুখে দুর্গন্ধ তৈরি করে।

স্ত্রীদের সাংসারিক কাজের বোঝা লাঘব করতেন

দুটি ভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল (সা) ঘরে থাকার সময় ঘরের কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করতেন। তিনি নিজ হাতে নিজের কাপর সেলাই করতেন, ভেরার দুধ ধোয়াতেন, নিজের জামা নিজে ধুতেন এবং নিজের জুতা নিজে মেরামত করতেন [আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, আহমাদ]। করে।

স্ত্রীদের বিনোদনের ব্যবস্থা করতেন

নবীজি (সা) স্ত্রীদের জন্য হালাল বিনোদনের ব্যবস্থা করতেন। একটি হাদীস থেকে জানা যায়, একদা ঈদের দিনে দুটি বালিকা আয়েশা (রা) এর ঘরে এসে আউস ও খাযরাজ গোত্রের কবিতা আবৃত্তি করছিল। তখ আবু বকর (রা) ঘরে এসে কবিতা শুনে রেগে যান। তখন আল্লাহর রাসূল (সা) তাদেরকে বিরত রাখতে আবু বকরকে নিষেধ করলেন [বুখারী ও মুসলিম]

তিনি আয়েশা (রা) এর সাথে দুইবার দৌড় প্রতিযোগীতাও করেছিলেন। প্রথমবার আয়েশা (রা) জিতেছিলেন। পরবর্তী প্রতিযোগীয়তায় রাসূল (সা) জিতে বলেছিলেন, "এটা আগেরটার শোধ।" [আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

নবীজির উপস্থিতিতে আয়েশা (রা) এর বান্ধবীরা আয়েশা (রা) এর সাথে পুতুল খেলতে আসত এবং নবীজি (সা) তা থেকে বাধা দিতেন না [বুখারী ও মুসলিম]।

ঘরকে পাপকাজ থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে সজাগ থাকতেন

পরিবারের কর্তার একটি বড় দায়িত্ব হলো, পরিবারকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষার চেষ্টা করা। রাসূল (সা) এই কাজটি যথার্থভাবে করে গেছেন যদিও তাঁর ঘরে পাপ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে।

স্ত্রীদের ব্যাপারে নবীজির (সাঃ) গাইরাহ কাজ করত

রাসূল (সা) এমন কাউকে নিজ স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে দিতেন না যারা তাঁদের মাহরাম নয় কিংবা কীভাবে নারীদের বর্ণনা দিতে হয় তা জানে।

স্ত্রীদের তারবিয়াতের ব্যবস্থা করতেন

রাসূল (সা) তাঁর স্ত্রীগণের দ্বীনি শিক্ষা ও তারবিয়াতের ব্যবস্থা করতেন। তিনি তাদেরকে মন্দের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় গ্রহণ করতে শিখিয়েছেন [তিরমিযী], তাদের উপকারী দূয়া শিক্ষা দিয়েছেন [মুসলিম], তাদেরকে সহজ কিন্তু সর্বোত্তম ইবাদতগুলো শিখয়েছেন [আবু দাউদ, নাসাঈ], ইবাদতে নিজের উপর অত্যাচার করতে নিষেধ করতেন [বুখারী, মুসলিম], বেশি বেশি দান করতে উৎসাহিত করতেন [আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী], সচ্চরিত্র শেখাতেন [বুখারী, মুসলিম], সহনশীলতা, উদারতা ও ক্ষমা শেখাতেন [আহমাদ], ভাল কথা বলতে ও অসার কথা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিতেন [বুখারী, মুসলিম], ছোট ছোট পাপের ব্যাপারেও স্ত্রীদের সাবধান করতেন [ইবনে মাজাহ]।

ইফকের ঘটনা নিঃসন্দেহে রাসূল (সা) ও আয়েশা (রা) এর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাসূল (সাঃ) যেভাবে তাঁর স্ত্রীর সাথে ব্যবহার করেছেন তা থেকে আমরা কিছু শিক্ষা পাই -

১। যাচাই করার দূরদর্শিতা

২। আচরণে পরিবর্তন আনা

৩। মতামত ও পরামর্শ লাভের পদ্ধতি

৪। আয়িশাকে যেভাবে তিনি (সাঃ) সামলালেন নবীজি (সাঃ) উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেন সত্য উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।

৫। সত্য প্রকাশ পাবার পর আয়িশার প্রতিক্রিয়া: তাঁর মা যখন তাঁকে বললেন, "রাসূলুল্লাহর কাছে যাও (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)"। তখন তিনি উত্তর দিলেন, "না। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর নিকট যাব না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রশংসাও করব না।"

তথ্যসূত্রঃ নবীজির সংসার, শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ [মাকতাবাতুল আসলাফ থেকে প্রকাশিত]

সন্তানদের সাথে যেমন ছিলেন নবীজি (সাঃ)

বিয়ে দেওয়ার সময় তাঁর মেয়েদের মতামত জিজ্ঞেস করতেন

তাঁর কন্যাদের বিয়েতে মোহরানা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতেন না

বিয়ের পর মেয়ের নতুন বাসস্থানের জন্য উপহার পাঠাতেন

বিয়ের পরও কন্যাদের যত্ন নিতেন

মেয়ে ও জামাতার মনোমালিন্যে হস্তক্ষেপ করতেন না

তথ্যসূত্রঃ নবীজির সংসার, শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ [মাকতাবাতুল আসলাফ থেকে প্রকাশিত]

নাতিদের সাথে যেমন ছিলেন নবীজি (সাঃ)

আল্লাহর নবীর সাতজন নাতি-নাতনি ছিলেন হাসান ইবনে আলী, হুসাইন ইবনে আলী, উম্মে কুলসুম বিনতে আলী, যায়নাব বিনতে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে উসমান, উমামা বিনত আল-আস, আলি ইবনে আল-আস।

নবীজির মেয়ে ফাতিমা দুই ছেলে হাসান ও হুসাইনের মাধ্যমে নবীজির বংশধারা এখনও চালু আছে।

নাতি কোলে প্রসাব করলে রেগে যেতেন না

নাতিদের মসজিদে নিয়ে যেতেন

নবীজি তাদের চুমু দিতেন এবং নিজ কাঁধে চড়াতেন

হারাম থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিতেন

সাদ গোত্রের অবস্থান

আরবের শহুরে নাগরিকদের রীতি ছিল, তারা নিজেদের শিশুকে শহরের অসুখ-বিসুখ থেকে ভালো রাখার জন্য দুধপান করানোর কাজে নিয়োজিত বেদুইন নারীদের কাছে পাঠাত। এতে শিশুদের দেহ মজবুত এবং শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠত। এছাড়া এর আরেক উদ্দেশ্য ছিল, সেই দুধপানের সময়েই যেন তারা বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিক্ষা করতে পারে। এ রীতি অনুযায়ী আবদুল মুত্তালিব ধাত্রীর খোঁজ করলেন এবং অবশেষে তাঁর নাতিকে হালিমা বিনতু আবু জুবাইরের হাতে দিলেন। এ মহিলা ছিলেন বনু সাদ ইবনু বকরের অন্তর্ভুক্ত। তার স্বামীর নাম ছিল হারিস ইবনু আবদিল উজজা, ডাকনাম ছিল আবু কাবশা। তিনিও ছিলেন সাদ গোত্রীয়।

রাসূল সাঃ কর্তৃক ছাগল চরানো- সকল নবীর সুন্নাহঃ

বনু সা'দ গোত্রে দুধ মা হালিমার কাছে থাকা অবস্থায় তিনি অন্যান্য বালকদের সাথে ছাগল চরাতে মাঠে যেতেন। মক্কাতেও কয়েক কীরাত অর্থের বিনিময়ে তিনি ছাগল চরিয়েছেন। শুধু তিনিই নন, বরং পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলই ছাগল চরিয়েছেন।

ছাগল চরানোর মাধ্যমে নবীগণ যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করতেন তা হল-

(১) দায়িত্বশীলতা

(২) ধৈর্য্য

(৩) অধীনস্থদের সুরক্ষা প্রদান

(৪) দূরদৃষ্টি অর্জন

(৫) উম্মাহর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া

(৬) অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে জীবনযাপন

(৭) প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া

(৮)আল্লহর সৃষ্টি ও নিদর্শনের কাছাকাছি থাকা

বক্ষবিদারণের ঘটনা

১ম বক্ষবিদারণের ঘটনা

দুখ ছাড়ানোর পরও শিশু মুহাম্মদ সাদ গোত্রেই ছিলেন। তাঁর বয়স যখন চার অথবা পাঁচ তখন ১ম বক্ষবিদারণের ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সহিহ মুসলিম শরিফে হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত রয়েছে। বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট জিবরাইল আ. আগমন করলেন। এ সময় আল্লাহর রাসুল শিশুদের সাথে খেলছিলেন। জিবরাইল আ. তাঁকে শুইয়ে বুক চিবে কলব বের করে আনলেন, তারপর কলবের একটি অংশ বের করে বললেন, এটা তোমার মধ্যে শয়তানের অংশ। এরপর কলবকে একটি তশতরিতে রেখে জমজম কূপের পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেন। তারপর যথাস্থানে স্থাপন করলেন। অন্য শিশুরা ছুটে গিয়ে বিবি হালিমার কাছে বলল, মুহাম্মদকে মেরে ফেলা হয়েছে। পরিবারের লোকেরা ছুটে এলেন। এসে দেখলেন তিনি বিবর্ণ মুখে বসে আছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু বলেন আমি তার বক্ষে সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি।

২য় বক্ষ বিদারণঃ

রাসূল সাঃ এর দশ বছর বয়সে দ্বিতীয়বারের মত তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হয়।

৩য় বক্ষ বিদারণঃ

নবুওয়াত লাভের প্রাক্কালের তৃতীয়বারের মত তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হয়।

৪র্থ বক্ষ বিদারণঃ

মিরাজের রাত্রিতে বায়তুল্লাহ থেকে মাসজিদুল আকসায় গমনের পূর্বমুহূর্তে তাঁর চতুর্থবারের মত বক্ষ বিদারণ করা হয়।

তবে উপরোক্ত বর্ণনাগুলির মধ্যে ১ম ও ৪র্থ বর্ণনাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যদিও ইদ্রিস কান্ধলবী রঃ এর মতে সবগুলো বর্ণনাই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য। এমনকি কোন কোন বর্ণনায় ৫ম বার বক্ষ বিদারণের কথাও এসেছে। কিন্তু তা মুহাদ্দিসীনদের ঐকমত্য থেকে প্রমাণিত নয়।

আমিনার মৃত্যু ও দাদার কোলে শিশু মুহাম্মাদ সাঃ

কোলের সন্তানকে ফিরে পেয়ে আমিনা সিদ্ধান্ত নিলেন ইয়াসরিবে গিয়ে স্বামীর কবর যিয়ারত করবেন। আব্দুল মুত্তালিব সকল আয়োজন করলেন এবং আমিনা তাঁর শিশু মুহাম্মাদ সাঃ এবং দাসী উম্মে আয়মানকে (আব্দুল্লাহ ও আমিনার বিয়ের সময় আব্দুল মুত্তালিব উম্মে আয়মানকে উপহার হিসেবে আমিনাকে দান করেছিলেন) সাথে নিয়ে ইয়াসরিব অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রায় ১ মাস ইয়াসরিবে থাকার পর মক্কা অভিমুখে পুনরায় যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু পথিমধ্যে আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ধূ ধূ মরুভূমির বুকে উম্মে আয়মান ও ৬ বছর বয়সী শিশু মুহাম্মাদ সাঃ কে একা রেখে আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সেখানেই আমিনাকে কবরস্থ করে উম্মে আয়মান শিশু মুহাম্মাদ সাঃ কে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। বাবা-মা হারা ইয়াতিম শিশু মুহাম্মাদ সাঃ কে দাদা আব্দুল মুত্তালিব নিজের কাছে রেখে দিলেন প্রতিপালনের জন্য।

আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যু ও চাচা আবু তালিবের কোলে শিশু মুহাম্মাদ সাঃ

মুহাম্মাদ সাঃ এর বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন তখন আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তিনি মৃত্যুর আগে চাচা আবু তালিবকে ওসীয়ত করে যান মুহাম্মাদ সাঃ এর দেখভালের জন্য। ওসীয়ত অনুযায়ী আবু তালিব সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। আব্দুল মুত্তালিবের আরও সন্তান ছিল কিন্তু আবু তালিবকে ওসীয়ত করে যাওয়ার কারণ এই যে, আব্দুল্লাহ ও আবু তালিব ছিলেন একই মায়ের সন্তান। তাই আপন ভাতিজার প্রতি দরদ অন্যদের চাইতে বেশী হবে এটাই স্বাভাবিক আর এই ধারণা যথার্থ প্রমাণিতও হয়েছিল।

চাচা আবু তালিবের সাথে বাণিজ্য সফরে শাম গমনঃ

বালক মুহাম্মাদ সাঃ এর বয়স যখন বারো বছর তখন চাচা আবু তালিব তাঁকে সাথে নিয়ে এক বাণিজ্য সফরে শাম গমন করেন। ইবনে ইসহাক এর বর্ণনায় রয়েছে, আবু তালিব যখন সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রওনা দেবেন তখন বালক মুহাম্মাদ আবু তালিবকে জড়িয়ে ধরলেন। এসময় আবু তালিবের মন বিগলিত হয়ে গেল এবং তিনি ভাতিজা মুহাম্মাদ সাঃ কে তাঁর সাথে নিয়ে নিলেন।

সেখানে তারা বসরা নামক শহরে গিয়ে পৌঁছেন। বসরায় জার্জিস নামে একজন পাত্রী বাস করতেন। তিনি 'বাহীরা' নামেই অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঈসায়ী ধর্ম এবং ইঞ্জিলের উপর তার

যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ইতিপূর্বে সেখানে অনেক বাণিজ্য কাফেলা গেলেও তিনি কখনও কোন কাফেলা দেখে বের হন নি। কিন্তু আবু তালিবের বাণিজ্য কাফেলা দেখেই বাহীরা তার ইবাদতখানা থেকে বের হয়ে আসে এবং বালক মুহাম্মাদ সাঃ কে দেখেই তিনি বুঝতে পারেন যে এই ছেলেই একদিন আখেরি যমানার নবী হিসেবে আবির্ভুত হবেন। তিনি আবু তালিবকে এই সুসংবাদ দিলে আবু তালিব জানতে চাইলেন যে, কেন বাহীরার এমনটা মনে হল। তখন বাহীরা

জানালেন, কাফেলা যখন আসছিল তখন চারপাশের বৃক্ষরাজি এবং প্রস্তরখণ্ড বালক মুহাম্মাদ সাঃ কে সিজদা করছিল এবং কোন নবি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এমনটা হওয়া সম্ভব নয়। এছাড়াও বালক মুহাম্মাদের সাঃ দুই কাঁধের মাঝের মোহরে নবুওয়াত দেখেও তাঁর ভবিষ্যৎ নবুওয়াতের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ সকল বিষয় জানানোর পর বাহীরা আবু তালিবকে বললেন, কাফেলার সাথে থাকলে ইহুদী ও রোমানদের কারণে বালক মুহাম্মাদ সাঃ এর জীবন ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে তাই তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়াই নিরাপদ। তৎক্ষণাৎ আবু তালিব কয়েকজন গোলামের সাথে বালক মুহাম্মাদ সাঃ কে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, আবু বকর ও বিলাল এর সাথে আবু তালিব বালক মুহাম্মাদ সাঃ কে ফেরত পাঠান।

তবে এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে 'আলিমগণের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম তিরমিযী, ইবনে হাজার, হাকিম প্রমুখ 'আলিমগণ এই ঘটনাকে গ্রহণ করেছেন। আবার ইমাম আয যাহাবি, ইবনু কাসির এবং ইবনু সায়্যিদ প্রমুখ আলিমগণ এই ঘটনাকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

হারবুল ফুজ্জার (ফিজার যুদ্ধ-Evil War):

মুহাম্মাদ সাঃ এর বয়স যখন ২০ বছর (এটি ইবন ইসহাকের মত, তবে ইবনে হিশামের মতে তখন মুহাম্মাদ সাঃ এর বয়স ১৪/১৫ এবং আকবর শাহ নজিবাবাদী রঃ এর মতে তখন মুহাম্মাদ সাঃ এর বয়স ছিল ১১ বছর) তখন মক্কার ওকায বাজারে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের এক পক্ষে ছিল কুরাইশ ও কিনানাহ গোত্র (কিনানাহ ছিল অনেকগুলো গোত্রের সমন্বয়ে একটি বৃহৎ গোত্র এবং কুরাইশ ছিল কিনানাহ-র একটি উপগোত্র) এবং অপরপক্ষে ছিল ক্বায়স আয়লান গোত্র (কিনানাহ-র মত কায়স আয়লানও ছিল গাত্বফান, হাওয়াযিন প্রমুখ বড় বড় উপগোত্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ গোত্র)। একদিন বনু কিনানাহ-র বাররায নামক এক ব্যক্তি কায়স আয়লানের তিন লোককে (তারা

ছিল হাওয়াযিন উপগোত্রের) হত্যা করে। ফলশ্রুতিতে হাওয়াযিনের লোকেরা কিনানাহকে আক্রমণ করে। প্রাণ বাঁচাতে কিনানাহ এবং তাদের অন্তর্গত কুরাইশ গোত্র হারামের সীমানায় প্রবেশ করে। কিন্তু হাওয়াযিনের লোকেরা তাদেরকে হারামের ভিতরেই আক্রমণ করে এবং এর এর ফলে কুরাইশ ও কিনানাহ গোত্রের সাথে কায়স আয়লানের যুদ্ধ বেঁধে যায়। শুরুতে কুরাইশদের অবস্থান দূর্বল হলেও এক পর্যায়ে তারা শক্ত অবস্থানে পৌঁছে যায় এবং কায়স আয়লানের অবস্থা দূর্বল হয়ে পড়ে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কিছু কুরাইশি ব্যক্তি এই শর্তে সন্ধির প্রস্তাব দেন যে, যে পক্ষের অধিক লোক নিহত হয়েছে তাদেরকে সেই অতিরিক্ত নিহতের রক্তপণ দিয়ে দেওয়া হবে। উভয় পক্ষ এই শর্তে সন্ধি মেনে নেয় এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে রাসূল সাঃ সরাসরি অংশগ্রহণ করেন নি, তিনি শুধু তাঁর চাচাদের তীর কুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধকে ফিজার যুদ্ধ বলার কারণ হল-

(১) এই যুদ্ধে পবিত্র বস্তুসমূহ ব্যবহার করে তার পবিত্রতা এবং পবিত্র মাসের ও পবিত্র কাবার পবিত্রতা বিনষ্ট করা হয়।

(২) এই যুদ্ধের উভয় পক্ষই ছিল আল্লাহর অবাধ্য এবং যুদ্ধের কোন বৈধ কারণও ছিল না।

হিলফুল ফুযুল প্রতিষ্ঠাঃ

ফিজার যুদ্ধের হত্যাযজ্ঞ ও ভয়াবহতা কুরাইশের কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তিকে দারুন দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। কুরাইশের বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাসায় একত্রিত হয়ে আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআন ছিলেন মক্কার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং সততা, অতিথিপরায়নতা ও দানশীলতার জন্য তিনি সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এজন্য তাঁর ঘরেই এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

যে সকল গোত্র এই সভায় অংশ নিয়েছিল তাদের মধ্যে প্রধান হল বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ বিন আব্দুল উযযা, বনু যুহরা বিন কিলাব এবং বনু তামিম বিন মুররাহ। তারা সকলে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল-

(১) দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(২) বিদেশী লোকজনের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(৩) দরিদ্র, দূর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা দানে আমরা কখনই কুণ্ঠা করব না।

৪) অত্যাচারী ও অনাচারীর অন্যায়-অত্যাচার থেকে দূর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব। (

এই চুক্তির আরেক নাম 'হিলফুল মুতায়্যাবিন'। 'মুতায়্যাব' অর্থ আতর/Perfume, তৎকালীন সমাজে কোন বিষয়ে গণস্বাক্ষর দেওয়ার রেওয়াজ ছিল এমন যে, কোন বিষয়ে সবাই একমত হয়ে অনুমোদন দিলে ঐ ব্যক্তিবর্গ Perfume এ হাত ডুবিয়ে কাবা ঘরের একই জায়গায় হাত লেপ্টে দিত। এর মাধ্যমে ধরে নেওয়া হত, ঐ চুক্তিতে উক্ত ব্যক্তিবর্গ স্বাক্ষর করেছেন। কারণ, তারা নিরক্ষর ছিল। 'মুতায়্যাব' এ হাত চুবিয়ে চুক্তিবদ্ধ হওয়া হয়েছিল তাই এই চুক্তির নাম হয় 'হিলফুল মুতায়্যাবিন'।

এই সংঘের নাম 'হিলফুল ফুযুল' হওয়ার কারণঃ

সীরাহ গ্রন্থগুলিতে এর একাধিক কারণ পাওয়া যায়-

(১) এটি ছিল অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারনামা। তাই এর নাম হয় 'হিলফুল ফুযুল' বা 'ন্যায়ের অঙ্গীকার'।

(২) সীরাতে ইবনে হিশাম এর উদ্ধৃতি দিয়ে সীরাতে মুস্তাফা গ্রন্থে ইদ্রিস কান্ধলবী রঃ লিখেছেন, পূর্বের জমানায় যুদ্ধ বিগ্রহের ধ্বংসলীলা থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য ফযল ইবনে ফুযালা, ফযল ইবনে উদায়া এবং ফুযায়ল ইবনে হারিস একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাঁদের নামানুসারে সেই চুক্তিকে বলা হত 'হিলফুল ফুযুল'। ফিজার যুদ্ধের পর মূলত সেই চুক্তিটিকেই নবায়ন করা হয় এবং নাম অপরিবর্তিত রাখা হয়।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর একদা রাসূল সাঃ বলেছিলেন, "আজও কোন ব্যক্তি যদি 'হে হিলফুল ফুযুলের ব্যক্তিবৃন্দ' বলে ডাক দেয় তবুও আমি তার ডাকে সাড়া দিব"।

'হিলফুল ফুযুল' থেকে আমাদের জন্য শিক্ষাঃ

(১) একজন মুসলিম সমাজের মানুষের সুখে-দুঃখে সর্বদা এগিয়ে আসবে এবং সমাজের যেকোন জনকল্যাণকর কাজে (যদি তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়) অংশ নেবে, যদিও তা পুরোপুরি ধর্মীয় কোন বিষয় না হয়।

(২) হিলফুল ফুযুলে অংশ নেওয়ার সময় রাসূল সাঃ এর বয়স ছিল ২০ বছর। আমাদের তরুণদেরও উচিত 'মুরুব্বি' হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে এখন থেকেই কাজ শুরু করা।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাসায় তৎকালীন সমাজের হর্তাকর্তারা একত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু তারা যুবক মুহাম্মাদ সাঃ এর উপস্থিতিতে বিরক্ত হননি, বরং তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাই আমাদের সমাজের মুরুব্বিদের উচিত সমাজের জনকল্যাণমূলক কাজে যুবকদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলা।

নবীজির বৈবাহিক জীবন

খাদিজার সাথে বিয়ে

যুবক বয়সে নবীজির জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো খাদিজার ঞ্জ সাথে বিয়ে। খাদিজা ঞ্জ মক্কার বিখ্যাত এক নারী, সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা। তাঁর আগেও বিয়ে হয়েছিল। খাদিজার ঞ্জ নিজস্ব ব্যবসা ছিল। সে সময় ব্যবসার কাজে প্রায়ই ইয়েমেন ও সিরিয়া যাতায়াত করা লাগতো। তিনি ব্যবসার কাজ সামলাবার জন্য বিভিন্ন লোক ভাড়া করতেন, নিজে ঘরের বাইরে গিয়ে ব্যবসা করতেন না। কুরাইশের লোকেরা শীত ও গ্রীষ্মে বছরের দুই সময়ে সফরে বের হতো একবার ইয়েমেনে, আরেকবার শামে। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল মক্কার সে সময়ের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন,

"কুরাইশদের নিরাপত্তার জন্য, শীত ও গ্রীষ্ম সফরে তাদের নিরাপত্তার জন্য।" (সূরা কুরাইশ, ১০৬: ১-২)

নবীজির সততা ও সত্যবাদিতার কথা তখন মক্কার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর কথা শুনে খাদিজা ভ্রু তাঁকেই ব্যবসার কাজে নিয়োজিত করলেন। মুহাম্মাদ যখন শামে সফরের উদ্দেশ্যে বের হলেন, খাদিজা তাঁর দাস মায়সারাহকে তাঁর সঙ্গে পাঠালেন। তাঁরা দুজন শামে ব্যবসা শেষ করে ফিরে এলেন।

মায়সারাহ খাদিজার কাছে তাদের সফরের বর্ণনা দিতে এসে মুহাম্মাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি বলেন, 'এই মানুষটার সততা ও বিশ্বস্ততা মুগ্ধ হওয়ার মতো।' খাদিজা নবীজির কথা যত শুনছেন, ততই তাঁর প্রতি আগ্রহ বোধ করছেন। নবীজির চারিত্রিক গুণাবলি এমনই ছিল যে সবাইকে টানতো। খাদিজা, মক্কার একজন বিত্তশালী মহিলা, এক সাধারণ কর্মচারীর অসাধারণ চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ খাদিজার প্রস্তাব মেনে নিয়ে বিয়ের জন্য সম্মতি জানালেন। বিয়ের সময় নবীজির বয়স ছিল পঁচিশ, আর খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ। দুজনের বয়সের পার্থক্য পনেরো বছর, কিন্তু বয়সের এই সুবিশাল ফারাক তাদের বৈবাহিক জীবনে কোনো আঁচ ফেলতে পারে নি।

রাসূলুল্লাহ সাঃ এর যৌবনকালে কাবা ঘর পুনঃনির্মাণের বর্ণনাঃ

রাসূল সাঃ এর বয়স যখন ৩৫ বছর তখন কুরাইশগণ কাবা ঘর পুনঃনির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৫-৩৫ বছর বয়সের মধ্যে রাসূল সাঃ এর জীবনের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় না।

তখনও পর্যন্ত কাবা ঘরের জায়গাটি চারদিকে দেওয়াল দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল, কোন ছাদ ছিল না। সেই সুযোগে চোরেরা কাবা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ভিতরের মূল্যবান সম্পদ ও অলঙ্কারাদি চুরি করে নিয়ে যায়। ইসমাঈল আঃ এর আমল হতেই কাবা ঘরের উচ্চতা ছিল ৯ হাত। এছাড়াও কাবা ঘর নিচু ভূমিতে অবস্থিত হওয়ার কারণে বৃষ্টির পানি ভিতরে প্রবেশ করত।

কাবা ঘরের নির্মাণের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় এর দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি হয়ে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। তাছাড়া সে বছর মক্কায় বন্যা হওয়ার কারণে কাবা ঘরের দেয়ালের আরও অবনতি ঘটে। তাই কাবার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য কুরাইশগণ একত্রিত হয়ে কাবা ঘর পুনরায় নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে আকবর শাহ খান নজিবাবাদী রঃ ভিন্ন একটি বর্ণনায় বলেছেন, একদিন অসতর্ক মুহূর্তে কাবা ঘরে আগুন লেগে যায় এবং সেখান থেকেই কাবা ঘরের স্থানে স্থানে ফাটল সৃষ্টি হয়। তখন কুরাইশগণ কাবা ঘর নতুনভাবে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তৎকালীন পারস্য সম্রাট ইয়েমেনের একটি গীর্জা ধ্বংস করে দিলে রোমান সম্রাট সেই গির্জা পুনরায় নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য মূল্যবান কাঠ, পাথর এবং দক্ষ কারিগর দিয়ে একটি জাহাজে করে সমুদ্রপথে ইয়েমেনে পাঠান। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। পথে প্রচন্ড ঝড় এসে সেই জাহাজকে বিধ্বস্ত করে দেয় এবং জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় কোনমতে জেদ্দার সমুদ্র বন্দরে এসে পৌঁছে। জাহাজের অধিবাসীরা পুনরায় দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য সেই জাহাজের মালামাল বিক্রি করে দিচ্ছিল। খবর পেয়ে কুরাইশগণ ওই কাঠ, পাথর ক্রয় করে দক্ষ কারিগরকে (তার নাম ছিল বাকুম) মক্কায় নিয়ে আসে এবং কাবাঘর নির্মাণের জন্য সেগুলো ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

যখন সমস্ত কুরাইশ সর্দার কাবা ঘর ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিল তখন ওয়াহাব ইবনে আমর মাখযূমী (তিনি রাসূল সাঃ এর পিতার মামা ছিলেন) কাবার একটি পাথর খুলে

নিয়ে হাতে নেন। কিন্তু পাথরটি সাথে সাথে তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে যেখানে ছিল সেখানেই নিজে থেকে পুনঃস্থাপিত হয়ে যায়। এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখে উপস্থিত কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কাবা ঘর নির্মাণে শুধুমাত্র বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ ব্যবহার করা হবে। সুদ-জুয়া ও পতিতাবৃত্তি সহ যাবতীয় হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ ব্যবহার করা হবে না।

এরপর নতুন ইমারত নির্মাণের জন্য কাবা ঘরের পুরনো ইমারত ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাবা ঘরের দেওয়াল ভাঙ্গার জন্য কেউই অগ্রসর হতে সাহস করছিল না। অবশেষে ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা মাখযুমী এগিয়ে আসে। সে এই বলে দূয়া করে- "হে আল্লাহ! আমরা যেন ভয়-ভীতির শিকার না হই। আমরা শুধুমাত্র কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এই কাজ করছি।" এই বলে সে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের কোণ থেকে খানিকটা ভেঙ্গে ফেলল। লোকেরা সারারাত অপেক্ষা করল ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার উপর কোন বিপদ আসে কিনা তা দেখার জন্য। পরদিন সকালে সবকিছু স্বাভাবিক দেখে সবাই সাহস ফিরে পায় এবং কাবা ঘর ভাঙ্গার কাজে হাত দেয়। সকল গোত্রই যাতে কাবা নির্মাণে অংশ নিতে পারে সেজন্য কাবার কোন অংশ কে নির্মাণ করবে তা আগেই নির্ধারণ করে নেওয়া হয়। হাজরে আসওয়াদ সংলগ্ন একটি দেয়াল নির্মাণের কাজ দেওয়া হয় বনু আব্দে মানাফকে এবং আরেকটি দেয়াল নির্মানের কাজ দেওয়া হয় বনু মাখযূমকে। এই দুটি গোত্র কুরাইশদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দুটি গোত্র ছিল বিধায় কাবার সবচেয়ে মূল্যবান দুটি দেয়াল নির্মাণের কাজ এদেরকে দেওয়া হয়। কাজ ভালমতই এগিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের সময় আসলে বনু আব্দে মানাফ এবং বনু মাখযূমের মধ্যে বিভেদ ছড়িয়ে পড়ল। তারা উভয়েই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের গৌরব লাভ করতে চাইছিল কারণ, হাজরে আসওয়াদ উভয় গোত্রের নির্মিত দেয়ালের উপর ছিল। এক পর্যায়ে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়।

এই অবস্থায় মক্কার জীবিত সর্বাধিক প্রবীণ পুরুষ আবু উমাইয়া ইবনুল মুগীরা মাখযুমী সমাধান বাতলে দেন। তিনি বলেন, "আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সবার আগে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে তিনিই সিদ্ধান্ত দেবেন যে কোন গোত্র হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করবে"। সকলেই এই সিদ্ধান্তে সানন্দে রাজি হয়। পরদিন সকালে দেখা গেল, সকলের পূর্বে মুহাম্মাদ সাঃ মসজিদুল হারামে উপস্থিত হয়েছেন। সকলেই তাঁকে দেখে আনন্দিত হল এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার ব্যাপারে নিজেদের সম্মতি জানাল।

নবুওয়াত ও রিসালাতের শীতল ছায়ায়

আরবের আল-হেরায়

নবি সা.-এর বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি হলো, তাঁর পরিচ্ছন্ন অনমনীয় ব্যক্তিত্বের কারণে স্বজাতির সাথে মানসিক ও চিন্তার দূরত্ব অনেক বেড়ে গেল। এ অবস্থায় রাসুল সা. নিঃসঙ্গপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ছাতু এবং পানি নিয়ে মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। এটি একটি ছোট গুহা, এর দৈর্ঘ্য চার গজ, প্রস্ত পৌনে দুই গজ। নিচের দিকে গভীর নয়। ছোট একটি পাথরের পাশে ওপরের প্রান্তরের সঙ্গমস্থলে এ গুহা অবস্থিত। প্রিয় রাসুল এ গুহায় যাওয়ার পর বিবি খাদিজাও তাঁর কাছে যেতেন এবং খাবার দিয়ে আসতেন। প্রিয় রাসুল পুরা রমজান মাস এ গুহায় কাটিয়ে দিতেন। জগতের দৃশ্যমান এবং এর পেছনে কুদরতের কারিশমা সম্পর্কে চিন্তা করতেন। স্বজাতির লোকদের দেবতাপূজা এবং নোংরা জীবনযাপন দেখে তিনি শান্তি পেতেন না। কিন্তু তাঁর সামনে সুস্পষ্ট কোনো পথ, সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি, প্রচলিত অবস্থার বিপরীত কোনো কর্মসূচি ছিল না। যার ওপর জীবন কাটিয়ে তিনি মানসিক স্বস্তি ও শান্তি লাভ করতে পারেন। নবিজির এ নিঃসঙ্গ-প্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের হিকমতের একটি অংশ। এমন করে আল্লাহ পাক তাঁকে ভবিষ্যতের গুরুদায়িত্বের জন্য তৈরি করছিলেন।

জিবরাইলের আগমন ও জ্যোতির্ময় ওহি

রাসূল সাঃ নবুওয়াত লাভের ৩ বছর আগে থেকে প্রতি রমযানে হেরা গুহায় অবস্থান করতে শুরু করেন। এভাবে তৃতীয় বছরে হেরা গুহায় অবস্থানকালে এক রাতে জিবরীল আঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে আসেন এবং মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত ও রিসালাত লাভ করে ধন্য হন।

জিবরীল আঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করে রাসূল সাঃ কে বললেন, "তুমি পড়ো"। তিনি বললেন, "আমি পড়তে জানি না"। তখন জিবরীল আঃ তাঁকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তুমি পড়ো"। তিনি আবারও বললেন, "আমি পড়তে জানি না"। এরপর পুনরায় তাঁকে আলিঙ্গন করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো, সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে..." এভাবে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন এবং চলে গেলেন। এই ঘটনার পর রাসূল সাঃ অস্থির চিত্তে ঘরে ফিরে আসলেন এবং স্ত্রী খাদিজার কাছে সবকিছু খুলে বললেন।

সবকিছু শুনে খাদিজা রাঃ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না, কেননা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আপনি সম্পর্ক রক্ষা করে অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন, অসহায়দের আশ্রয় দান করে মেহমানদের আদর-যত্ন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা প্রদান করেন এবং ঋণগ্রস্তদের দায়মোচনে সাহায্য করেন, যারা সত্যের পথে থাকে তাদেরকে আপনি সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না"।

ইবনু হাজার আসকালানী রঃ বলেন, এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি হলেন খাদিজা রাঃ।

এরপর খাদিজা রাঃ রাসূল সাঃ তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল এর কাছে নিয়ে গেলেন। ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল তাওরাত ও ইঞ্জিলের উপরে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং ঈসা আঃ আনীত ধর্ম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখতেন। খাদিজা রাঃ তাঁকে তিনি সবকিছু খুলে বললেন। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, "ভাতিজা, বলতো তুমি কী দেখেছ? কী হয়েছে তোমার?" তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ হেরা গুহায় তাঁর সাথে যা ঘটেছিল তার সমস্ত কিছু খুলে বললেন। এসব কিছু শোনার পরে তিনি বললেন, "এইতো সেই নামূস (বার্তাবাহক) যিনি আগমন করেছিলেন মূসার (ভিন্ন বর্ণনায়-ঈসার) কাছে। যেদিন তোমার স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোকেরা তোমার উপর নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন করবে এবং তোমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে সেদিন যদি আমি শক্তিমান এবং জীবিত থাকতাম তবে অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করতাম"।

ওয়ারাকার মুখ থেকে একথা শুনে রাসূল সাঃ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে!?" ওয়ারাকা বললেন, "হ্যাঁ তারা অবশ্যই তোমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। শুধু তুমি নয়, অতীতে এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে। যখনই সমাজে সত্যের বার্তা নিয়ে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে তখনই তার স্বগোত্রীয় লোকেরা তার ওপর নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। মনে রাখো আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে সর্বপ্রকারে তোমাকে সাহায্য করবো"।

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ওয়ারাকা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূল সাঃ এর উপর ঈমান এনেছিলেন।

প্রথম ওহী নাযিলের দিন-ক্ষণঃ

রাসূল সাঃ এর বয়স ৪০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর রবিউল আউয়াল মাসেই প্রথম স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী আসা শুরু হয়। তবে জাগ্রত অবস্থায় ঠিক কোন সময়ে প্রথম রাসূল সাঃ এর উপর ওহী নাযিল হয় তা নিয়ে

সীরাহবিদগণের মাঝে মতভেদ আছে। এই সংক্রান্ত মতগুলি হল-

১) ৮ই রবিউল আউয়াল মাস (ইবনে আব্দুল বার এর মত)

২) রমযান মাস (৭ তারিখ/১৭ তারিখ- ইবনে ইসহাক এর মত/১৮ তারিখ/১৪ তারিখ/২১ তারিখ/২৮ তারিখ)

৩) রজব মাস

তবে এর মধ্যে রমযান মাসের ৭/১৪/২১/২৮ তারিখে প্রথম জাগ্রত অবস্থায় ওহী আসার মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য কয়েকটি কারণে-

১) সূরা বাক্বারার ১৮৫ নং আয়াত এবং সূরা ক্বদরের ১ নং আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে কুরআন প্রথম নাযিল হয়েছে রমযান মাসে এবং লায়লাতুল কদরে।

২) বিশুদ্ধ হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল সাঃ এর নিকট প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় সোমবার। পঞ্জিকামতে, ঐ বছরের রমযান মাসে সোমবার ছিল ৭, ১৪, ২১ ও ২৮ তারিখে। আরেকটি বিশুদ্ধ হাদীস থেকে জানা যায়, লায়লাতু ক্বদর হল রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিতে। তাই উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য করে আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী রঃ বলেছেন, রাসূল সাঃ এর উপর প্রথম ওহী আসার নির্দিষ্ট তারিখ হল ২১ রমযানের রাত্রি। আল্লাহই সর্বাধিক ভাল জানেন।

প্রথম ওহী নাযিলের ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষাঃ

১) দৈনন্দিন কর্মমুখর জীবনের ক্লান্তি ও অবসাদ যখন আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলে তখন আমাদের উচিত কিছুদিনের জন্য কাজ থেকে ছুটি নিয়ে একাকী অবস্থান করা, অথবা প্রকৃতির কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যাওয়া, আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করা, ইবাদাত ও আমলের দিকে মনোনিবেশ করা। ইসলাম যেমন বৈরাগ্যবাদকে সমর্থন করে না তেমনি কাজের চাপে

ক্রমাগত ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকাও পছন্দ করে না। তাই এই দুই এর মাঝে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে আমাদেরকে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।

২) মানুষের পক্ষ থেকে আগত বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে এবং আল্লাহর অপদস্থতা থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম মাধ্যম হল খিদমতে খালক্ব। সৃষ্টির সেবা করার মাধ্যমেই আল্লাহর আযাব ও মানুষ প্রদত্ত শাস্তি থেকে নিরাপত্তা আসে।

৩) কারও জীবনে যদি উল্লেখযোগ্য কোন প্রাপ্তি আসে বা ঘটনা ঘটে যায় তবে তার উচিত সবার আগে তার স্ত্রীর সাথে তা শেয়ার করা, যদি স্ত্রী দ্বীনদার ও বুঝদার হয় এবং এরপর তা ঐ বিষয়ে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান কারও সাথে শেয়ার করা। একজন নেককার স্ত্রী যেভাবে স্বামীকে প্রশান্তি যোগাতে পারে অন্য কারও পক্ষে তা সম্ভব নয়।

৪) কারও জীবনে বিরল কোন ঘটনা ঘটে গেলে তার উচিত একজন আল্লাহওয়ালা বড় আলিম ও বুজুর্গের সাথে সেই বিষয়ে পরামর্শ করা।

৫) অপরিচিত জ্ঞানী ব্যক্তি বা 'আলিম কিংবা বুজুর্গের সাথে সাক্ষাতের সময় সরাসরি একাই না গিয়ে তাঁর পরিচিত কাউকে নিয়ে যাওয়া উত্তম। এতে উভয়পক্ষের কথাবার্তা সহজ হয় এবং দ্রুত সমাধান পাওয়া যায়।

৬) বয়সে ছোট কেউ মর্যাদার দিক থেকে বড় হলেও তাকে সন্তানসুলভ বা স্নেহের সম্বোধন করা বৈধ। একারণেই রাসূল সাঃ এর নবুওয়াতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরও ওয়ারাকা তাঁকে يا ابن اخي ভাতিজা) বলে সম্বোধন করেছেন।

৭) মানুষের জন্য কোন ভাল কাজের নিয়্যাত করা বৈধ, যদিও সেই কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ/অবকাশ না থাকে।

৮) মুসলিম উম্মাহ হল জ্ঞানভিত্তিক উম্মাহ। এই উম্মাহর পথচলা শুরু হয়েছে "পড়ো" আয়াত দিয়ে। অথচ এখন পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে কম পড়ুয়া জাতি হচ্ছে মুসলিম জাতি। দ্বীন ও দুনিয়াবি উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞানের পশ্চাদপসরতা মুসলিমদের পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ। তাই, আমাদেরকে আমাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে দ্বীনের ইলম অর্জন করে যেমন ঈমান ও আমলে বলীয়ান হতে হবে, তেমনি দুনিয়াবী শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে।

সাময়িকভাবে ওহী আসা বন্ধ হয়ে যাওয়াঃ

প্রথমবার ওহী আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ঠিক কতদিন পর দ্বিতীয়বার ওহী এসেছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। এই সংক্রান্ত মতগুলি হল-

১) ২.৫ বছর

২) ৩ বছর

৩) ১০ দিন (অর্থাৎ ১লা শাওয়াল, শুক্রবার দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে ওহী আসে)

এই মতগুলির মধ্যে ১০ দিনের মতটিকেই সফিউর রহমান মুবারাকপুরি রঃ অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

ওহী বন্ধ থাকার সময় রাসূল সাঃ অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিচলিত বোধ করতেন। সহিহ বুখারীর একটি হাদীসে রয়েছে, ওহী বন্ধ হয়ে গেলে রাসূল সাঃ এতই বিচলিত হতেন এবং তার দুশ্চিন্তা এত বৃদ্ধি পেত যে, পর্বত শিখর হতে মৃত্যুবরণ করার জন্য তিনি মনস্থির করে ফেলতেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে যখনই তিনি পর্বতের শীর্ষে আরোহণ করেছেন তখন জিবরীল তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছেন। জিবরীল তাঁকে বলেছেন, "আপনি আল্লাহর সত্য নবী"। একথা শুনে তাঁর অন্তর প্রশান্ত হয়ে যেত এবং তিনি প্রশান্ত মনে ঘরে ফিরে আসতেন। আবারও কোনো সময় কিছু বেশি দিন ওহী বন্ধ হয়ে গেলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতো।

ইবনে হাজার আসকালানী রঃ বলেন, "রাসূল সাঃ এর উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি কিছুটা ভয়-ভীতির সাথে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর মানসিকতার ক্ষেত্রে কিছুটা বিহ্বলতার ভাব দেখা যায়। এজন্যই আল্লাহ কিছুদিন ওহী নাযিল করা বন্ধ রাখেন যাতে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারেন। আর ঠিক তাই হয়েছিল। প্রথম ওহী নাযিলের অসুবিধা থেকে মুক্ত হয়ে যখন রাসূল সাঃ এর মন-মানসিকতা স্বাভাবিক হয়ে উঠলো এবং পুনরায় ওহী গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেল তখন পুনরায় জিবরীল ওহী নিয়ে আগমন করলেন"।

সহীহ বুখারীর বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাঃ বলছেন, "আমি পথ ধরে চলছিলাম এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ আমার শ্রুতিগোচর হল। আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে আমি সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম যিনি আমার নিকট হেরাগুহায় আগমন

করেছিলেন। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে কুরশীতে উপবিষ্ট ছিলেন। আমার দৃষ্টি অবনত হয়ে এল। তারপর আমি খাদিজার নিকট এসে বললাম, "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও"। তিনি আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে বস্ত্রাবৃত! ওঠো আর মানুষকে সতর্ক করো। তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো, তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো"। এভাবে আল্লাহ সূরা মুদ্দাসসির এর ১ থেকে ৭ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন। এরপর থেকে অবিরামভাবে ওহী আসতে থাকে।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে রাসূল সাঃ এর উপর দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ হয় সূরা মুযযাম্মিল এর প্রথম ১৯ টি আয়াত এবং এরপর সূরা মুদ্দাসসিরের আয়াতগুলি নাযিল হয়। অর্থাৎ সূরা মুযযাম্মিল এবং সূরা মুদ্দাসসির এর মধ্যে কোনটি আগে নাযিল হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ আছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাঃ

এই তিনটি সূরা (আলাক্ব, মুযযাম্মিল, মুদ্দাসসির) প্রথমে নাযিল হওয়ার মধ্যে সকল যুগের মুসলিমদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। আয়াতগুলির পর্যায়ক্রম লক্ষ্য করি-

১)পড়ো... (সূরা আলাক্বঃ১)

২)রাত্রিকালে সামান্য সময় ব্যতীত সালাতে দাঁড়াও... (সূরা আল মুযযাম্মিলঃ ২)

৩)দাঁড়াও এবং মানুষকে সতর্ক করো... (সূরা আল মুদ্দাসসিরঃ২)

মুসলিমদের প্রথম দায়িত্ব হল দ্বীন সম্পর্কে স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা। এরপর সেই জ্ঞানের উপর আমল করা এবং তারপর মানুষকে তার দিকে দাওয়াত দেওয়া। এই তিনটি কাজ পর্যায়ক্রমে হতে হবে। জ্ঞান ছাড়া যেমন আমল ও দাওয়াত বিশুদ্ধ হবে না তেমনি আমল ছাড়া শুধু পুঁথিগত জ্ঞান কোন উপকারে আসবে না বরং তা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে এবং দাওয়াতও ফলপ্রসু হবে না। আবার শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করে নিজে আমল

করলেও মানুষকে দাওয়াত না দেওয়ার কারণে আল্লাওর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই ইলম অর্জন, আমল ও দাওয়াহ- এই তিনটি কাজই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার দাবী রাখে।

রাসূল সাঃ এর গোপন দাওয়াতঃ

আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়ে রাসূল সাঃ ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করলেন। কুফর, শির্ক ও জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত সমাজে ব্যাপকভাবে তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্য প্রাথমিকভাবে দরকার ছিল একটা

ছোট দল, যারা ঈমানী চেতনা ও তাওহীদের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সকল যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেও ইসলামের উপর অটল থাকবে এবং মানুষকে দাওয়াত দিবে। এজন্য রাসূল সাঃ সর্বপ্রথম কাছের এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে ইসলামের দাওয়াত দান করেন। তাঁরা রাসূল সাঃ এর নবুওয়াতের উপর ঈমান এনে ইসলাম কবুল করেন। এতে রাসূল সাঃ এর অন্তর প্রশান্ত হয় এবং তিনি দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়ার সাহস অর্জন করেন।

এ সময় রাসুল এর উপর সালাত ফরজ করা হয় এবং তিনি সালাত আদায় করা শুরু করেন। প্রথমে দু'রাকাত করে সালাত ফরজ করা হয়, পরে তা বাড়ানো হয়। আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাঃ

এর উপর প্রথম পর্যায়ে দুই রাকাত করে সালাত ফরজ করা হয়। এরপর মুকিম অবস্থায় তা বাড়িয়ে চার রাকাত (মাগরিবের ক্ষেত্রে ৩ রাকাত) এবং মুসাফির অবস্থায় আগের মতো দুই রাকাত বহাল রাখা হয়।

দারুল আরকামে জমায়েতঃ

এভাবে যখন মুসলিমদের একটি ছোট দল তৈরী হয়ে গেল তখন রাসূল সাঃ সাহাবীগণকে নিয়ে সাফা পাহাড়ের উপর অবস্থিত আরকাম রাঃ এর গৃহে একত্রিত হতেন এবং সেখানে সালাত আদায় করতেন ও তাঁদেরকে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করে শোনাতেন। এই সময় সালাত ছাড়া আর অন্য কোন ইবাদাতের কথা জানা যায় না। এই সময়ে নাযিলকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ছিল তাওহীদের বর্ণনা, নওমুসলিমদেরকে উন্নত চরিত্র গঠন ও

আত্মশুদ্ধির পথে উদ্বুদ্ধকরণ, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এবং মুসলিমদেরকে যুলুম ও নির্যাতনের মুখে সবর করার জন্য মানসিক শক্তি যোগান দেওয়া।

ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দলঃ

একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীগণ হলেন-

১) খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাঃ

২) ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল রাঃ

৩) আলী ইবনে আবি ত্বালিব রাঃ

৪) আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা রাঃ

৫) যায়েদ বিন হারিসাঃ

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ রাসূল সাঃ এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকর রাঃ নিজেও জোরেশোরে দাওয়াতি কাজ শুরু করেন। তাঁর দাওয়াতে ইসলাম কবুল করেন- সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ, উসমান ইবনে আফফান রাঃ, যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাঃ এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ।

৬) সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ

৭) উসমান ইবনে আফফান রাঃ

৮) যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাঃ

৯) আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ

এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন-

আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ

আমের ইবনে জাররাহ

আরকাম ইবনে আবুল আরকাম

উসমান ইবনে মাযউন

কুদামা ইবনে মাযউন

আব্দুল্লাহ ইবনে মাযঊন

উবায়দা ইবনে হারিস

সাইদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল (উমার রাঃ এর ভগ্নিপতি)

ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (উমার রাঃ এর বোন)

আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ এবং আরও কয়েকজন।

এরপর কয়েকজন ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন-

বিলাল ইবনে রাবাহ রাঃ

খাব্বাব ইবনুল আরাত রাঃ

উম্মু আইমান বারাকাত রাঃ

আমির বিন ফুহাইরা রাঃ

ইয়াসির রাঃ এবং তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া রাঃ ও পুত্র আম্মার ইবনে ইয়াসির রাঃ।

প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম আহ্বানঃ

যখন ঈমানী চেতনায় দৃপ্ত মুমিনদের একটি দল সৃষ্টি হল এবং তাদের রিসালাতের দাওয়াতের বোঝা বহনের মত যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জিত হল তখন আল্লাহ রাসূল সাঃ কে আদেশ দিলেন প্রকাশ্যে দাওয়াতি কাজ শুরু করার জন্য। এই বিষয়ে আল্লাহ অবতীর্ণ করেন সূরা আশ শুয়ারা-র ২১৪ নং আয়াত। আল্লাহ নির্দেশ দেন-

وَ انْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنُ

অর্থঃ এবং তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো। (সূরা আশ শু'আরা, ২৬:২১৪)

সূরা শুয়ারার উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল সাঃ তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে হাসিমুখে একত্রিত করে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেই সম্মেলনে বনু মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ সহ কুরাইশদের প্রায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের শুরুতে দ্বীনের কথা আলোচনা শুরু করবেন এমন মুহূর্তে আবু লাহাব বলে উঠলেন, "দেখো, এরা সকলেই তোমার নিকটাত্মীয়। বাচালতা বাদ দিয়ে এদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বার্তা বলার চেষ্টা করবে। তোমার জানা উচিত যে, তোমার জন্য সকল আরববাসীদের সাথে শত্রুতা করার শক্তি আমাদের নেই। তোমার আত্মীয় স্বজনদের পক্ষে তোমাকে ধরে কারারুদ্ধ করে রাখা কর্তব্য। সুতরাং তোমার জন্য তোমার পিতৃপরিবারই যথেষ্ট। তুমি যদি তোমার ধ্যান ধারণা এবং কথাবার্তায় অটল থাকো তবে এটা অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক যে সমগ্র কুরাইশ গোত্র তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে এবং অন্যের আরব গোত্র এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। তারপর এটা আমার জানার বিষয় নয় যে, স্বীয় পিতৃপরিবারের অন্য কেউ তোমার চেয়ে বড় সর্বনাশা হতে পারে"। রাসূল সাঃ চুপ করে এসব কথা শুনলেন এবং সেদিনের মত সম্মেলন সেখানেই শেষ হয়ে গেল।

প্রকাশ্যে দাওয়াতের দ্বিতীয় আহ্বানঃ

আবু তালিবের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়ে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্বতের উপরে উঠলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে يا صباحة চিৎকার করে সবাইকে ডাকলেন। তৎকালীন যুগে আরবের একটি নিয়ম ছিল, কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিতে হলে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে يا صباحة বলে চিৎকার দিতে হতো।

লোকজন সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলে, তিনি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় সকলকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তিনি চিৎকার করে ডাকায় যারা তার চিৎকার শুনতে পেলো, তারা প্রত্যেকেই উপস্থিত হলো। যারা উপস্থিত হতে পারল না, তারা প্রতিনিধি প্রেরণ করল।

সভায় সকলেই উপস্থিত হলে রাসূল বললেন, "কুরাইশ বংশীয় তোমরা বলো আর যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে পর্বতের অন্য দিক থেকে শত্রু বাহিনী তোমাদের সব কিছু লুটে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। তাহলে তোমরা আমার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?"

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে দেখিনি।"

তখন তিনি গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "যদি তাই হয় তবে শ্রবণ করো আমি তোমাদেরকে অবশ্যম্ভাবী কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে প্রতিটি গোত্র-উপগোত্রকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে বললেন, "তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো এবং তোমাদের নিজেদের সঁপে দিয়ে তাঁর (রবের) সন্তুষ্টি অর্জন করো। তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। কেননা আমি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারিনা।"

হজযাত্রীদের কে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত:

রাসূল (সাঃ) এর প্রকাশ্য দাওয়াতের কয়েক মাসের মধ্যেই হজের মৌসুম চলে আসলো। হজের মৌসুমে আরব ভূমির দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দলেরা আসতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের নিকটে এই নতুন ধর্মের দাওয়াত দেন।

বিভিন্ন গোত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারে- এই অজানা আশঙ্কায় তারা ভীত কম্পিত হয়ে উঠলো। কিভাবে হজ যাত্রীদের এই দাওয়াত থেকে বিরত রাখা যায়, এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করার জন্য তারা ওয়ালিদ বিন মুগীরার ঘরে একত্রিত হল।

ওয়ালিদ বিন মুগীরা বললেন, "তোমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসো। যেন হজযাত্রীদের-কে তোমরা কি বলবে, তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ না থাকে। এবং একজনের কথা অন্যজন যেন মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে।"

সবাই বলল, "আপনি একটা কথা ঠিক করে দেন। তাহলেই তো আমাদের সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে।"

তিনি বললেন, "না তা হবে না। বরং তোমরা বলবে আর আমি তা শুনবো।"

সবাই তখন বললেন, "তাহলে আমরা কি বলব?"

তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ! তার কথাবার্তা বড়ই মিষ্টি মধুর। তার ভিত্তি অনেক গভীরে এবং শাখা-প্রশাখা মনঃমুগ্ধকর। তোমরা তার সম্পর্কে যা কিছুই বলোনা কেন, যারা তার সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকবে তারা তার কথাবার্তা অবশ্যই মিথ্যা মনে করবেনা।"

তারপর কিছুক্ষন ভেবে তিনি বললেন, "তার সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয় তাহলে জাদুকর বলতে পারো।"

তারা এটাকে কিছুটা উপযোগী মনে করল। তিনি এমন সব কথা বলছেন, যা সত্যিকার অর্থে জাদু বলেই মনে হয়। তার কথা পিতা ও পুত্রের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, ভাই ভাইয়ের মধ্যে, গোত্রে গোত্রে স্বজনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। শেষ পর্যন্ত, তারা তাকে জাদুকর বলার মত বড় সিদ্ধান্তে একমত হয়।

মক্কার কাফেররা তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করল। মক্কায় আগমনকারী হজযাত্রীদের পথের পাশে কিংবা পথের মোড়ে মোড়ে নবী (সাঃ) এর ইসলামের প্রচার এবং তাবলীগের ব্যাপারে যাচ্ছেতাই বলে বিভ্রান্ত করতে শুরু করল। তারা রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বহু কথা বলতে থাকল। তারা হজযাত্রীদের বিভিন্ন বাজারে তাওহীদের বাণী প্রচারে বাধা প্রদান করতে শুরু করল।

রাসূল (সাঃ) এর সাথে উতবা ইবনে রাবিয়ার আলোচনাঃ

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাঃ) একদিন মসজিদে হারামে একাকী বসে ছিলেন। তখন উতবা ইবনে রাবিয়া কুরাইশদের মজলিসে গিয়ে বলল, "আমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। এ ব্যাপারে তোমাদের মত কি? আমি তার সামনে কিছু প্রস্তাব রাখবো। আশা করি সে তার কিছু না কিছু গ্রহণ করবে। সে যে সুবিধা চায়, তা আমরা তাকে দেব। ফলে সে আমাদের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকবে।" তারা বলল, "ঠিক আছে তুমি যাও এবং তার সাথে কথা বল।" উতবা এসে রাসূল সাঃ এর কাছে বসল এবং আলাপ শুরু করল। সে বলল, "হে আমার প্রিয় ভাতিজা! তুমি আমাদের সাথে বংশীয় বন্ধন এবং আত্মীয়তার মর্যাদার দিক দিয়ে কোন পর্যায়ে আছ তা তোমার জানা আছে। তুমি তোমার কওমের সামনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করেছ, যা দিয়ে তুমি তাদের দলকে বিভক্ত করছ। তাদের জ্ঞানীদের বোকা সাব্যস্ত করেছ। তাদের ধর্ম দেবদেবীর নিন্দা করেছ এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কাফির বলে অভিহিত করেছ। এখন আমার কথা শোনো! আমি

কয়েকটি প্রস্তাব তোমার কাছে তোমার বিবেচনার জন্য রাখছি। হয়তো এর থেকে কিছু তুমি গ্রহণ করবে।" তখন রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, "বলুন, আমি শুনছি।"

উতবা বলল, "আমার প্রিয় ভাতিজা! তুমি যে ব্যাপারটি নিয়ে এসেছ, তার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে তুমি বিত্তশালী হতে চাও, তাহলে আমরা তোমার জন্য এত সম্পদ ব্যবস্থা করে দেবো যাতে তুমি আমাদের মাঝে সবচাইতে ধনী হয়ে যাও। যদি পদমর্যাদা চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দেব এবং তোমাকে বাদ দিয়ে কোন ব্যাপারেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব না। যদি রাজা হতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে রাজা বানিয়ে নেব। আর যদি মনে করো যে ব্যক্তিটি (জিবরীল) তোমার কাছে আসে, যাকে তুমি দেখতে পাও সে এমন কেউ যাকে তুমি প্রতিহত করতে অক্ষম, তাহলে আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। এতে আমাদের যত অর্থ খরচ হোক না কেন, আমরা এর থেকে তোমাকে মুক্ত করবোই"। এভাবে সে আরও নানা কথা রাসূল (সাঃ) কে বলেন। রাসূল নিবিষ্টচিত্তে তার কথা শুনছিলেন। তার কথা শেষ হলে রাসূল (সাঃ) বললেন, "হে আবুল ওয়ালীদ! আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?"

সে বলল, "হ্যাঁ!"

তখন রাসূল বললেন, "তাহলে আমার বক্তব্য শুনুন।" এই বলেই তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা হা-মীম সিজদার ১ থেকে ১৩ নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

উতবা পিঠের পেছনে হাত রেখে হেলান দিয়ে শেষ পর্যন্ত শুনলেন। তারপর রাসূল সাঃ বললেন, "হে আবুল ওয়ালিদ! শুনলেন তো। এখন আপনি বিবেচনা করুন।" উতবা সেখান থেকে উঠে কুরাইশ নেতাদের কাছে ফিরে গেলেন। তখন তারা বলতে লাগল, "আল্লাহর কসম! আবুল ওয়ালিদ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, এখন তা থেকে ভিন্ন চেহারা নিয়ে এসেছে।" তাদের কাছে বসলে তারা বলল, "হে আবুল ওয়ালিদ। সেখানকার খবর কি?" উতবা বলল, "সেখানকার খবর এই যে, আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, তার থেকে যে কথা আমি শুনেছি, তা একদিন বিপুল খ্যাতি অর্জন করবে। আর যদি কেউ তার ক্ষতি সাধন করে তাহলে তোমরা মনে করবে যে, তারা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করে দিয়েছে। আর যদি সে বিজয়ী হয় তবে তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান তোমাদেরই হবে। তেমন হলে তোমরা সবচেয়ে সুখী ও সৌভাগ্যশালী জাতিতে পরিণত হবে।"

একথা শুনে সবাই বলল, "আল্লাহর কসম! সে তোমাকে নিজের কথা দিয়ে জাদু করেছে মনে হচ্ছে।"

তিনি বললেন, "এ আমার অভিমত। এখন তোমাদের যা ভালো মনে হয় তাই করো।"

ইহুদী আলিমদের কাছে কুরাইশদের গমনঃ

নাযার ইবনে হারিসের এই কথার পর কুরায়েশ নেতারা তাকে ও তার সাথে উকবা ইবনে আবী মুয়াইত কে মদিনার ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে পাঠাল, যেন তারা মুহাম্মদের নবুওয়াতের নিশ্চয়তা সম্পর্কে জেনে আসতে পারে। তারা মদীনায় গিয়ে ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে সবকিছু খুলে বললো এবং তারা জানতে চাইল কিভাবে তারা মুহাম্মাদ সাঃ এর নবুওয়াত সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। ইহুদি পণ্ডিতরা বলল, "আমরা তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ের কথা বলে দিচ্ছি, তোমরা তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। যদি সে এগুলো তোমাদের জানাতে পারে তাহলে সে নিশ্চিত ভাবেই একজন নবী। আর যদি সে জানাতে না পারে, তবে তোমরা মনে করবে, সে একজন ভন্ড। তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করবে, এমন কতিপয় যুবক সম্পর্কে যারা প্রাচীনকালে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। তাদের ব্যাপারটা কি? আর তোমরা তাকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছিল। তার ব্যাপারটা কি? আর তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করবে, রূহ কি জিনিস? যদি সে এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে, তবে সে নিঃসন্দেহে নবী। তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে। আর যদি সে তোমাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিতে পারে, তবে সে একজন ভণ্ড প্রতারক। তখন তোমরা তাঁর ব্যাপারে যা ভালো মনে হয় তাই করবে।"

এরপর নজর ইবনে হারিস ও উকবাহ ইবনে আবী মুয়াইত মক্কায় ফিরে কুরাইশদেরকে এই বিষয়ে জানালো। কুরায়েশ নেতারা এরপর রাসূলের কাছে গেল এবং জিজ্ঞেস করল, "হে মুহাম্মাদ! প্রাচীনকালে যে একদল যুবক গায়েব হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করো। আর একজন পর্যটক এর কাহিনী শোনাও। যিনি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন। আর আমাদেরকে জানাও রুহ কি?"

রাসূল (সাঃ) তাদেরকে বললেন, "তোমরা আমাকে যা যা জিজ্ঞেস করেছ, তা আমি তোমাদের আগামীকাল জানাবো।" কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ কথাটি বলতে ভুলে গেলেন। একথা শুনে কুরাইশরা তার কাছ থেকে চলে গেল। এভাবে পনের দিন কেটে গেল আল্লাহর পক্ষ থেকে

তার কাছে কোনো ওহী আসলো না এবং জিবরীলও আসলেন না। রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত অস্থির হয়ে গেলেন এবং চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মক্কাবাসীদের কথাবার্তাও তার কাছে বিব্রতকর হয়ে উঠলো। অবশেষে জিবরীল আল্লাহর পক্ষ থেকে সূরা কাহাফ নিয়ে এলেন এবং এই সূরার মাধ্যমে কুরাইশদের সকল প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাঃ) কে শিক্ষা দিলেন এবং এও বলে দিলেন, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে যেন কখনোই আর ইনশাআল্লাহ বলতে না ভুলে যান। কিন্তু সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়েও কুরাইশরা ঈমান আনলো না।

কুরাইশ নেতাদের গোপনে কুরআন পাঠ শ্রবণঃ

ইবনে ইসহাক বলেন, একদিন রাতে আবু সুফিয়ান, আবু জাহাল এবং আখনাস ইবনে শুরায়ক রাসূলের কুরআন শুনতে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তারা একে অপরের কথা কেউই জানত না। এসময় রাসূল (সাঃ) নিজের ঘরে রাতের সালাত আদায় করছিলেন। এই তিনজনের প্রত্যেকে আলাদা আলাদা জায়গায় বসে রাসূল (সাঃ) এর কোরআন শুনতে লাগল। এভাবে কোরআন শুনতে শুনতে তারা সারা রাত কাটিয়ে দিলো। যখন ভোর হলো। তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু পথিমধ্যে সকলের দেখা হয়ে গেল। তখন তারা পরস্পরকে তিরস্কার করে বলল, "খবরদার এমন কাজ আর কখনো করবে না। যদি নির্বোধ লোকেরা তোমাদেরকে দেখে ফেলে তাহলে তাদের মনে তোমাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে।" একথা বলে সবাই নিজ নিজ ঠিকানায় চলে গেল। পরদিন রাতে আবার তিনজন নিজ নিজ গোপন জায়গায় গিয়ে বসলো এবং সারা রাত কোরআন তেলাওয়াত শুনলো। তারপরে ভোরবেলা বের হলে আবার দেখা হয়ে গেল। এরপর আবার আগের দিনের মতো কথাবার্তা বলে চলে গেল। তৃতীয় দিনও একই ঘটনা ঘটল। এবারও তারা আগের মতো অংগীকার করে যার যার পথে চলে গেল। পরদিন সকালে আখনাস ইবনে শুরায়ক লাঠি নিয়ে রওনা হলো এবং আবু সুফিয়ান কে বললো, "হে আবু হানজালা! তুমি মুহাম্মদ এর কাছ থেকে যা শুনলে সে সম্পর্কে তোমার মতামত জানাও।" সে বলল, "হে আবু সালাবা! শোনো, আল্লাহর কসম! কিছু কথা এমন শুনলাম যা আমি জানি এবং তার অর্থ বুঝি। আর কিছু কথা এমন শুনলাম যার অর্থ ও মর্ম আমার জানা নেই।" তখন আখনাস বলল, "আল্লাহর কসম! আমার অবস্থাও এমন।"

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতঃ

নবুওয়াতের ৪র্থ বর্ষের মধ্যভাগ কিংবা শেষভাগ থেকেই কাফিরদের অত্যাচার শুরু হয়েছিল। নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে গিয়ে তা একেবারে চরম আকার ধারণ করে এবং সাহাবীগণের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এভাবে একটা পর্যায়ে যখন দ্বীন ইসলাম ও ঈমানের উপর কায়েম থাকা জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠল তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন-

বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত। (সূরা যুমার, ৩৯:১০)

এই আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদেরকে নিরাপদ ভূমিতে পাড়ি জমানোর অনুমতি দিলেন। এই সময় রাসূল সাঃ সাহাবীদেরকে বললেন, "তোমরা আল্লাহর যমীনের কোথাও হিজরত করে চলে যাও। শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন"। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কোথায় যাব?" রাসূল সাঃ তখন আবিসিনিয়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, "সেখানে এক ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আছে যার সাম্রাজ্যে কেউ কারও উপর যুলুম করতে পারে না"।

অবশেষে নবুওয়াতের ৫ম বর্ষের রজব মাসে ১৬ জন সাহাবীর একটি দল আবিসিনিয়ার পথে পাড়ি জমান। এই দলে ছিলেন ১১ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী।

১৬ জনের এই দলটি গোপনে মক্কা থেকে রওনা হলেন। তাদের কেউ বাহনে আবার কেউ হেঁটেই রওনা দিলেন। জেদ্দার সমুদ্র বন্দরে গিয়ে তাঁরা দেখলেন সেখানে দুটি জাহাজ আবিসিনিয়া যাওয়ার জন্য নোঙ্গর করে আছে। পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে তারা সাহাবীদের এই দলটিকে জাহাজে তুলে নিলেন। ওদিকে কুরাইশরা খবর পেয়ে সাহাবীদের এই দলটিকে ধরার জন্য রওনা দিল। কিন্তু তারা বন্দরে পৌঁছার পূর্বেই জাহাজ ছেড়ে দিল এবং সাহাবীগণ নিরাপদে আবিসিনিয়া গিয়ে পৌঁছলেন। এই দফায় তাঁরা রজব থেকে শাওয়াল মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

হিজরতের ভূমি হিসেবে কেন আবিসিনিয়াকে পছন্দ করা হলঃ

১) আবিসিনিয়ার তৎকালীন সম্রাট নাজাশি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ন বাদশাহ। তাঁর রাজ্যে কেউ কারও উপর যুলুম করতে পারত না। তাই শান্তিতে দ্বীন পালনের জন্য আবিসিনিয়া ছিল একটি উত্তম ভূমি।

২) কুরাইশদের সাথে আবিসিনিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তাই আবিসিনিয়া মুসলিম সাহাবীদের জন্য পুরোপুরি নতুন কোন স্থান ছিল না। আবিসিনিয়ার ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের ভালই ধারণা ছিল।

৩) আবিসিনিয়া ছিল মক্কা থেকে অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত। মক্কা থেকে জেদ্দা যেতে সময় লাগত ১.৫ দিন আর জেদ্দা সমুদ্রবন্দর থেকে জাহাজে আবিসিনিয়া যেতে সময় লাগত ৫-৭ ঘণ্টা। অর্থাৎ মাত্র ২ দিনের মধ্যেই মক্কা থেকে আবিসিনিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু অন্য কোন দেশ হলে দিনের পর দিন, এমনকি মাসও লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

৪) আবিসিনিয়ার বাদশাহ ও জনগণ ছিল খৃষ্টান, তারা কুরাইশ কাফিরদের ন্যায় মুশরিক ছিল না। আহলে কিতাব হিসেবে তারা মুসলিমদের নিকটবর্তী ছিল। আল্লাহ বলেন-

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

অর্থঃ আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না। (সূরা আল মায়িদা, ৫:৮২)

একটি ভুল বোঝাবুঝি ও মুহাজির সাহাবীদের খেসারতঃ

একই বছর রমযান মাসে একদিন রাসূল সাঃ কাবা ঘরের সামনে গিয়ে কুরাইশদের মজলিসে সশব্দে সূরা নাজম তিলাওয়াত করতে শুরু করেন। কুরাইশগণ কুরআনের অলৌকিক ভাষা মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে যায় এঅর্থঃবং তারা নিবিষ্ট মনে বাকরুদ্ধ হয়ে কুরআন শুনতে থাকে। এভাবে রাসূল সাঃ সূরা নাজমের শেষ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। আয়াতটি ছিল-

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

অতএব আল্লাহকে সেজদা কর এবং তাঁর এবাদত কর। (সূরা নাজম, ৫৩:৬২)

এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর রাসূল সাঃ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহ দিলেন এবং হত বিহ্বল কাফিরগণও (ইবনে আব্বাসের মতে, জ্বীনেরাও তখন সিজদাহ করেছিল) সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেল। একমাত্র ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা (ভিন্ন বর্ণনায়- উমাইয়া ইবনে খালাফ) সিজদা করল না কিন্তু সে একমুঠ ধুলা নিয়ে কপালে লাগিয়ে বলল- "এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট"। কিন্তু সিজদা থেকে ওঠার পর তাদের হুঁশ ফিরল এবং তারা বুঝতে পারল যে, এখন নির্বোধ লোকেরা তাদেরকে ছিঃ ছিঃ করতে শুরু করবে। বাস্তবে হলও তাই। সাধারণ মানুষজন কুরাইশ কাফিরদেরকে তিরষ্কার ও ভর্ৎসনা করতে শুরু করল। এই মানসিক যন্ত্রণা ও অপমান থেকে মুক্তির জন্য তারা তখন এক মিথ্যাচারের ফন্দি আঁটল। তারা রটিয়ে দিল যে, মুহাম্মাদ সাঃ কুরাইশদের দেবদেবীর প্রশংসাকীর্তন করে বলেছে-

تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجَى

(এরা সব উচ্চ পর্যায়ের দেবদেবী, তাদের শাফা'আতের আশা করা যায়।)

এ ছিল নেহায়েত মিথ্যা ও ডাহা অপপ্রচার। মূলত তারা সাধারণ মানুষজনকে বোঝাতে চাইছিল যে, মুহাম্মাদ সাঃ যখন উপরোক্ত কথাটি বলেছে তখনই তারা সিজদায় পড়ে গিয়েছে, তারা আসলে কুরআন শুনে সিজদাহ করে নি!

কুরাইশদের সিজদাহ করার এই ঘটনাটি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে আবিসিনিয়ার মুসলিমদের কানে পৌঁছল। তারা খবর পেল যে, মক্কার কুরাইশদের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই খবর শুনে তারা নিশ্চিন্তে দেশে ফিরে আসার জন্য রওনা দিল। মক্কার কাছাকাছি এসে তারা খবর পেল যে, তাদের প্রাপ্ত সংবাদ ছিল ভুল এবং কুরাইশ নেতারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। এই খবর শুনে তারা দারুণ দোটানায় পড়ে গেল। এখন আবিসিনিয়া ফিরে যাওয়াও কঠিন আবার মক্কায় প্রবেশ করলেও দ্বিগুণ অত্যাচার-নির্যাতনের নিশ্চিত খড়গ। তবুও কিছু সংখ্যক সাহাবী পুনরায় আবিসিনিয়া ফিরে গেলেন এবং বাকিদের কেউ কেউ গোপনে, কেউবা আবার আত্মীয়-স্বজনদের নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। এই দফায় ৩৩ জন পুরুষ এবং ৬ জন মহিলা- মোট ৩৯ জন সাহাবী মক্কায় ফিরে আসলেন।

সাহাবীগণ প্রথম দফা হিজরত করার পর কুরাইশরা খবর পেয়েছিল যে তাঁরা আবিসিনিয়ায় অত্যন্ত সমাদরের সাথে গৃহীত হয়েছেন এবং নিরাপদে দ্বীন পালন করছেন তখন তারা বিদ্বেষের আগুনে ফুটছিল। এবার মুহাজিরদের হাতের নাগালে পেয়ে তারা আগের চেয়েও কঠোর অত্যাচার শুরু করল। এমনকি মুহাজিরদের আত্মীয়-স্বজনও রেহাই পেল না। অবশেষে নির্যাতনের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে রাসূল সাঃ পুনরায় সাহাবীদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দিলেন।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতঃ

রাসূল সাঃ এর আদেশ পাওয়ার পর সাহাবীগণ পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরতের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। কিন্তু এবার কুরাইশরা তাঁদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য ছিল অত্যন্ত তৎপর এবং সচেতন। তবুও আল্লাহর রহমতে দ্বিতীয় দফায়ও সাহাবীগণ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় পৌঁছতে সক্ষম হলেন। এই দফায় ৮২/৮৩/৮৬ (ইবনে হিশামের বর্ণনায়-৮৬) জন পুরুষ এবং

১৬/১৮/১৯ (আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরী-র মতে ১৮ জন এবং ইবনে হিশামের মতে ১৬ জন) জন মহিলা হিজরত করেন।

সাহাবীদেরকে আবিসিনিয়া থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য কুরাইশদের ঘৃণ্য চক্রান্তঃ

আবিসিনিয়ায় গিয়ে বাদশাহ নাজাশির কাছে মুহাজির মুসলিমদের নামে অভিযোগ দায়ের করে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য কুরাইশরা আমর বিন আস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাবি'য়াহ-কে দূত মনোনীত করে। তাদের কাছে নাজাশি এবং তার উপদেষ্টাবর্গের জন্য অনেক মূল্যবান উপহারও দিয়ে দেয় তারা। নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে তারা তাদের সকল মিথ্যা বিবরণ ও মিথ্যা প্রমানাদি উপস্থাপন করলো আর পুরোহিতগণকে বিপুল পরিমাণে উপঢৌকন প্রদান করল, যদিও সে সকল বিবরণ একেবারেই মিথ্যে ছিল

তবুও বিপুল পরিমাণে উপঢৌকন পাওয়ায় পুরোহিতগণ সিদ্ধান্ত নিলেন তারা মুসলিমদেরকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সম্রাটকে পরামর্শ দিবেন। পুরোহিতের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে কুরাইশ দূতগণ বাদশা নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হল। তারা বাদশাহ নাজাশিকে বলল-

'হে মহামান্য সম্রাট! আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক অবোধ ও অবাচীন যুবক আমাদের দেশ থেকে পলায়ন করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁরা তাদের পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে। আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে আপনার ধর্মমতও গ্রহণ করেননি। এ হচ্ছে তাঁদের চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, এরা নাকি একটি ধর্মমতও আবিষ্কার করেছেন। এর চেয়ে আজগুবি ব্যাপার আর কী হতে পারে বলুন? আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে ওদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আমাদের প্রধানগণ এঁদের ভালোমন্দ সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝেন এবং তাদের অসন্তোষের ব্যাপারে ওয়াকেবহাল রয়েছেন।'

কুরাইশরা এই প্রস্তাব পেশ করার পর নাজাশির পুরোহিতগণ উপদেশ দিলেন এদের হাতে মুহাজির মুসলিমদের তুলে দেওয়ার জন্য। কুরাইশদের কথা শোনার পর নাজাশি কিছুক্ষণ

গভীর চিন্তা করলেন। এরপর বললেন, 'এই বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের পূর্বে কোন মন্তব্য করা কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না।'

একথা বলেই তিনি মুসলিমদেরকে তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য ডেকে পাঠালেন। মুসলিমগণ আল্লাহর উপর ভরসা করে সঠিক তথ্য প্রকাশের জন্য বাদশার দরবারে উপস্থিত হলেন।

সম্রাট নাজাশী তাঁর দরবারে উপস্থিত মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'যে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে পূর্ব পুরুষগণের বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্ম তোমরা পরিত্যাগ করেছ এবং এমনকি আমাদের দেশে আশ্রিত হয়েও তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছ সে ধর্মটি কোন ধর্ম?'

প্রত্যুত্তরে মুসলিমদের মনোনীত মুখপাত্র হিসেবে জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব রাঃ অকপটে বলে চললেন-

'হে সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা, অশ্লীলতা ও অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দুষ্কর্মশীল এক জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব-জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ করতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক পয়মাল করতাম এবং দূর্বলদের সহায় সম্পদ গ্রাস করতাম, এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিলাম তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে এক রাসূল প্রেরণ করলেন। তার বংশ মর্যাদা, সততা, সহনশীলতা, সংযমশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারীতা ইত্যাদি গুণাবলি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদের আহবান জানিয়ে বললেন যে, 'সমগ্র জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারো উপাসনা করবো না। বংশ পরম্পরা সূত্রে এ যাবৎ আমরা যে সকল প্রস্তর মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি সে সব বর্জন করব। অধিকন্তু মিথ্যা বর্জন করা, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অশ্লীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রক্তপাত পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

তাছাড়া মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক অপবাদ দেওয়া থেকেও বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা থেকে বিরত থাকার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। অধিকন্তু সালাত, রোযা এবং যাকাতের জন্যও তিনি আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।'

এইভাবে জা'ফার অত্যন্ত চিত্তোদ্দীপক এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের মূলনীতি এবং বিধি বিধানগুলো বর্ণনা করলেন।

সম্রাট নাজাশী বললেন সেই পয়গম্বর যা এনেছেন তার কিছু অংশ তোমাদের কাছে আছে কি? হযরত জা'ফর বললেন, "জি হ্যাঁ।"

নাজাশী বললেন, "তাহলে আমার সামনে পড়ে শোনাও।"

জা'ফর আল্লাহর সমীপে নিবেদিত এবং আত্মা-সমাহিত অবস্থায় সূরাহ মারিয়ামের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

নাজাশী এতই মুগ্ধ হলেন যে, তার চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দাড়ি ভিজে গেলো। জা'ফারের তেলাওয়াত শ্রবণ করে নাজাশীর ধর্মীয় মন্ত্রণাদাতাগণও এতই ক্রন্দন করেছিলেন যে, তাদের হাতে রক্ষিত কিতাব পত্রও ভিজে গেলো। অতঃপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নাজাশী বললেন, 'এ কালাম (বাণী) এবং সেই কালাম যা ঈসা (আ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো, উভয় কালামই এক উৎস হতে অবতীর্ণ হয়েছে।'

এরপর নাজাশী 'আমর বিন 'আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা যে দূরভিসন্ধি নিয়ে আমার দরবারে আগমন করেছ তা সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরে যাও। তোমাদের হাতে এদের সমর্পণ করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে এখানে কোনো কূট কৌশলেরও অবকাশ থাকবে না।'

রাসূল (সাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করলেন তখন আবিসিনিয়ার অধিকাংশ মুহাজির মুসলিম সংবাদ পাওয়া মাত্রই আবিসিনিয়া থেকে মদিনায় ফিরে এলেন। যাদের মধ্যে ২৪ জন সাহাবী

বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন। আর বাকিরা ৭ম হিজরিতে খাইবার বিজয় কালে জা'ফর রাঃ এর সাথে মদিনায় উপস্থিত হন।

জা'ফর যখন সপ্তম হিজরীতে আবিসিনিয়া থেকে মদিনা রওনা হলেন তখন নাজ্জাশী তাদের সবারই পথের খরচ এবং অতিরিক্ত উপহার উপঢৌকন এবং সাথে একজন দাস কে দিয়ে পাঠালেন। আর বললেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে যা কিছু করেছি রাসূলকে সব বলবে আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁর প্রতি আমার আবেদন তিনি যেন আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।' জাফর মদিনায় ফিরে আসার পর রাসূল তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, 'আমি জানিনা আজ আমি খাইবারের বিজয় বেশি খুশি হয়েছি না জাফরের প্রত্যাবর্তনে।' এরপর নাজ্জাশী যা করেছেন জা'ফর তার সবকিছুই রাসূলকে জানালেন সবকিছু শুনে এবং নাজাশির ইসলাম গ্রহণের কথা জানালেন। সবকিছু শুনে রাসূল (সাঃ) সাথে সাথে ওযু করলেন এবং তিনবার দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি নাজাশিকে মাফ করে দাও।' উপস্থিত সকল মুসলমান আমিন বললেন।

হিজরী ৯ম বর্ষের রজব মাসে নাজাশি ইন্তিকাল করেন। মিশরে যখন তাঁর লাশ খাটিয়ার উপর উঠানো হল তখন রাসূল সাঃ মদীনা থেকে তা দেখতে/জানতে পেরেছিলেন এবং মুসলিমদেরকে জানিয়েছিলেন। তিনি বাক্বি গোরস্থানে নাজাশির গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। রাসূল সাঃ তাঁর সমগ্র জীবনে এই একবারই গায়েবানা জানাযা আদায় করেছিলেন। নাজাশির পূর্বে কিংবা পরে আর কখনও এমনটি করেন নি।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমদের থেকে আমাদের জন্য শিক্ষাঃ

১) ইসলামের পথে টিকে থাকতে চাই অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তাঃ

সাহাবীদের মাঝে অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা ছিল। আর এ জন্যই তারা তাদের দ্বীনের উপর অটল ছিলেন। তারা জীবনের ভয়ে সত্যকে গোপন করেননি। এজন্যই নাজাশির কাছে গিয়ে তারা ঈসা আঃ কে নিয়ে মুসলিমদের আক্বীদা ও বিশ্বাসই তারা তুলে ধরেছেন অর্থাৎ সত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে তারা দুনিয়ার কোন মানুষকে ভয় করেননি।

২) ইসলামের সাথে সাঙ্ঘর্ষিক দেশীয় সংস্কৃতি বর্জনীয়ঃ

আবিসিনিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতির যেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো সাহাবীরা প্রত্যাখান করেছেন। তবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন বিষয়গুলো তারা গ্রহণ করেছেন। যেমনঃ ওই সময়ে নাজাশির দরবারে সিজদা করা আবিসিনিয়া বাসীদের জন্য খুব প্রচলিত একটি রীতি ছিল। অথচ সাহাবীরা নাজাশির দরবারে প্রবেশ করে সিজদা করেন নি। নাজাশি রেগে গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, 'আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করি না।'

৩) মুসলিমরা সর্বদা নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকবেঃ

মুসলিমরা যেখানেই থাকুক না কেন এবং যত অল্প সংখ্যাই থাকুক না কেন, তারা একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। আবিসিনিয়ার মুসলিমরা জাফর ইবনে আবি তালিব রাঃ এর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ ছিলেন।

হামজা ও উমার রাঃ এর ইসলাম গ্রহণ

মুসলিমদের উপর কুরাইশদের অত্যাচার নির্যাতন ক্রমেই বেড়ে চলছিল। যেসব সাহাবা আবিসিনিয়ায় হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা কুরাইশদের নির্যাতন থেকে রেহাই পেয়েছিলেন কিন্তু যারা তখনও মক্কায় ছিলেন তারা ছিলেন কুরাইশদের রোষানলে। এমন এক ক্রান্তিলগ্নে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যস্বরূপ মক্কার দু'জন প্রভাবশালী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলাম ও মুসলিমদেরকে শক্তিশালী করেন এবং ঘোর অমানিশার মধ্যে আশার আলো দেখান। এদের একজন হলেন হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাঃ এবং আরেকজন হলে উমার ইবনুল খাত্তাব রাঃ।

বয়কট

যখন কুরাইশরা আবিষ্কার করলো ঈমানদারদের মধ্যে কিছু লোক আবিসিনিয়া হিজরত করে সেখানে নিরাপদে আছে আর মক্কায় উমার ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা বুঝতে পারল যে ইসলাম দ্রুততার সাথে প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, নবীকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই। মরিয়া হয়ে রাসূলুল্লাহর ওপর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো। ইতিমধ্যেই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বনু হাশিমকে অনুরোধ করেছিল যেন মুহাম্মাদকে তাদের হাতে হস্তান্তর করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই বনু হাশিম কুরাইশদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরপর কুরাইশের বিভিন্ন গোত্র বনু হাশিম এবং বনু আল মুত্তালিব- এ দুটো গোত্রের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার ব্যাপারে চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। তবে আবু লাহাব রাসূলুল্লাহর আপন চাচা ও একই গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও তাকে বয়কট করা হয় নি, কারণ সে নিজেও ইসলামের একজন প্রধান শত্রু।

মক্কী জীবনের সপ্তম বছরে মুহাররাম মাসে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের সাথে সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়। চুক্তিতে ঠিক হলো- তাদের সাথে কোনো বাণিজ্য করা হবে না, তাদের কাউকে কেউ বিয়ে করবে না অথবা তাদের কাছে কেউ বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না তারা মুহাম্মাদকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হাতে হস্তান্তর করছে।

গোত্র দুটো চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখা। কুরাইশরা নিশ্চিত করতে চায় যেন বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের কাছে যেন কোনো খাবার না পৌঁছে। কুরাইশদের উদ্দেশ্য এই দুই গোত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাসূলুল্লাহকে তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা। কাবাঘরের ভিতরে বয়কট চুক্তির দলিল টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। তবে দুই গোত্রের মাঝে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কঠিন সময়েও তারা একে অপরের পাশে দাঁড়াতো। পরিস্থিতি বেশ মারাত্মক আকার ধারণ করে। বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিব গোত্রের নারী-পুরুষ-শিশু ক্ষুধায় কষ্ট পেতে থাকে। সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস সেই অবস্থা বর্ণনা করেন, 'আমরা এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে, গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকতে হতো।' বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের অধিকাংশ লোক

মুসলিম ছিল না। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে পুরো গোত্রের উপর ছিল।

বয়কটের অবসান

বয়কট চুক্তির বিরোধিতায় যে লোকটি উঠে দাঁড়ান তিনি হিশাম ইবন আমর। তিনি ছিলেন বনু হাশিমের মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়। চুক্তি বাতিল করার পেছনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খাবারে বোঝাই একটি উট নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন, বনু হাশিম গোত্রের কাছাকাছি গেলে উটটি ছেড়ে দিতেন যেন সেটা চড়তে চড়তে পাহাড়ের নিচে বনু হাশিমের কাছে গিয়ে পৌঁছে, যেন খাবারগুলো তারা পায়।

একদিন যুহাইর ইবন আবি উমাইয়ার কাছে গিয়ে বললেন, 'যুহাইর! তোমার আপন মামারা নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছে, আর তুমি খেয়ে-পরে-আনন্দের মধ্যে বসে আছো কীভাবে? আমি শপথ করে বলছি, যদি এই মানুষগুলো আবুল হাকামের নিজের মামা হতো, সে তাদের সাথে কখনো এরকম করতো না।' যুহাইরও বনু হাশিমের মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। হিশাম তাঁকে বোঝালেন যে, আবু জাহেলের অন্যায় ও দ্বিমুখী নীতি মেনে নেওয়া তাদের ঠিক হচ্ছে না। যুহাইর ইবন আবি উমাইয়া জবাব দিলেন, - তুমি আমাকে দোষারোপ করছো? আমি একা একজন মানুষ, আমি কী করতে পারি বলো? আল্লাহর শপথ, যদি আমার পাশে আর একটি লোকও থাকতো, আমি এই নিষেধাজ্ঞার দলিল বাতিল করে আসতাম।

হাশিম বললেন, 'তুমি একা নও, আমি তোমার সাথে আছি।' যুহাইর বললেন, 'বাহ। তবে চলো, তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করি।' এভাবে মুতঈম ইবনে আদি, আবুল বুখতারি ইবনে হিশাম এবং যামআ ইবনে আসওয়াদ নামের সমমনা পাঁচজন রহমদিল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলেন; এবং স্থির করলেন, কাল কাবা-চত্বরে গিয়ে ওই অন্যায় অঙ্গীকারনামা তারা ছিড়ে ফেলবেন। যুহাইর বললেন, "আমিই সর্বপ্রথম মুখ খুলব"। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তারা সুন্দর একটি বুদ্ধিও করলেন।

পরদিন উল্লেখিত সবাই মিলে কাবা শরীফে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সাতবার কাবা তাওয়াফ করলেন। এরপর সেখানে যুহাইর সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে মক্কাবাসীগণ! এটা কেমন কথা যে, আমরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করবো। ভালো ভালো খাবার খাব। আর বন্দী বনু হাশেমের ভাগ্যে সামান্য খাবারও জুটবে না? বন্দী বেশে তারা মানবেতর জীবন যাপন করবে; তা হয় না। আল্লাহর কসম! ঐ অন্যায় চুক্তিপত্র ছিড়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি শান্ত হব না।" এ কথা শুনার পর আবু জাহল সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলো- "সাবধান! এ চুক্তিপত্রের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের পক্ষে কাউকে কিছু করতে দেয়া হবে না।" অন্যদিকে আরেকজনও এমন বলে ওঠে। এভাবে প্রত্যেকে তাদের মতো করে বয়কটের অন্যায় ও অসারতার দিক তুলে ধরে এর শেষ হওয়া উচিত বলে ঘোষণা করে। তাতে কাবা-চত্বরে বসে থাকা অন্য কাফেরকুল ক্ষেপে উঠে ও তাদের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় এবং আবু জাহল বলতে থাকে, "এরা চুক্তি করে এসব বলছে; এসব এদের পূর্ব-পরিকল্পনা"। তখনই আবু তালিব সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'আমার ভাতিজা আমাকে এক পয়গাম নিয়ে পাঠিয়েছে। তিনি বলেছেন, আপনাদের ওই অন্যায় চুক্তিনামা পোকা-মাকড়ে খেয়ে ফেলেছে; চুক্তির কোনো দফাই আর সেখানে উল্লেখ নেই, একমাত্র আল্লাহ নামটি ছাড়া। আপনারা খবর নিয়ে দেখুন।

যদি আমার ভাতিজার কথা সত্যি হয়, তাহলে এ অন্যায় বয়কটের এখানেই শেষ হবে। আর এর অন্যথা দেখা গেলে আমাদের কোনো কথা নেই। ইত্যবসরে মুতঈম বিন আদী নিজেই সেটি ছিঁড়ে ফেলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলো; আবু তালিবের এই কথা শোনার পর সকলেই কাবার দেয়ালের কাছে দৌড়ে গেলো। গিয়ে দেখলো, অঙ্গীকারনামায় শুধু 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' কথাটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

অতঃপর জনতা ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সামনে আবু জাহলকে পদদলিত করে মুতঈম বিন আদী, যামআ ইবনে আসওয়াদ ও আবুল বোখতারী প্রমুখ মিলে সশস্ত্র হয়ে যুহাইরের নেতৃত্বে উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে তৎক্ষণাৎ শি'বে আবু তালিব দূর্গে গমন করে বন্দীদের মুক্ত করে নিয়ে আসলেন। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ ৩ বছর শি'বে আবু তালিব কারান্তরালে বন্দী জীবন থেকে সবাই মুক্তি লাভ করল।

শি'বে আবু তালিব থেকে মুক্তির পর আবু তালিব ও তাঁর সঙ্গীরা কাবা ঘরের সামনে এলেন এবং কাবা ঘরের পর্দা জড়িয়ে ধরে আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে দূয়া করলেন- "হে আল্লাহ! যারা আমাদের সাথে যুলুম করেছে, আমাদের নৈকট্যের সম্পর্ক কর্তন করেছেন এবং আমাদের বেইজ্জতি করেছে তুমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নাও"। (তাবাকাত ইবনে সাদ, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত)

বয়কটের ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষাঃ

১। অমুসলিমরা প্রত্যেকেই এক রকম নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই আছে মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমাদের উচিৎ সেসব অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতির আচরণ করা এবং তাদের প্রাপ্য সম্মান তাদেরকে দাওয়া। রাসূল সাঃ মুতিঈম বিন আদীকে তার প্রাপ্য সম্মান দিয়ে বলেছিলেন সে যদি বদরের বন্দীদের জন্য সুপারিশ করত তাহলে তিনি সব বন্দীদেরকে মুত'ঈমের সম্মানে ছেড়ে দিতেন।

২। মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল কোন অমুসলিম ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ যদি এমন কিছু দিয়ে সহায়তা করতে চায় যাতে মুসলিমদের সার্বিক কল্যাণ নিহিত আছে এবং শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয় তবে সেই সহায়তা গ্রহণে মুসলিমদের কোন আপত্তি নেই।

৩। উইপোকার দলীল খেয়ে ফেলা একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করে তা হলো, আল্লাহর সৈনিকরা সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এমনকি উইপোকাও আল্লাহর সৈনিক হতে পারে।

"কেউ জানেনা আল্লাহর সৈনিকের ব্যাপারে কিন্তু একমাত্র তিনিই জানেন।" (সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪: ৩১)

দুঃখের বছর

আবু তালিবের মৃত্যুঃ

গিরি সংকটে অন্তরীণ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার পর আবু তালিবের অসুস্থতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। অবশেষে বয়কট থেকে মুক্তির ৬ মাস (ভিন্ন বর্ণনায় ১.৫ মাস) পর নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের রজব মাসে তিনি ইন্তিকাল করলেন।

মৃত্যুর সময় আবু তালিবের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। তাদের মধ্যে আবু জাহল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া বলল, "আবু তালিব! আপনি কি তাহলে শেষ পর্যন্ত আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যাবেন?" এরপর আবু তালিব যাতে কালিমা পড়তে না পারেন এজন্য তারা ক্রমাগত আবু তালিবের সাথে কথা বলতে থাকেন। অবশেষে আবু তালিব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত্যুর আগে শেষ যে বাক্যটি তিনি

বলেন তা ছিল- "আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর"।

রাসূল সাঃ আবু তালিবের এমন মৃত্যু দেখে বললেন- "আমি যতক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য দূয়া করতে থাকব"। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ নাযিল করেন-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

অর্থঃ নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরিকদের মাগফেরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক; একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। (সূরা তাওবা, ৯:১১৩)

সহীহ বুখারীতে বর্ণীত হয়েছে, আব্বাস রাঃ রাসূল সাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন যে, "তুমি তোমার চাচার কী উপকারে আসবে?" উত্তরে রাসূল সাঃ বললেন, "তিনি এখন জাহান্নামের

অগভীর স্থানে আছেন। যদি আমি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত না হতাম তাহলে তিনি জাহান্নামের অতলে থাকতেন"।

আবু তালিবের জীবন থেকে আমাদের জন্য শিক্ষাঃ

১। আমাদের উচিত নয় ইসলামের নামে অন্ধভাবে সমাজের/পূর্বপুরুষদের প্রচলিত বিশ্বাস/চর্চাকে লালন

করা। কারণ ইসলামের রেফারেন্স কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ, বাপ-দাদাদের সংস্কৃতি নয়।

২। আমাদের কাজ শুধু দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া-হিদায়াতের দায়িত্ব আল্লাহর। কারণ, হিদায়াতের ক্ষমতা

একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান তাকেই হিদায়াত দান করেন।

৩। আল্লাহ কখনও কখনও কাফিরদের মাধ্যমেও ইসলামকে শক্তিশালী করেন এবং ইসলামকে সাহায্য করেন। আবু তালিব ইসলামে দীক্ষিত হয়নি বলেই কুরাইশরা তাঁকে আমৃত্যু শ্রদ্ধেয় নেতার আসনে বসিয়ে রেখেছিলেন। আর এজন্যই আবু তালিব রাসূল সাঃ কে আমৃত্যু হিফাযত করতে পেরেছিলেন।

৪। সঙ্গদোষ মানুষকে যেমন ঈমান ও আমল থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে তেমনি সৎসঙ্গ মানুষকে ঈমান ও আমলে অনেকদূর এগিয়ে নিতে পারে। সঙ্গদোষ মানুষকে বেঈমান করেও দুনিয়া থেকে বিদায় দিতে পারে- যেমনটা হয়েছিল আবু তালিবের ক্ষেত্রে। তাই সঙ্গ নির্বাচনে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে।

খাদিজা রাঃ এর মৃত্যুঃ

খাদিজা রাঃ নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের রমযান মাসের ১০ তারিখে ইন্তিকাল করেন। রমযান মাসে তাঁর ইন্তিকালের ব্যাপারে তেমন কোন মতভেদ নেই। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর (মতান্তরে ৫৩/৫৫ বছর) এবং সেসময় রাসূল সাঃ এর বয়স ছিল ৫০ বছর।

এভাবে একের পর এক দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে যাওয়ার কারণে রাসূল সাঃ এর বছরটির নাম দেন- 'আমুল হুযন' (দুঃখের বছর/শোকের বছর)।

সাওদা বিনতে যাম'আহ রাঃ এর সাথে রাসূল সাঃ এর বিবাহঃ

নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূল সাঃ বিবাহ করেন সাওদা বিনতে যাম'আহকে। তিনি প্রাথমিক যুগের মুসলিম ছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতের সাথী ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিল সাকরান বিন 'আমর। তিনিও প্রথম পর্যায়ের মুসলিম ছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। আবিসিনিয়ায় তাঁর মৃত্যু হলে সাওদা রাঃ এর ইদ্দত পালন শেষে রাসূল সাঃ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং বিয়ে সম্পন্ন হয়। তিনি ছিলেন রাসূল সাঃ এর দ্বিতীয় স্ত্রী।

নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও বেদনাদায়ক ঘটনা হল তায়েফে রাসূল সাঃ এর দাওয়াত প্রত্যাখান এবং রাসূল সাঃ এর উপর নির্যাতন।

তায়েফের ঘটনাবলী

মক্কার কুরাইশরা যখন ব্যাপকভাবে রাসূলের দাওয়াত প্রত্যাখান করল এবং নানাবিধ অত্যাচার-নির্যাতনে রাসূল ও মুসলিমদেরকে জর্জরিত করে ফেলল তখন রাসূল এক বুক আশা নিয়ে নবুওয়াতের ১০ম বছরের শাওয়াল মাসে মক্কা থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত

তায়েফে গমন করলেন। তার আশা ছিল তায়েফের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে।

রাসূল সাঃ তায়েফে দশ দিন অবস্থান করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রত্যেককে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা সকলেই সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে তায়েফ থেকে চলে যেতে বলল। এরপর তিনি সাধারণ মানুষদেরকে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারাও তাঁর দাওয়াত অস্বীকার করল। ফলে ভগ্নহৃদয়ে তিনি মক্কায় ফিরে আসার প্রস্তুতি নিলেন। ফেরার পথে তাঁকে উত্ত্যক্ত, অপমানিত ও কষ্ট দেওয়ার জন্য শিশু-কিশোর, যুবকদেরকে তার পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হলো। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, যখন তায়েফের কিছু সাধারণ মানুষ ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলেন তখন তায়েফের নেতাগণ শঙ্কিত হয়ে রাসূল সাঃ কে বিতাড়নের জন্য বেয়াদব কিশোর-যুবকদের লেলিয়ে দিলেন। পথের দু'পাশে তারা হাত তালি দিয়ে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে থাকল এবং তাকে গালমন্দ দিতে ও পাথর দ্বারা আঘাত করতে থাকলো। আঘাত এর ফলে রাসূলের পায়ের গোড়ালিতে ক্ষত সৃষ্টি হল এবং রক্ত জমাট বেঁধে পায়ের জুতো পায়ের সাথে আটকে গেল। পথ চলা কালে এই অবস্থায় যায়েদ বিন হারিসা রাসূলকে রক্ষার জন্য ঢালের মত কাজ করছিলেন। ফলে মাথার কয়েকটি স্থানে তিনিও আঘাত পেলেন। এভাবে পথ চলতে চলতে ক্লান্ত, অবসন্ন এবং বিধ্বস্ত অবস্থায় তিনি এক আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় নিলেন। এই বাগানটি ছিল তায়েফ এর এক থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত এবং এর মালিক ছিল উতবা ইবনে রাবিয়াহ ও শায়বা ইবনে রাবিয়াহ। তিনি বাগানে প্রবেশ করলে নিকৃষ্ট তায়েফবাসীগণ ঘরে ফিরে গেল।

বাগানে প্রবেশ করে রাসূল সাঃ আঙ্গুর গাছের ছায়ায় হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রাসূল আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করলেন। তাঁর এই দোয়া 'দুর্বলদের দূয়া' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি দূয়া করলেন এই বলে-

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُرْ ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِبْلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي إِلى مَنْ تَكِلُنِي؟ إلى بَعِيدٍ يَتَجَهُمُنِي؟ أَمْ إِلى عَدُةٍ مَلَكْتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي ولكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقْتَ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ

تُنَزِّلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلُّ عَلَى سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِك.(

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শক্তির দুর্বলতা, অসহায়ত্ব আর মানুষের নিকট স্বীয় মূল্যহীনতার অভিযোগ প্রকাশ করছি। ওহে দয়াময় দয়ালু, তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক, তুমি আমারও প্রতিপালক, তুমি আমাকে কার নিকট অর্পণ করছো, যে আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে, নাকি তুমি আমাকে এমন শত্রুর নিকট ন্যস্ত করছো যাকে তুমি আমার যাবতীয় বিষয়ের মালিক করেছ। যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোন আফসোস নেই, তবে তোমার ক্ষমা আমার জন্য সম্প্রসারিত করো। আমি তোমার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদ্দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাষিত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়াদি তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি আমাকে অভিসম্পাত করবে কিংবা ধমক দিবে, তার থেকে তোমার সন্তুষ্টি আমার কাম্য। তোমার শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন শক্তি নেই।"

এই দোয়াটি থেকেই বুঝা যায়, তায়েফবাসী রাসুল সাঃ এর সাথে কতটা দুর্ব্যবহার করেছিল এবং তাদের ঈমান না আনার কারণে তিনি কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন।

এই দূয়া থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা আমরা পাইঃ

১। দূয়ার আদব- দূয়ার শুরুতে আল্লাহর কাছে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অপারগতা প্রকাশ করতে হবে। দূয়ায় নিজের অসহায়ত্বের কথা বলে এরপর আল্লাহর বড়ত্বের কথা বলতে হবে। আল্লাহর 'আসমাউল হুসনা' দিয়ে আল্লাহকে ডাকতে হবে। আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করতে হবে। এরপর নিজের চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে।

২। মুমিনকে সর্বদা আল্লাহর পরীক্ষা ও তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যত কঠিন পরিস্থিতিই আসুক না কেন, মুমিন কখনও আল্লাহর কাছে তাক্বদীরের বিষয়ে প্রশ্ন করবে না কিংবা নিজের কষ্টের ব্যাপারে অভিযোগ করবে না। মুমিন কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে সহানুভূতি লাভের জন্য এবং আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার জন্য মানুষের ব্যাপারে অভিযোগ করতে পারে। এই অভিযোগ বৈধ, বরং তা তাওহীদের বিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ।

দূর থেকে রাসুলের এই অবস্থা দেখে উতবা এবং শাইবার (ভিন্ন বর্ণনায়- শুধু উতবাহ এই দৃশ্য দেখেছিল) মনে কিছুটা সহানুভূতি জেগে উঠেছিল। আদ্দাস নামে তাদের এক খৃষ্টান দাসের হাতে একগোছা আঙ্গুর তারা রাসূলের জন্য পাঠিয়ে দিলো। রাসূল সেখান থেকে একটি আঙ্গুর তুলে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করলেন। আদ্দাস বলল, 'এমন কথা তো এই অঞ্চলের লোকদের মুখে কখনো শুনিনি।' রাসূল বললেন, 'তুমি কোথায় থাকো? তোমার ধর্ম কি?' সে বলল, 'আমি খ্রিস্টান। আমি নিনাওয়ার বাসিন্দা।' রাসূল বলেন, 'ভালো। তাহলে সৎ ব্যক্তি ইউনুস ইবনে মাত্তার গ্রামে তুমি বাস করো। তাই না?' সে বলল, 'আপনি তাকে কিভাবে চেনেন?' রাসুল বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন এবং আমিও নবী।' একথা শুনে সে রাসূলের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তার মাথায়, হাত-পায়ে চুমু দিলো। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে উতবা ও শায়বা বলাবলি করতে লাগলো, 'দেখো! দেখো! ওই ব্যক্তি দেখছি শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্রীতদাসকে বিগড়ে দিলো।' এরপর আদ্দাস যখন তাদের কাছে ফিরে গেল তখন তারা তাকে বলল, 'বলো দেখি ব্যাপারটা কি? ওই ভদ্রলোক তোমাকে বিগড়ে দিয়েছে দেখছি!' সে বলল, 'হে আমার মনিব! এই পৃথিবীতে তার চেয়ে উত্তম মানুষ আর কেউ নেই। তিনি আমাকে এমন কথা বলেছেন যা নবী রাসূল ছাড়া অন্য কেউই জানেনা।'

তারা বলল, 'দেখো আদ্দাস! ওই ব্যক্তি যেন তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে না দেয়। কারণ তোমার ধর্ম তার ধর্মের চেয়ে উত্তম।'

এরপর রাসূল সাঃ মক্কার পথ ধরলেন।

তায়েফের ঘটনাবলী থেকে আমাদের জন্য শিক্ষাঃ

১। সুন্নাহ পালন করাই একটি দাওয়াহ। দাওয়াহ শুধুমাত্র ওয়াজ-মাহফিল কিংবা দরসের মাধ্যমে হয় না বরং সুন্নাহর উপর আমল করাই সবথেকে বড় দাওয়াহ। মানুষ যখন ইসলামের প্রায়োগিক রূপ স্বচক্ষে দেখে তখন ইসলামের প্রতি অনেক বেশি আকৃষ্ট হয়।

২। সর্বাবস্থায় এবং সর্বস্থানে নিজের মুসলিম পরিচয় নিয়ে আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত এবং অনায়াসে, অকপটে নিজেদের মুসলিম পরিচয় সকলের সামনে তুলে ধরতে দ্বিধা করা উচিত নয়। রাসূল সাঃ নতুন ভূমিতে গিয়ে অপরিচিত আদ্দাসের সামনেও অকপটে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন- "আমি একজন নবী..."।

৩। আমাদের উচিৎ কে কতটুকু আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করল সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া। হয়ত আমাদের অভিষ্ট ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করবে না, কিন্তু এমন কেউ দাওয়াত গ্রহণ করবে যার কথা আমরা ভাবতেও পারিনি। রাসূল সাঃ যখন তায়েফে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন খালিদ আল উদওয়ান নামে একটি ছোট্ট ছেলে ছিল সেখানে। সে বহুদিন পর বর্ণনা করেছে- "তায়েফের মেলা চত্বরে রাসূল সাঃ লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। আমি সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং তাঁর কথা শুনছিলাম। আমি তাঁকে সূরা আত তারিক তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি তখনই এই সূরাটি মুখস্থ করে ফেলেছিলাম যদিও আমি তখন কাফির ছিলাম। পরবর্তীতে আমি ইসলাম গ্রহণ করি।"

৪। একজন দা'ঈ কখনও মাদ'ঊর ব্যাপারে হতাশ হবে না। মাদ'উর পক্ষ থেকে যত রূঢ় ব্যবহারই আসুক না কেন, দা'ঈ সর্বদা সবর করবে এবং মাদ'ঊর হিদায়াতের ব্যাপারে আশা রাখবে। হুনাইনের যুদ্ধের পর তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল সাঃ পাহাড়ের ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলে তায়েফের কোন অস্তিত্বই আজ থাকত না।

আয়েশা রাঃ এর সাথে রাসূল সাঃ এর বিয়েঃ

রাসূল সাঃ এর সাথে আয়েশা রাঃ এর বিয়ে হয় নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের শাওয়াল মাসে। রাসূল সাঃ যখন আয়েশা রাঃ কে বিবাহ করেন ওই সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। হিজরতের প্রথম বছরে শাওয়াল মাসে ৯ বছর বয়সে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাঃ স্বামীগৃহে পদার্পণ করেন।

ইসরা ও মিরাজঃ

ইসরাঃ

'ইসরা' অর্থ 'রাত্রিকালীন ভ্রমণ'। রাসূল সাঃ আল্লাহর নির্দেশে জিবরীল আঃ এর সাথে একটি বাহনের পিঠে বসে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত যে নৈশকালীন ভ্রমণ করেছিলেন তাকে বলা হয় 'ইসরা'। আল্লাহ কুরআনে ইসরা-র প্রসংগ তুলে ধরে বলেছেন-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

অর্থঃ পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত-যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (সূরা ইসরা, ১৭:১)

মিরাজঃ

'মিরাজ' অর্থ 'উপরে আরোহনের মাধ্যম' বা 'সিঁড়ি'। আল্লাহ তাঁর হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভূমি থেকে আকাশে আরোহণ করিয়ে প্রথম আকাশ থেকে শুরু করে সপ্তাকাশ ভেদ করে সিদরাতুল মুন্তাহা পেরিয়ে তাঁর নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। সেটাকেই প্রচলিত অর্থে মি'রাজ বলা হয়। আল্লাহ কুরআনে মি'রাজের প্রসঙ্গে সূরা আন নাজমের ৫-১৮ নং আয়াতে মিরাজের কথাই ইঙ্গিত করেছেন।

ইসরা ও মিরাজের সময়কালঃ

ইসরা ও মিরাজ নববী জীবনের ঠিক কোন সময়ে হয়েছিল তা নিয়ে সীরাহবিদগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ আছে। তবে সীরাহ-র ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, মিরাজের ঘটনাটি ঘটেছিল তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর (নবুওয়াতের দশম বর্ষের যুল ক্বাদাহ মাসে) এবং আকাবার প্রথম শপথের (নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষের যিলহজ্ব) মাঝে কোন এক সময়ে।

ইসরার ঘটনাবলীঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফের হিজর বা হাতীমে শোয়া ছিলেন। ভিন্ন বর্ণনায়- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সালাত আদায় করে উম্মে হানি রাঃ (রাসূলের চাচাতো বোন ও আবু তালিবের কন্যা) এর ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় ঘরের ছাদ ভেদ করে ফেরেশতাগণ অবতরণ করলেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যমযমের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। রাসূল সাঃ বর্ণনা করেন- এমন সময় হিকমত (জ্ঞান) ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পেয়ালা আনয়ন করা হলো। আমার বক্ষ হতে পেট পর্যন্ত ফেঁড়ে যমযমের পানি দিয়ে হৃৎপিণ্ড ধৌত করে তা ঈমান ও হিকমতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো"। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এই সময় তার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে নবুওয়াত স্থাপন করা হয়। যদি পূর্বেই তার কাঁধে মোহর স্থাপন করা থাকে করা হয়ে থাকে তবে এই দফা মূলত তার মোহরের নবায়ন করা হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

রাসূল সাঃ বলেন, "তারপর আমার নিকট খচ্চরের চেয়ে একটু ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় একটি সাদা

রঙ্গের বুরাক)البرق - comes from the root of lightning" برق(নামক একটি বাহন আনয়ন করা হল"। তিনি প্রথমে বুরাকে আরোহন করে মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন। এই বাহনটির গতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূল সাঃ বলেছেন, "দিগন্তে যতদূর পর্যন্ত চোখ যায়, ততদূর পথ সে এক ধাপে অতিক্রম করে"। কোন কোন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে জিবরীল একই বাহনে রাসুলের

সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি নবীজির পিছনে উপবেশন করেন।

মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আকসার মাঝে কয়েক জায়গায় রাসল সাঃ এর সালাত আদায়ঃ

শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাঃ বলেছেন, মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যাওয়ার সময় পথিমধ্যে এমন এক জায়গা অতিক্রম করে যাই যেখানে প্রচুর খেজুর গাছ ছিল। জিবরীল আমাকে বললেন, "এখানে নেমে সালাত আদায় করুন"। আমি সেখানে নেমে সালাত আদায় করি এরপর জিবরীল আমাকে বললেন, "আপনি কি জানেন আপনি কোথায় নামাজ পড়লেন?" আমি বললাম, "না, তা আমার জানা নেই"। তখন জিবরীল বললেন, "এটি ইয়াসরিব অর্থাৎ মদিনা যেখানে আপনি পরবর্তীতে হিজরত করে যাবেন"।

একে একে সাত আসমানে আরোহণঃ

অতঃপর তিনি জান্নাত থেকে নিয়ে আসা প্রবাল ও পদ্মরাগ পাথরের তৈরী সিঁড়ির মাধ্যমে উর্ধাকাশে ভ্রমণ শুরু করলেন। কোণ কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বোরাকে চড়েই ঊর্ধাকাশে গমন শুরু করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমরা দুনিয়ার আকাশের নিকটবর্তী হলাম। জিবরীল ফেরেশতা আমার সাথেই ছিল। উপর থেকে আগমণকারীর পরিচয় জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করা হলো, কে? উত্তরে জিবরীল বললঃ আমি জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার সাথের লোকটি কে? তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদ। বলা হলোঃ

তাকে কি আসতে বলা হয়েছে? জিবরীল বললেনঃ হ্যাঁ। আকাশের ফেরেশতাগণ বললেনঃ স্বাগতম, শুভ হোক তাঁর আগমণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ প্রথম আকাশে আমি আদম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমাকে স্বাগতম জানিয়ে বললেনঃ আমার ছেলে ও নবীর আগমণ শুভ হোক।

আদম আঃ যখন তাঁর ডান দিকে তাকান তখন খুশিতে হাসতে থাকেন আর বাম দিকে দৃষ্টি দিলে দুঃখে কাঁদতে থাকেন। ডান দিকে ছিল সেইসকল আদম সন্তানের রূহ যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর বাম দিকে ছিল সেই সকল আদম সন্তানের রূহ যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, তাঁর (আদমের) ডান দিকে একটি দরজা আছে- সেখান থেকে সুগন্ধ আসছে এবং বাম দিকে একটি দরজা আছে- সেখান থেকে দুর্গন্ধ আসছে। ডানদিকের দরজার দিকে তাকালে তিনি হাসেন এবং বামদিকে দরজার দিকে তাকালে কাঁদেন ও চিন্তিত হন। তখন আমি বললাম, "হে জিবরীল! ইনি কে? এই দুটি দরজা কী?" তিনি বললেন, "তিনি হলেন আপনার আদি পিতা আদম তার ডান দিকের দরজা হল জান্নাতের দরজা এবং বাম দিকের দরজা হলো জাহান্নামের দরজা। যখন তিনি তার কোন সন্তানকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখেন তখন তিনি হাসেন আর যখন কোন সন্তানকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে দেখেন তখন তিনি কাঁদেন ও চিন্তিত হন"।

অতঃপর দ্বিতীয় আকাশে যাওয়ার সময় আমাদেরকে একই প্রশ্ন করা হল। সেখানে গিয়ে আমি ঈসা এবং ইয়াহইয়া (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁরা উভয়ই আমাকে সমাদর করলেন এবং স্বাগতম জানালেন। তৃতীয় আকাশে ইউসুফ (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনিও আমাকে স্বাগতম জানিয়ে বললেনঃ আমার ভাই ও নবীর আগমণ শুভ হোক।

এমনিভাবে চতুর্থ আকাশে গিয়ে ইদরীস (আঃ), পঞ্চম আকাশে হারুন (আঃ), ষষ্ঠ আকাশে মূসা (আঃ) এর সাথে দেখা করলাম। মূসা (আঃ) কে সালাম দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহ! এই ছেলেটিকে (এই ঘটনার সময় রাসুল সাঃ এর বয়স ছিল ৫১/৫২ বছর আর মুসা আঃ ইন্তিকাল করেন ১৩০+ বছর বয়সে। তাই তাঁর তুলনায় বয়সের দিক থেকে রাসূল সাঃ অনেক ছোট ছিলেন বিধায় তিনি তাঁকে 'ছেলে' বলে সম্বোধন করেছেন) আমার অনেক পরে নবী হয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু আমার চেয়ে অধিক সংখ্যক উম্মাত নিয়ে আমার পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে"। পরিশেষে সপ্তম আকাশে গমণ করলাম। উপর থেকে আগমণকারীর পরিচয় জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করা হলঃ কে? উত্তরে জিবরীল বললেনঃ আমি জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার সাথের লোকটি কে? তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদ। বলা হলোঃ তাকে কি আসতে বলা হয়েছে? জিবরীল বললেনঃ হ্যাঁ। আকাশের ফেরেশতাগণ বললেনঃ স্বাগতম, শুভ হোক তাঁর আগমণ।

সপ্তম আকাশে গিয়ে ইবরাহীম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেনঃ আমার সন্তান ও নবীকে স্বাগতম। কিছু বর্ণনায় রয়েছে, "এ সময় আমি আমার উম্মতকে দুইভাগে বিভক্ত দেখলাম। একটি অংশ সাদা পোশাক পরিহিত ছিল যেন তা সাদা আকগজ। আর অপর অংশটি কালো পোশাক পরিহিত ছিল। রাসূল সাঃ বলেন, অতঃপর আমি বায়তুল মা'মুরে প্রবেশ করলাম এবং আমার সাথে সেইসকল লোকও প্রবেশ করল যারা সাদা পোশাক পরিহিত ছিল। যারা কালো পোশাক পরিহিত ছিল তাদেরকে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করা হল"।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনটি হাদিয়াঃ

মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ এসময় রাসূলকে তিনটি বিষয় হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন-

* পাঁচ ওয়াক্ত সালাত

* সুরা বাকারার শেষ আয়াত গুলো অর্থাৎ শেষ আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু এবং

* রাসূলের উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে না আল্লাহ তার কবিরা গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ কবিরা গুনাহগার জাহান্নামী হবে তবে কাফির-মুশরিকদের মত চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না বরং কবীরা গুনাহের অনেকেই নবীদের সুপারিশে, কেউ আল্লাহর প্রিয় ফেরেশতাদের সুপারিশে কেউবা নিছক আল্লাহর মেহেরবানীতে ক্ষমা লাভ করবে।

* **একটি ভ্রান্তি নিরসনঃ** প্রচলিত একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ রাসূল সাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমার জন্য কী এনেছেন?" তখন রাসূল সাঃ বললেন, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস স্বলাওয়াতু ওয়াত ত্বায়্যিবাত"। তখন আল্লাহ বললেন, "আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"। তখন ফেরেশতাগণ বললেন, "আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস স্বলিহীন"। এই বর্ণনাটি জাল এবং বানোয়াট।

তবে আল্লাহর সাথে রাসূল সাঃ এর ঠিক কী কথা হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে এবং বিস্তারিতভাবে কোন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় না।

আবু বকর রাঃ এর 'সিদ্দীক' উপাধি লাভঃ

কুরাইশদের কিছু লোক আবু বকরের কাছে এসে বলল, "তোমার বন্ধু বলছে সে নাকি এক রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়েছিল আবার ভোর হওয়ার আগেই সেখান থেকে ঘুরে এসেছে। তুমি কি তার এই কথা সত্য বলে মেনে নেবে?" তিনি পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, "রাসুল কি সত্যি এ কথা বলেছেন?" তারা বলল, "হ্যাঁ"। তখন আবু বকর বললেন, "যদি তিনি একথা বলে থাকেন তবে সত্যই বলেছেন, আমি তা বিশ্বাস করি। তিনি এর চেয়ে বেশি যে আসমানী বার্তা ওহীর কথা বলেন আমি তো সেটাই বিশ্বাস করি, তাহলে এ আর এমন

কী?" সেদিন থেকেই আবু বকরের উপাধি হয়ে যায় 'সিদ্দিক' (অতীব সত্যতার অধিকারী)।

বিভিন্ন গোত্রের প্রতি দাওয়াত,

রাসুল সাঃ নবুয়তের দশম বর্ষের যুল ক্বাদাহ মাসে তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে আসার পরে নতুনভাবে বিভিন্ন গোত্র এবং ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া আরম্ভ করেন। বিগত বছরগুলির দাওয়াতের সাথে এই বছরের পার্থক্য হলো এবার তিনি আল্লাহর তাওহীদ এবং রিসালাতের বাণী প্রচারের সাথে সাথে তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করা এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন একটি ভূমির কামনা ও আকাঙ্খা তাদের সামনে তুলে ধরেন (বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে political asylum বলা যেতে পারে)।

- **বনু কিন্দাহ এর কাছে ইসলামের দাওয়াত**

- **বনু কালব এর কাছে ইসলামের দাওয়াত**

- **বনু হানিফা এর কাছে ইসলামের দাওয়াত**

- **বনু আমির বিন সা'সা'আহ এর কাছে ইসলামের দাওয়াত**

ইয়াসরিবের সূর্যোদয়-খাজরাজের ৬ জন যুবকের ইসলাম গ্রহণঃ

এরপর আবু বকর ও আলী রাঃ কে সাথে নিয়ে রাসূল সাঃ মিনার ঢাল দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় কিছু সংখ্যক যুবকের কথাবার্তা তাঁদের কানে আসলে তারা সেদিকে

গেলেন। এরা ছিলেন ইয়াসরিবের খাজরাজ গোত্রের ৬ জন যুবক (ভিন্ন বর্ণনামতে, এদের ৫ জন ছিলেন খাজরাজের আর ১ জন ছিলেন আওস গোত্রের)।

ইয়াসরিবের সৌভাগ্য যে তারা তাদের মিত্র ইহুদীদের নিকট অবহিত হয়েছিলেন যে- এই যুগে একজন নবী আসবেন এবং শীঘ্রই তিনি আসবেন। ইহুদীরা বলতো, "আমরা সেই নবীর অনুসারী হয়ে তার সাথে তোমাদেরকে ইরম ও 'আদদের মত হত্যা করব"।

বুআস যুদ্ধ-কিছু কথাঃ

রাসূল সাঃ এর হিজরতের আনুমানিক ৪-৫ বছর পূর্বে মদীনায় এই যুদ্ধ শুরু হয়। আওস ও খাজরাজের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গোত্রীয় টানাপোড়েন চরম আকার ধারণ করলে এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধের ফলে আওস ও খাজরাজের নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ ব্যক্তি মারা যায় এবং দুই গোত্রের তুলনামূলক যুবক ও কম বয়সীরা বেঁচে যায়। তারা এই অনর্থক যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বিপর্যয় দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজছিল। তাই ইসলাম তাদের কাছে এই সংকট উত্তরণের হাতিয়ার হিসেবে মনে হয়েছিল এবং আওস ও খাজরাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে ভূমিকা রাখবে বলে তারা ধারণা করেছিল। তাদের এই ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়।

আকাবার প্রথম শপথ (বাইয়াতুল আকাবা আল উলা) بيعة العقبة الأولى

একাদশ বর্ষের হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিবের ৬ জন যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তারা রাসূল সাঃ কে কথা দিয়েছিলেন যে, ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে তারা ইসলাম প্রচার করবেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুয়াতের দ্বাদশ বছরে হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে ১২ জন লোক (খাজরাজ থেকে ১০ জন আর আওস থেকে ২ জন) রাসূলের সাথে দেখা করতে আসেন। এদের মধ্যে পাঁচজন গত বছরেও এসেছিলেন। আর বাকি সাতজন ছিলেন নতুন।

এই লোকগুলো মিনা-র আকাবা নামক স্থানে রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার প্রচারিত দ্বীনের ব্যাপারে কিছু কথা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন।

এই বাইয়াতে জিহাদের ব্যাপারে কোন অঙ্গীকার ছিল না। সাধারণত মহিলাগণ ইসলাম গ্রহণের সময় রাসূল সাঃ এর কাছে এসব বিষয়ের অঙ্গীকার করতেন। এজন্য এই বাইয়াতকে বলা হয় **'বাইয়াতুন নিসা' বা 'মহিলাদের বাইয়াত' (**بيعة النساء)

হজ্ব সমাপ্ত হয়ে গেলে এই দলটির সাথে রাসূল (সাঃ) প্রথম মক্কা থেকে ধর্মপ্রচারক হিসেবে মুসআব বিন উমায়ের রাঃ (কোন কোন বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাঃ এর নামও এসেছে) প্রেরণ করলেন। মুসআব বিন উমায়ের ইয়াসরিবে গিয়ে আস'আদ বিন যুরারাহ রাঃ এর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন এবং তারা দুজনে মিলে প্রবল উদ্যমের সাথে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করলেন। তাঁর এই ইসলামের প্রচার কাজের জন্য তার উপাধি দেওয়া হয়- **'মুকরিউন' (উস্তাদ/শিক্ষক)।**

সা'দ বিন মু'আজ এবং উসাইদ বিন হুদায়ের এর ইসলাম গ্রহণ

আস'আদ বিন যুরারাহ রাঃ কর্তৃক ইয়াসরিবে প্রথম জুম'আর সালাত প্রতিষ্ঠাঃ

এই বছরেই অর্থাৎ নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে আস'আদ বিন যুরারাহ রাঃ ইয়াসরিবে জুম'আর সালাত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অন্যান্য আনসারদের সাথে পরামর্শ করে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ইবাদতের দিন হিসেবে নির্ধারণ করলেন এবং প্রথমবারের মত শুক্রবার সকলকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করে তাঁদের এই ইজতিহাদকে বহাল রাখলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থঃ মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। **(সূরা জুম'আহ, ৬২:৯)**

আকাবার দ্বিতীয় শপথ (বাইয়াতুল আকাবা আস সানিয়াহ) بيعة العقبة الثانية

পরের বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের ১৩তম বছরে পুনরায় হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিবের ৪০০ জনেরও অধিক অমুসলিম এবং ৭০ জনেরও অধিক (প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী-৭৫ জন) মুসলিম হাজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসলেন এবং মুসলিমগণ রাসূল (সাঃ) এর সাথে যোগাযোগ শুরু করলেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, মুস'আব বিন উমায়ের রাঃ তাঁদেরকে সাথে করে মক্কায় নিয়ে আসেন। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো যে, ১২ই জিলহজ্ব তারিখে মিনায় জামরাই আকাবার নিকটে যে সুড়ঙ্গ রয়েছে সেখানে তারা একত্রিত হবেন এবং সে সমাবেশ গোপনে রাতের অন্ধকারে হবে।

বাইয়াতের দফাসমূহঃ

জাবির বলেছেন, আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট কোন বিষয়ে শপথ করব?' তিনি বললেন, 'তোমরা যে কথার উপর শপথ করবে, তা হচ্ছেঃ

১। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর কথা শুনবে ও মেনে চলবে। ২। অভাবে ও সচ্ছলতায় একই ধারায় খরচ করবে। ৩। ভালো কাজের জন্য আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে। ৪। আল্লাহর পথে দণ্ডায়মান থাকবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দাকারীর নিন্দাকে পরোয়া করবে না। ৫। যখন আমি তোমাদের নিকট হিজরত করে যাব, তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং যেমনভাবে আপন জানমাল ও সন্তানদের হেফাজত করছ সেভাবেই আমার হেফাজত করবে। এসব করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।'

উল্লেখ্য, আকাবার প্রথম বাইয়াত থেকে দ্বিতীয় বাইয়াতের পার্থক্য হল- প্রথম বাইয়াতে শুধুমাত্র শির্ক ও কতিপয় কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় বাইয়াতে এগুলোর সাথে অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছিল- আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি।

আকাবার শপথ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষাঃ

১। কা'ব বিন মালিক রাঃ এবং তাঁর সহযোগীরা যখন দ্বীনের বুঝ অর্জন করেছেন তখন সাথে সাথেই সালাত আদায় করা শিখে গেছেন, অথচ তখনও রাসূল সাঃ মদীনায় প্রবেশ করেননি। তাঁদের সাথে তখন কেবল একজন মাত্র শিক্ষক ছিলেন-মুস'আব বিন উমায়ের রাঃ। তাই অনুকূল পরিস্থিতির আশায় বসে না থেকে প্রত্যেকের উচিত সাধ্যমত দ্বীনের জ্ঞান অর্জনে সময় দেওয়া।

২। রাসূল সাঃ যখন আনসারদের কাছে তার চুক্তির শর্তগুলো বলছিলেন, তখন তাদের প্রশ্ন ছিল- আমরা এর বিনিময়ে কী পাব? রাসূল সাঃ শুধু এক শব্দে উত্তর দিয়েছিলেন "জান্নাত"। এখান থেকে বুঝা যায়, সকল ইসলামী কর্মকান্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য- শুধুই জান্নাত! শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি! কোন আর্থিক লাভ কিংবা সামাজিকতা নয়।

৩। রাসূল সাঃ তাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যে, তিনি তাদের কাছে কী চান এবং তিনি তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই কাজের জন্য আনসারদের জীবন ও সম্পদ কতটা হুমকির মুখে পড়তে পারে। আর এই কাজের বিনিময় রাসূল সাঃ তাদেরকে কোন দুনিয়াবী অর্থ-সম্পদ কিংবা নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি দেননি। তিনি শুধু তাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সহজ কাজ নয়। এর জন্য অনেক সংগ্রাম করতে হবে। এমনকি জীবন বিলিয়ে দিতে হতে পারে। আর এর বিনিময় কোন দুনিয়াবী প্রত্যাশা রাখা যাবে না। বরং একমাত্র আল্লাহ ও একমাত্র জান্নাত কে সামনে রেখে এই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং এটি মাথায় রেখেই প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি।

৪। দ্বীন ইসলাম সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ থাকার উপর জোর দেয় এবং ইসলাম সর্বদাই একজন আমীরের নেতৃত্বের অধীনে একটি গোষ্ঠীকে পরিচালনার শিক্ষা দেয়। দ্বিতীয় বাইয়াতে রাসূল

সাঃ এর সাথে সত্তরের অধিক লোক সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তারা ছাড়া আরও অনেক মুসলিম ছিলেন যারা সেখানে আসেননি। কিন্তু বাইয়াত গ্রহণ করা মাত্রই রাসূল তাদেরকে বললেন ১২ জন নেতা মনোনীত করতে।

৫। নেতৃত্বের দায়িত্ব সবসময় বড় আবেদ কিংবা বুজুর্গকে দিতে হবে এমন কথা নেই। বরং অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বের গুণাবলী যার মাঝে আছে তাকেই নেতা বানাতে হবে, যদিও তার আমলে কিছু ঘাটতি থাকে। আমরা দেখেছি, আকাবার দ্বিতীয় শপথের প্রাক্কালে ইসলাম গ্রহণের পরপরই আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারামকে আনসারদের নেতা নির্বাচন করা হয়। তিনি তখনও ইসলামে নতুন, কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠতা, অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের যোগ্যতার কারণে আনসারগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে নেতা হিসেবে মনোনীত করেন।

মদীনায় হিজরতের পটভূমি ও সাহাবীদের হিজরত

হিজরতের পটভূমিঃ

ইসলামী দাওয়াতের সূচনালগ্ন থেকে এই পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সফলতা অর্জিত হয়েছিল, তার মধ্যে আকাবার দ্বিতীয় শপথের পরবর্তী সময়ের সফলতা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এরপরই রাসুলুল্লাহ সাঃ সাহাবীগণকে ইয়াসরিবে হিজরত করার অনুমতি দান করলেন এবং তার কিছুদিন পর স্বয়ং আল্লাহ রাসূল সাঃ কে ইয়াসরিবে হিজরত করার অনুমতি দিলেন। সাহাবীদের জন্য হিজরতের এই ভ্রমণ ছিল এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে যাত্রা। জানা ছিল না আগামীতে কোন ধরনের বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন তাদের হতে হবে। এতসব অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা মাথায় রেখেই জীবন এবং ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ ঈমান রক্ষার তাগিদে সাহাবীগণ ইয়াসরিবের পথে তাদের যাত্রা শুরু করে দিলেন।

সর্বপ্রথম মুহাজির আবু সালামা রাঃ ও উম্মে সালামা রাঃ এর হিজরত

সুহাইব বিন সিনান রূমী রাঃ এর হিজরত

উমার ইবনুল খাত্তাব রাঃ এর হিজরত

আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাঃ ও তাঁর পরিবারের হিজরত

মদীনার পথে রাসূল (সা) ও আবু বকর (রা), হিজরতের শিক্ষা

সাহাবীরা যখন দলে দলে হিজরত করে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে শুরু করলেন তখন মুশরিকদের মধ্যে একটা হইচই পড়ে গেল। চরম দুশ্চিন্তা ও মানসিক যন্ত্রণায় তারা অস্থির হয়ে পড়ল। কারণ হিজরতের এই ব্যাপারটি ছিল তাদের মূর্তিপূজা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। কুরাইশরা বুঝতে পেরেছিল যে রাসুলের মধ্যে নেতৃত্ব দান এবং পথনির্দেশনা দেওয়ার সাথে সাথে এক অসাধারণ আকর্ষণীয় শক্তি রয়েছে। এছাড়া, তার সাহাবীদের মাঝে রয়েছে আত্মত্যাগের উৎসাহ-উদ্দীপনা, যুদ্ধের সামর্থ্য। এসব কিছু সম্মিলিত শক্তির সামনে কুরাইশদের শতবছরের চলে আসা শিরকি ধর্ম, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আর মিথ্যা প্রতিপত্তির প্রভাব ধ্বংস হতে বাধ্য ছিল। তাই তারা যে কোনো মূল্যে এই বিপদ কে মোকাবেলা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল।

রাসূল সাঃ এর হিজরতে বাধা দেওয়ার জন্য দারুন নাদওয়ার সম্মেলনঃ

আক্কাবার দ্বিতীয় শপথের আনুমানিক আড়াই মাস পর নবুয়তের চতুর্দশ বছরের ২৬ সফর মক্কার দারুন নাদওয়াতে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এক মহা সম্মেলন আয়োজন করে। এই সম্মেলনে কুরাইশের সকল নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনের মূল এজেন্ডা ছিল, এমন একটি অকাট্য পরিকল্পনা তৈরি করা যাতে যত শীঘ্র সম্ভব ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম কে হত্যার মাধ্যমে ইসলামের অস্তিত্ব কে সম্পূর্ণরূপে আরব ভূখণ্ড থেকে মুছে ফেলা হয়।

আবু বকর রাঃ এর ঘরে রাসূল সাঃ ও হিজরতের পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণঃ

আল্লাহ জিবরীলের মাধ্যমে আয়াত নাজিল করে কুরাইশদের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত রাসূলকে জানিয়ে দিলেন।

আল্লাহ নাযিল করলেন-

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

অর্থঃ আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন কৌশল করত তেমনি, আল্লাহও কৌশল করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর কৌশল সবচেয়ে উত্তম। **(সূরা আনফাল, ৮:৩০)**

জিব্রাইল আঃ রাসূলকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন। এরপর তাকে হিজরতের সময় নির্ধারণ করে দিলেন এবং কুরাইশদেরকে কিভাবে প্রতিহত করতে হবে তাও বলে দিলেন। এরপর বললেন, "আপনি আজ রাত্রে নিজ বিছানায় শয়ন করবেন না"। ইমাম তিরমিযী সহীহ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, হিজরতের মুহূর্তে পাঠ করার জন্য জিবরীল নিম্নোক্ত দূয়াটি রাসূল সাঃ কে শিখিয়ে দিলেন-

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

অর্থঃ বলুনঃ হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য। **(সূরা ইসরা, ১৭:৮০)**

হিজরতের অনুমতি পেয়ে রাসুল সাঃ ভরদুপুরে আবু বকরের গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, হিজরতের প্রক্রিয়া ও প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা। আয়েশা রাঃ বলেন, "আমরা গ্রীষ্মের দুপুরে বাড়িতে বসে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে খবর দিল যে রাসূল সাঃ আগমন করেছেন। তিনি সেদিন এমন এক সময় এসেছিলেন, যে সময় রাসুল সাঃ সাধারণত কোথাও যেতে না"। তখন আবু বকর রাঃ বললেন, "আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। নিশ্চয় আপনি এ সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য এসেছেন"।

রাসুল ভিতর এসে আবু বকরকে বললেন, আপনার কাছে যে সকল লোক রয়েছে তাদের সরিয়ে দিন। আবু বকর বললেন, আপনার স্ত্রী ছাড়া আর কেউই নেই। তখন রাসূল তাঁকে জানালেন আল্লাহ তাকে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন এবং আবু বকরকে তার সাথী হিসেবে নির্বাচন করেছেন। একথা আবু বকরকে জানিয়ে রাসুল ঘরে ফিরে আসলেন এবং হিজরতের জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলেন। হিজরতের কথা শুনে তিনি রাসূল সাঃ কে দুটি থেকে একটি উষ্ট্রী ইচ্ছামতো হাদিয়া হিসেবে বেছে নিতে বললেন। কিন্তু রাসূল সাঃ জানিয়ে দিলেন তিনি উষ্ট্রীর মূল্য পরিশোধ না করে নিবেন না।

ওদিকে কুরাইশরা তাদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১১ জন পাপিষ্ঠ নির্বাচন করল। রাসুল সাঃ সাধারণত এশার পর পরই ঘুমিয়ে যেতেন এবং মাঝ রাতে জেগে মাসজিদুল হারামে চলে যেতেন। আর সেখানেই তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। তাই কাফেররা ঠিক করল, রাসুল সাঃ যখন মধ্যরাত্রিতে বের হয়ে মাসজিদুল হারামের সামনে আসবেন তখন তারা তাকে হত্যা করবে। রাসুল সাঃ আলীকে বললেন, "তুমি আমার এই সবুজ হাযরামি চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাকো। তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না"। এরপর যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল, সমগ্র মক্কায় পিনপতন নিরবতা নেমে আসলো এবং অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে পড়ল। এমন সময় কুরাইশদের নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ রাসূলের ঘরের দরজায় অবস্থান করল।

তাদের পরিকল্পনা ছিল রাসুল যখনই ঘর থেকে বের হবেন তাঁরা রাসূলের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করা।

ঘর থেকে বের হলেন রাসূল সাঃ

ঘরের মধ্যে রাসুল সাঃ আলী কে নিজের হাযরামী চাদর গায়ে দিয়ে শুইয়ে দিলেন। এরপর ঘর থেকে বের হলেন এবং একমুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের মাথার উপর ছুড়ে মারলেন। এসময় তিনি তিলাওয়াত করলেন সূরা ইয়াসিন এর ৯ নং আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন (ইবনে হিশামের বর্ণনায় রয়েছে, সূরা ইয়াসিনের ১-৯ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন)

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُون অর্থঃ আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না। **(সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৯)**

এসময় এমন কোন মুশরিক বাকি ছিল না যার মাথায় সে মাটি গিয়ে পৌঁছে নি এবং এর আল্লাহ মুশরিকদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলেন। রাসূল সাঃ তাদের সামনে দিয়ে নিরাপদে বের হয়ে চলে আসলেন এবং আবু বকরের বাড়ি চলে গেলেন। সেখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু বকরকে এবং মাল-সামানা সাথী নিয়ে ইয়ামান অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে আসমা বিনতে আবু বকর সফরের সামগ্রী নিয়ে এলেন (ভিন্ন বর্ণনায়- সফরের জন্য নাস্তা বানিয়ে নিয়ে এলেন) কিন্তু তিনি দেখলেন সেগুলোর মুখ বাঁধার জন্য রশি নেই। এ সময় তিনি তার কোমরবন্ধ খুলে তা দুভাগ করে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর এক অংশের সাহায্যে সামানার মুখ বেঁধে দিলেন এবং দ্বিতীয় অংশ দিয়ে কোমর জড়িয়ে নিলেন (ভিন্ন বর্ণনায়- এক অংশ দিয়ে নাস্তার পাত্র বাঁধেন আর আরেক অংশ দিয়ে পানির মশকের মুখ বাঁধেন)। এ কারণেই তাঁর উপাধি হয়েছিল **"যাতুন নিত্বাক্বাইন" (**ذات النطاقين**(দু'টুকরো কোমর বন্ধনীধারী'**।

ওদিকে রাসুলের গৃহের চারপাশে কুরাইশ কাফেররা মাঝরাত্রির জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তার আগেই এক ব্যক্তি এসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন? তারা বলল, আমরা মুহাম্মদকে খতম করার অপেক্ষায় আছি। তখন সে বলল, আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনে আপনারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ কিছুক্ষন পূর্বেই আপনাদের সামনে দিয়ে বের হয়ে গেছেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি আপনাদের মাথায় এক মুঠো মাটিও ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর তারা বলল, আল্লাহর কসম আমরা তো তাকে দেখিনি এ কথা বলে তারা মাথার মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে গেল। ভোর হলে হতাশা এবং ক্রোধে তারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল এবং চাদর সরিয়ে দেখল সেখানে আলী শুয়ে আছেন। তারা আলিকে জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মাদ কোথায়? আলী বললেন, আমি জানি না। একথা শুনে তারা ক্রোধে ফেটে পড়ল। আলীকে টেনে-হিঁচড়ে কাবা পর্যন্ত নিয়ে গেল এবং খবর বের করার জন্য প্রায় এক ঘন্টা যাবত নির্মমভাবে তাকে নির্যাতন করল। কিন্তু তবুও তিনি তাদের ব্যাপারে কিছুই বললেন না।

এরপর কুরাইশরা তড়িঘড়ি করে একটি সম্মেলন ডাকল এবং সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিলো যে অনতিবিলম্বে রাসুল কে ধরার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। এরপর মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার যত পথ রয়েছে প্রতিটি পথে সশস্ত্র পাহারা বসানো হলো। ঘোষণা দেয়া হলো, যে কেউ মুহাম্মাদ এবং আবু বকরকে অথবা দুজনের যে কোন একজনকে জীবিত কিংবা মৃত হাজির করতে পারবে তাকে ১০০টি উটের সমন্বয়ে অত্যন্ত মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হবে।

সাওর পর্বতের গুহায় রাসূল সাঃ ও আবু বকর রাঃ

ওদিকে রাসূলুল্লাহ আবু বকরকে নিয়ে সত্তর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন। গুহার নিকটে পৌঁছে আবু বকর বললেন, "আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আগে গুহায় প্রবেশ করবেন না। প্রথমে আমি প্রবেশ করে দেখি, এখানে অসুবিধাজনক কিছু আছে কিনা। যদি তেমন কিছু থাকে তাহলে তা আমার ওপর দিয়ে যাবে, আপনার কোন অসুবিধা হবে না"। একথা বলে আবু বকর গুহার ভিতরে প্রবেশ করেন।

কুরাইশদের নিয়োজিত পদাতিক বাহিনী জোরেশোরে অনুসন্ধান শুরু করলো। তারা মক্কার সকল জায়গায় খোঁজ অব্যাহত রাখল। এভাবে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে তারা সাওর পর্বতের সেই গুহার প্রবেশপথের সামনে পৌঁছে গেল। ইমাম বুখারি রাঃ হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, আবুবকর বলেছেন, "আমি মাথা তুলে মানুষের পা দেখতে পেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! তাদের মধ্যে কেউ যদি শুধু নিচের দিকে তাকায় তাহলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, আবু বকর, চুপ থাকো। আমরা দুজন; আর তৃতীয়জন আছেন আল্লাহ"। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, "সেই দুজন লোক সম্পর্কে তোমার কী ধারণা যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ?" এই প্রসঙ্গে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন-

إلا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্তনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ, ৯:৪০)

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রাসূল সাঃ ও আবু বকর রাঃ কে রক্ষা করলেন। মুশরিকরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হল, অথচ তাদের আর রাসূলের দূরত্ব ছিল কয়েক ফুট বা তারও কম।

সাওর পর্বত থেকে মদীনার পথে রাসূল (সা) ও আবু বকর (রা):

তিনদিন পর যখন কুরাইশদের খোঁজাখুঁজির মাত্রা কমে গেল এবং তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে গেল তখন রাসূল এবং আবু বকর সাওর পর্বতের গুহা থেকে বের হয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার সংকল্প করলেন। এজন্য পূর্বেই আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত নামক এক ব্যক্তির সাথে চুক্তি ও মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল। তার কাছে আমানত হিসেবে তাঁদের সওয়ারী দুটিও রাখা হয়েছিল। যদিও আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত ছিলেন কুরাইশদের ধর্মের লোক, যদিও তিনি কুরাইশ গোত্রের ছিলেন না বরং অনেক দূরবর্তী একটি গোত্রের সদস্য ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক হিসেবে নির্ভর করার মত একজন ব্যক্তি। তার সাথে এই মর্মে চুক্তি ছিল যে, তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর চতুর্থ রাত্রিতে সওয়ারী দুটো নিয়ে তিনি সাওর পর্বতের গুহায় পৌঁছে যাবেন। সেই কথা মোতাবেক, সোমবার দিবাগত রাতে তিনি বাহন দুটি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তবে কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ সামানা বাঁধার কাজটি এই সময়ে করেছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন। তখন প্রথম হিজরী সনের (নবুওয়াতের চতুর্দশ বছর) ১লা রবিউল আউয়াল, সোমবার। এরপর আবু বকর রাঃ আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত, আমির বিন ফুহাইরাহ রাঃ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার পথে যাত্রা শুরু করলেন। আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত মদিনা যাওয়ার প্রচলিত রাস্তা পরিহার করে এমন রাস্তা দিয়ে তাঁদেরকে নিয়ে যাওয়া শুরু করলেন যে পথে সাধারণত মানুষ চলাচল করত না। এর উদ্দেশ্য ছিল- কুরাইশদের খোঁজাখুঁজি থেকে রাসূল সাঃ কে নিরাপদ রাখা।

কুবায় উপস্থিতি ও মদীনায় রাসূল (সা) ও তৎকালীন মদীনার অবস্থা কুবায় উপস্থিতি ও মদীনায় রাসূল সাঃ

আবু বকর রাঃ কে সাথে নিয়ে রাসুল সাঃ নবুওয়াতের চতুর্দশ বছরে অর্থাৎ প্রথম হিজরীর বর্ষের ৮ ই রবিউল আউয়াল সোমবার কুবায় পৌঁছলেন। মদিনার মুসলিমগণ মক্কা থেকে রাসুলের রওনা হওয়ার সংবাদ শুনেছিলেন। এজন্য তারা প্রতিদিন সকালে বের হয়ে হাররার দিকে গমন করতেন এবং রাসূলের জন্য পথ চেয়ে অপেক্ষা করতেন। অবশেষে দুপুরের রোদ যখন প্রখর হয়ে উঠত তখন তারা হতাশ হয়ে ঘরে ফিরতেন। একদিন এমন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন মুসলিমগণ ঘরে ফিরে এলেন তখন এক ইহুদি তার কোন এক কাজে একটা টিলার উপর উঠলে রাসূল সাঃ এবং তার সঙ্গীদের দেখতে পায়। এই অবস্থা দেখে

সে আত্মহারা হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে, "ওগো কায়লার সন্তানেরা! তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। তোমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত অতিথি ওই যে এসে গেছেন" (কায়লা ছিল ইয়াসরিবের এক মহিলার নাম। আওস ও খাজরাজ উভয়ই তার সন্তান/বংশধর। তাই সমগ্র মদিনাবাসী কে কায়লার সন্তান/বংশধর বলা হত)। একথা শুনেই মুসলিমগণ দৌড়ে দিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাসুল কে স্বাগত জানানোর জন্য এগিয়ে এলেন। এর মধ্যেই কুবার অধিবাসীদের মধ্যে শোরগোল শুরু হয়ে গেল এবং উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি শোনা গেল। মুসলিমগণ রাসূলের আগমনে তাঁকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্য তাকবীর দিতে দিতে একত্রিত হলেন এবং রাসূলের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালেন।

লোকজন প্রথমে আবু বকরকে আল্লাহর রাসূল ভেবে ভুল করেছিল কারণ আবু বকরের চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ ছিল কিন্তু সূর্যের তাপ প্রখর হয়ে উঠলে আবু বকর যখন নিজের চাদর মেলে ধরে রাসুলের মাথার উপরে ছায়া দিলেন তখন লোকেরা রাসুলুল্লাহকে চিনতে পারল। এই দিন মদিনায় এমন এক আনন্দের দিন ছিল যা ইতিহাসে মদিনাবাসী আর কখনো দেখেনি।

লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ হবার পর রাসূল সাঃ তাদের সাথে নিয়ে কুবার বিশিষ্ট আমর বিন আওফ গোত্রের নিকট গমন করলেন। সেখানে তিনি কুলসুম বিন হাদামের বাড়িতে উঠলেন। কুলসুম বিন হাদাম ছিলেন আমর বিন আওফ গোত্রের সর্দার ও খ্যাতিমান ব্যক্তি। আবু বকর রাঃ উঠলেন খুবায়ব ইবনে আসাফ নামক আরেক আনসারীর বাড়িতে।

আলী রাঃ রাসূলের কাছে গচ্ছিত আমানত কুরাইশদের নিকট ফিরিয়ে দিয়ে রাসূলের হিজরতের ৩ দিন পর মদিনায় যাত্রা করলেন। প্রথমে কুবায় পৌঁছে তিনি রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং কুলসুম বিন হাদামের বাড়িতেই রাসূল সাঃ এর সাথে অবস্থান নিলেন।

মসজিদে কুবা নির্মাণঃ

সেখানে রাসুল সাঃ চার দিন অবস্থান করেন এবং এই সময়ের মধ্যেই তিনি একটি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন এবং সেখানে সাহাবীদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন। রাসূলের

হিজরতের পর এটা হচ্ছে মুসলিমদের স্থাপিত সর্বপ্রথম মসজিদ যা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখনও কুবায় এই মসজিদটি রয়েছে।

মদিনার পথে যাত্রাঃ

এরপর তিনি শুক্রবারে আল্লাহর নির্দেশে তাঁর বাহনে আরোহন করলেন এবং মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। এসময় আবু বকর রাঃ একই বাহনে তাঁর পিছনে ছিলেন। তিনি পূর্বেই তাঁর নানাবংশের গোত্র বনু নাজ্জারকে সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন। ফলে তারা রাসূলকে গ্রহণ করার জন্য তরবারি নিয়ে কুবায় উপস্থিত হল। তিনি তাদেরকে নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। এরপর তিনি 'বাতনে ওয়াদি' নামক স্থানে পৌঁছালে জুমার সালাতের সময় হয়ে যায় এবং রাসুল সাঃ সেখানে জুমা আদায় করেন। সেখানে মোট ১০০ জন সাহাবী ছিলেন। এখনও সেখানে মসজিদ রয়েছে। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে রাসূল সাঃ এর দেওয়া প্রথম জুম'আর খুৎবা। এই খুৎবায় তিনি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সাহাবীদেরকে নসীহত করেন।

রাসূল সাঃ কর্তৃক প্রদত্ত ইসলামের প্রথম জুম'আর খুৎবাঃ

সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্য, আমি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি, তার দরবারে সাহায্য কামনা করছ তার নিকট গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট হেদায়েত কামনা করছি। তাঁরই প্রতি ঈমান রাখি, তাঁর সাথে শির্ক-কুফরি করিনা বরং যারা তা করে তাদেরকে আমি শত্রু গণ্য করি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নে তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাকে হেদায়েত, জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক এবং জগতের সকলের প্রতি মঙ্গল কামনা সহ এই জগতে পাঠিয়েছেন এমন সময় যখন নবী রাসূলের আগমন ধারা বন্ধ হয়ে রয়েছে, নববী ইলমের ধারা নামেমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে, মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও গোমরাহী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, বরকতময় সুসময় অন্তর্হিত হয়ে গেছে, কেয়ামত ও মহাপ্রলয় নিকটবর্তী হয়ে

জগতের বিলীনকাল নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চলবে তার জন্য রয়েছে সৎপথ।

এই খুতবার একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই খুতবাটি রাসুল সাঃ যখন দিয়েছিলেন তার পূর্বে দীর্ঘ **১৩** বছর নানা ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন, অত্যাচার-অমানবিক আচরণের শিকার হয়েছিলেন তিনি। এর প্রেক্ষিতে তিনি হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন আর হিজরতের পর এই প্রথম এই দীর্ঘ খুতবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও সেই নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ কিংবা অভিশাপ ও তিরস্কার উল্লেখিত হয়নি। বরং এই খুতবা জুড়ে রয়েছে তাকওয়ার আলোচনা এবং এর গুরুত্বের বিস্তারিত বর্ণনা। আছে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান।

মদিনায় প্রবেশঃ

জুমার সালাত শেষে রাসূল মদীনায় প্রবেশ করলেন। ঐদিন থেকেই এই শহরের নাম ইয়াসরিবের পরিবর্তে **'মদিনাতুর রাসুল' বা 'রাসূলের শহর' হয়ে যায় যাকে সংক্ষেপে 'মদিনা'** বলে ডাকা হতে থাকে। এই দিনটি ছিল মদিনার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ইতিহাসিক দিন। মদিনার অলিগলিতে সর্বত্র তাকবীর ও তাহমিদের গুঞ্জন ধ্বনিত হচ্ছিল। আনসারদের ছেলেমেয়েরা আনন্দে উদ্বেল হয়ে গান করছিল-

'দক্ষিণ পাশের পাহাড় হতে পূর্ণিমার চন্দ্র আমাদের উপর উদিত হয়েছে।' 'কি উত্তম ধর্ম ও শিক্ষা! আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের প্রতি ওয়াজেব।' তোমার নির্দেশ অনুসরণ করা ফরয। তোমার প্রেরণকারী হচ্ছেন কিবরিয়া (মহাপ্রভু)

আনসারগণের সকলের আশা ছিল রাসুল তাদের বাড়িতেই অবস্থান করবেন। ফলে তাদের প্রত্যেকেই রাসূলের উষ্ট্রীর লাগাম ধরার জন্য অস্থির হয়ে গেলেন। তিনি যে বাড়ি বা মহল্লার পাশ দিয়েই অতিক্রম করছিলেন সেখানকার লোকজন তাকে অনুরোধ করতেন যে তিনি যেন তাদের ঘরে গিয়ে ওঠেন। কিন্তু রাসূল সাঃ বললেন, "উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত রয়েছে"। ফলে উষ্ট্রী চলতে থাকল এবং যেখানে বর্তমানে মসজিদে

নববী রয়েছে সেখানে এসে বসে পড়ল। কিন্তু তিনি নিচে নামলেন না। উষ্ট্রী পুনরায় উঠে দাঁড়ালো এবং কিছুদূর ঘোরাফেরা করে পুনরায় আগের জায়গায় এসে বসে পড়ল। এরপর রাসূল সাঃ নিচে অবতরণ করলেন। এইটা ছিল তার নানার গোত্রের অর্থাৎ বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লা। তাঁর ইচ্ছা ছিল এখানে অবস্থান করার আর আল্লাহ উষ্ট্রীকে সেভাবেই নির্দেশ দিয়ে রাসূল সাঃ এর মনের ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন।

রাসূল সাঃ জিজ্ঞেস করলেন, "এখান থেকে কার বাড়ি সবচেয়ে নিকটে?" আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাড়ি। এইটা আমার বাড়ি আর এটা আমার বাড়ির দরজা"। তখন রাসূল সাঃ তাকে বললেন, "যাও! আমার বিশ্রামের জায়গা ঠিক করো। এরপর রাসূল সাঃ আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন"। মসজিদে নববী ও আপন হুজরা নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত (প্রায় ৬ মাস) তিনি আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতেই ছিলেন।

মক্কার জন্য মুহাজির সাহাবীদের কাতরতাঃ

আয়েশা রাঃ বর্ণনা করেছেন, "আমরা যখন মদীনায় আসলাম তখন মদিনা ছিল সংক্রামক উপদ্রুত এলাকা। সেখানে নিম্নভূমি দিয়ে লবণাক্ত পানি প্রবাহিত হতো। রাসুলের মদিনায় পৌঁছার পর আবু বকর ও বিলাল প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। আমি তাদের খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আব্বাজান আপনি কেমন আছেন?" তারপর বিলালকে লক্ষ্য করে বললাম, "আপনি কেমন আছেন?" আয়েশা রাঃ বলছেন, "যখন আবু বকর এর জ্বর আসতো তখন তিনি এই কবিতাটি পাঠ করতেন-

"প্রতিটি মানুষকে তার আত্মীয়ের মাঝে সুপ্রভাত বলা হয়ে থাকে, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে"।

বিলালের অবস্থা যখন একটু ভালো হতো তখন তিনি দুঃখপূর্ণ কণ্ঠে বলতেন-

"হায়! যদি আমি জানতাম যে আমার কোন এক রাত্রি যাপন হবে এক প্রান্তরে (মক্কায়) আর আমার পাশে ইযখার ও জালীল (ঘাস) থাকবে এবং কোনদিন কি মাজিন্না ঝর্নাতে অবতরণ করতে পারব?

আয়েশা রাঃ বলছেন, "আমি রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের এই প্রলাপ বকার সংবাদ দিলাম। তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন- "হে আল্লাহ! আমাদের নিকট মদিনাকে তেমন প্রিয় করে দাও যেমন মক্কা প্রিয় ছিল বরং তার চেয়ে অনেক বেশি। মদিনার মাঠ, ঘাট ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যের উপযোগী করে দাও এবং উহার সা ও মুদ্দ (শস্য মাপার পাত্র বিশেষ) এ বরকত দাও, তার অসুখ প্রত্যাবর্তন করে জুহফাহ'তে পৌঁছে দাও"। আল্লাহ তাঁর দুয়া কবুল করলেন এবং সাহাবীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল।

তৎকালীন মদীনার অবস্থাঃ

মদিনায় পৌঁছার পর রাসূল কে তিনটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। মক্কায় এই চ্যালেঞ্জটি ছিল না কারণ, সেখানে সকলেই ছিল কুরাইশ সম্প্রদায়ের অথবা কুরাইশের কোন না কোন শাখা গোত্রের। আর মদিনায় এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন সাধারণ ছিল তেমনি তাদের মধ্যে অসংখ্য ভিন্নতাও ছিল। এই তিনটি সম্প্রদায় হল-

১। আনসার সাহাবীগণ

২। মদিনার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত মুশরিক বেদুইন গোষ্ঠী

৩। ইহূদীগন

আনসার সাহাবীগণঃ

আনসার সাহাবীগণের বিষয়ে আমরা সীরাতে নববীর সমগ্র মাদানী অংশ জুড়েই বিস্তারিত জানব ইনশা আল্লাহ। এক কথায় এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আনসারগণ তাদের নবাগত মুহাজির ভাইদের প্রতি যে সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও ভালোবাসা দেখিয়েছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে শুধুমাত্র আক্বীদা-বিশ্বাসের সাদৃশ্য থেকে এমন ভালোবাসার দৃষ্টান্ত বিরল। আনসারদের মধ্যে ছিল দুটি প্রধান গোত্র-

*** আওস এবং**

*** খাজরাজ**

এরা উভয়ে ছিল কাহতানি আরবদের বংশধর। এই দুটি প্রধান গোত্র আবার অনেকগুলি শাখাগোত্রে বিভক্ত ছিল।

মদিনার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত মুশরিক বেদুইন গোষ্ঠীঃ

মদীনার অভ্যন্তরে ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুশরিক তখনও ছিল যারা মদীনায় ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার প্রচারণা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করল না বরং ইসলাম ও সাহাবীদের সাথে শত্রুতা করার সিদ্ধান্তে অটল রইল।

ইহুদিদের তিনটি গোত্র ইয়াসরিবে প্রসিদ্ধ ছিল-

* **বনু কাইনুকাঃ** এরা মদীনার ঠিক মধ্যস্থলে থাকত এবং স্বর্ণালংকারের ব্যবসা করত। তারা ছিল খাজরাজ গোত্রের মিত্র। এদের প্রধান ব্যবসা ছিল স্বর্ণালংকার ব্যবসা।

* **বনু নাজিরঃ** এরা থাকতো মদীনার এক পাশে। এরাও ছিল খাজরাজ গোত্রের মিত্র।

* **বনু কুরাইযাঃ** এরাও মদীনার এক পাশে বনু নাজিরের কাছাকাছি থাকত। এরা আওস গোত্রের মিত্র ছিল।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রজেক্ট

রাজনৈতিক প্রোজেক্টঃ

মদিনায় সে সময় ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস। মুসলিম ছাড়াও ইহুদীদের তিনটি গোত্র এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বেদুঈন মুশরিকদের আনাগোনাও ছিল। এমন একটি সমাজে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আনুগত্য, পারস্পরিক বিবাদ ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্তে রাসূল সাঃ প্রথমেই সর্বসম্মতিক্রমে একটি সংবিধান প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইতিহাসে এই সংবিধান 'মদীনা সনদ' নামে খ্যাত।

মদিনা সনদের ধারাসমূহঃ

এটা লিখিত হচ্ছে নবী মুহাম্মাদ সাঃ এর পক্ষ থেকে কুরাইশ, ইয়াসরিবী এবং তাঁদের অনুসারী ও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলিমগণের জন্যঃ

১। তারা গোটা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে ভিন্ন একটি জাতি।

২। কুরাইশের মুহাজিররা নিজেদের আগের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দিয়ত (রক্তপণ) আদায় করবে এবং ইনসাফপূর্ণভাবে মুমিনদের মাঝে বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করবে। আনসারদেরও প্রত্যেক কবীলা নিজেদের আগের নিয়ম অনুযায়ী দিয়ত আদায় করবে এবং তাদের প্রত্যেকেই মুমিনদের মাঝে আদল ও ইনসাফের সঙ্গে নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করবে।

৩। মুমিনগণ কোনো সহায় সম্পদহীনকে ফিদইয়া (মুক্তিপণ) কিংবা দিয়তের ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য দান থেকে বঞ্চিত করবে না।

৪। সকল মুমিন ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যে তাদের ওপর যুলুম করবে অথবা মুমিনদের মাঝে অন্যায়, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা উসকে দিবে।

৫। মুমিনগণের সকলের হাত ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে থাকবে। চাই সে তাদের কারও সন্তানই হোক না কেন।

৬। কোনো কাফেরের বদৌলতে একজন মুমিন অপর মুমিনকে হত্যা করবে না।

৭। কোনো মুমিন আরেকজন মুমিনের বিরুদ্ধে কোনো কাফেরকে সাহায্য করবে না।

৮। আল্লাহর অঙ্গীকার এক ও অভিন্ন বলে বিবেচিত হবে। একজন সাধারণ ব্যক্তি প্রদত্ত নিরাপত্তা সকলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে গণ্য হবে।

৯। ইহুদিদের মধ্য থেকে যারা আমাদের অনুসরণ করবে তাদের জন্য রয়েছে সাহায্য ও অন্যান্য মুসলমানদের মতো সহযোগিতা। তার ওপর যুলুম করা যাবে না এবং তার বিরুদ্ধেও কাউকে সাহায্য করা যাবে না।

১০। সমস্ত মুমিনের সন্ধি এক হবে। কেউ কাউকে রেখে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার ব্যাপারে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হবে না। বরং সকলে মিলে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সন্ধি করবে।

মদিনা সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্যঃ

১। মদিনা সনদের মাধ্যমে গোত্রভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা বাতিল হয়ে আকীদাহ বা ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক একটি শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থা আরবদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ নতুন। মদীনা সনদের মাধ্যমে রাসূল সাঃ গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে উম্মাহ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা দিয়ে পরিবর্তন করে দিলেন।

২। ইহুদিদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে সমস্ত নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করলেও রাসূল সাঃ সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন, সকল ক্ষেত্রে ইহুদিদের বিপরীত করতে। এভাবে সকল ক্ষেত্রেই ইহুদিদের চাইতে পৃথক ধর্মবিশ্বাস এবং বাহ্যিক আচার-আচরণে মুসলিমদের জন্য আলাদা করণীয় নির্ধারণ করে দিলেন।

৩। মদিনা সনদের মাধ্যমে মদিনার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক ও ফৌজদারি সকলক্ষেত্রে সকল বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা রইল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাঃএর হাতে। অর্থাৎ মদীনা হয়ে গেল ইসলামী শরীয়াহ শাসিত রাষ্ট্র এবং রাসূল সাঃ ছিলেন তার রাষ্ট্রপ্রধান।

৪। মদিনা সনদের মাধ্যমে রাসূল সাঃ এর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। মদিনা সনদের মাধ্যমে ইহুদি ও মুসলিমদের সম্পর্কের মাপকাঠি নির্ধারিত হয়।

সামরিক প্রোজেক্টঃ

মুজাহিদ বাহিনী গঠনঃ

মদিনায় পৌঁছে রাসূল সাঃ যে মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তাকে প্রচলিত সেনাবাহিনীর সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ তারা প্রত্যেকেই পেশাদার সৈনিক ছিলেন না বরং তারা ছিলেন দেশের নিয়মিত নাগরিক। অর্থাৎ বলা যেতে পারে- সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেসামরিক নাগরিক।

জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে ৪ টি শর্ত পূরণ করতে হতো। সেগুলো হলো-

১। মুসলিম হতে হত।

২। প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হত।

৩। মানসিকভাবে সুস্থ হতে হত। কারণ, কোনো শারীরিক ত্রুটি না থাকলে যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়।

৪। আর্থিক সামর্থ্য থাকতে হত। কারণ, প্রত্যেক যোদ্ধার খরচ বহন করা রাসূল সাঃ এর পক্ষে কিংবা মদীনার তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

মুজাহিদ বাহিনীর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণঃ

রাসূল সাঃ তাঁর মুজাহিদ বাহিনীকে সামরিকভাবে এবং একইসাথে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করেছিলেন। কুরআনে এমন অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা একজন মুজাহিদকে জিহাদের ময়দানে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করে।

। যেমন-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থঃ আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। **(সূরা তাওবা, ৯:১১১)**

রাসূল সাঃ বলেন, যে ব্যক্তি মুজাহিদের যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহ করে দিল সেও জিহাদে অংশগ্রহণ করলো আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধানে অংশ নিল সেও জিহাদে অংশ নিল। (সহিহ মুসলিম)

মুজাহিদ বাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণঃ

একই সাথে রাসূলুল্লাহ সাঃ তার মুজাহিদ বাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। সাহাবীরা শারীরিকভাবে শক্ত-সামর্থ্য ছিলেন। কঠিন কাজ করার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল, তবে কিছুক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন ছিল। যেমন, মক্কা-মদিনার আশেপাশে কোন সমুদ্র ছিল না তাই তারা সাঁতার জানতেন না। রাসূল সাঃ তাদেরকে সাঁতার শেখার নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে তীর চালনা, লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি নানারকম খেলার সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছিলেন।

আবু দাউদে উকবা ইবনে আমের রাঃ থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, "মহান আল্লাহ একটি তীরের কারণে তিনজনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন-

১। তীর প্রস্তুতকারীকে, যে জিহাদের উদ্দেশ্যে তীর তৈরি করেছে।

২। যে তীর নিক্ষেপ করে এবং

৩। তীরের তৃণবাহীকে যে প্রতিবার তীর নিক্ষেপকারিকে তীর নিক্ষেপের জন্য সহযোগিতা করেছে।

কাজেই তোমরা তীর নিক্ষেপ করো এবং ঘোড়ায় আরোহণ করো। তবে ঘোড়ায় আরোহন করার চাইতে তীর নিক্ষেপই আমার কাছে বেশী প্রিয়। তিন প্রকারের বিনোদন ছাড়া আর কোন প্রকারের বিনোদন অনুমোদিত নয়-

১। পুরুষের জন্য তার ঘোড়াকে কৌশলের প্রশিক্ষণ দান।

২। স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ করা এবং

৩। তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেওয়া।

যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর বিরাগভাজন হয়ে তার ব্যবহার ছেড়ে দেয়, সে যেন একটি উত্তম নিয়ামত ত্যাগ করল। সে নিয়ামত ত্যাগ করল এবং অকৃতজ্ঞ হলো"।

এই পর্যায়ে জিহাদ সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবেঃ

* **জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

কুরআন শরীফে আল্লাহ জিহাদের প্রতিটি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এগুলো হল-

১। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। আল্লাহ বলেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থঃ আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। **(সূরা আনফাল, ৮: ৩৯)**

২। ইসলামের শি'আর (প্রতীক) ও ইবাদতের স্থানসমূহকে রক্ষা করা।

৩। পৃথিবী থেকে বিশৃঙ্খলা নির্মূল করা।

৪। মুমিনদের পরীক্ষা, শিক্ষা ও সংশোধন।

৫। কাফেরদের ভীতি প্রদর্শন এবং তাদের পরাজিত ও অপদস্থ করা।

৬। মুনাফিকদের চিহ্নিত করা।

৭।পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

সামরিক অভিযানের শুরুঃ

হিজরত করে মদীনায় চলে আসার পর মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য ছিল ইসলামের শত্রুদের সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং যে দাওয়াতের জন্য মুসলিমগণ এবং রাসূল হিজরত করেছিলেন সে দাওয়াতকে তার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা গ্রহণ করা। হিজরতের পরেও মক্কার কুরাইশ নেতারা ইসলামকে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজি ছিল না। তাদের কূটকৌশলে এবং কুচক্রের কারণে মদিনায় থেকেও মুসলিমগণ মানসিকভাবে প্রশান্ত ও নিরাপদ বোধ করত না। তাই কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের একটি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

মক্কার কুরাইশ এবং মদিনার মুসলিমদের মাঝে যখন এমন একটি টানটান অবস্থা বিরাজ করছে, ঠিক সেই সময় মুসলিমদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তারা মদিনার সীমা কুরাইশদের ঐসকল বাণিজ্যপথ পর্যন্ত বাড়িয়ে নেবে যা মক্কা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত চালু ছিল। এই উদ্দেশ্যে রাসূল সাঃ দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন-

১। যে সকল গোত্র এই রাজপথের আশেপাশে কিংবা এ রাজপথ থেকে মদিনা পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গার মধ্যবর্তী এলাকায় বাস করত, তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন এবং যুদ্ধ না করার চুক্তি সম্পাদন।

২। রাজপথের উপর টহলদারি দল প্রেরণ।

গাজওয়াঃ

রাসূল এর নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনীর অভিযানে বের হওয়াকে গাজওয়া বলা হয়। তাতে যুদ্ধ হোক বা না হোক, শত্রু বড় হোক বা ছোট হোক, তারা সংখ্যায় বেশি হোক বা কম সংখ্যক হোক।

সারিয়াঃ

সাহাবীদের নেতৃত্বে রাসূলের পাঠানো সৈন্যদলকে সারিয়া বলা হয়। তাতে যুদ্ধ হোক বা না হোক, শত্রু বড় হোক বা ছোট হোক, তারা সংখ্যায় বেশি হোক বা কম সংখ্যক হোক। সারিয়ার সৈন্য সংখ্যা সাধারণত কম হতো। কারণ তাদের কাজ ছিল- শুধু শত্রুর সাথে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে জড়ালে তাদের ভয় দেখানো ও বিভ্রান্ত করা। এখানে জয়-পরাজয়ের কোন বিষয় ছিল না।

রাসূল সাঃ মদীনায় হিজরতের পর থেকে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত মাত্র ১০ বছর সময়ের মধ্যে ২৭ টি যুদ্ধে নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আর সারিয়া পাঠিয়েছিলেন ৩৭ টি।

বদর যুদ্ধের পূর্ববর্তী সারিয়াসমূহঃ

গাজওয়াতুল আবওয়া বা গাজওয়াতুল ওয়াদ্দান

সারিয়া উবায়দা ইবনুল হারিস বা সারিয়াতু রাবিগ

সারিয়া হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব

গাজওয়াতুল বুওয়াত

গাজওয়াতুল 'উশাইরা

বদরের প্রথম গাজওয়া অথবা গাজওয়ায়ে সাফওয়ান

২য় হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে কুরায ইবনে জাবের ফিহরী মদিনার চারণভূমিতে আক্রমণ করে কিছু উট ও বকরি নিয়ে যায়। রাসূল সাঃ তার খোঁজে বের হয়ে বদরের

পার্শ্ববর্তী সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত যায়। কিন্তু কুরায ইবনে জাবের পালিয়ে যায়। রাসূল সাঃ তাকে ধরতে না পেরে মদিনায় ফিরে আসেন। এই অভিযানে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০ জন।

সারিয়ায়ে নাখলা বা সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ

যুদ্ধের ঘনঘটা

রাসূলুল্লাহ আবু সুফিয়ানের কাফেলা দখল করার জন্য বদর অভিমুখে যাচ্ছিলেন। আবু সুফিয়ান এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। সে নিজেই ওই স্থানে পায়চারি করে দেখছিল কোথায় কী আছে। সে বদরের কুয়াগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার লোকদের ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, কারা এই কুয়াগুলো থেকে পানি তুলেছে?' তাঁরা বললো যে, তারা দুইজন অপরিচিত লোককে দেখেছে। আবু সুফিয়ান উটের পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে করতে উটের বিষ্ঠা পেল। সে হাতে সেই বিষ্ঠা নিয়ে পিষে ফেললো। বিষ্ঠা দেখে সে বুঝতে পারল যে, সেগুলো খেজুরের বিষ্ঠা আর খেজুরগুলো মদীনার। তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মদীনা থেকে তার কাফেলার উপর নজরদারি চলছে। সে তৎক্ষণাৎ কাফেলার দিক পরিবর্তন করে উপকূলের দিকে প্রবল বেগে পালিয়ে গেল। ফলে সে মুসলিমদেরকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলো। সে মক্কার লোকদের চিঠি লিখে জানিয়ে দিল যে, কাফেলা এখন নিরাপদ, আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আবু জাহেল তাতে রাজি হলো না। সে বললো, 'আল্লাহর কসম। বদরে পৌঁছানোর আগে আমরা ফিরে যাবো না।' তারা কাফেলা রক্ষা করার জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু কাফেলা নিরাপদ এই খবর পাওয়ার পরও তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অটল থাকে। মুসলিমদের শেষ করে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

মুসলিমদের শুরা

কুরাইশদের যুদ্ধে বের হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাদের কাফেলা ইতোমধ্যেই নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছে যায়, কিন্তু তবু তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য আর অহংকার প্রকাশের জন্য বের হয়েছিল। তারা তাদের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে দম্ভ করছিল। রাসূল বুঝতে পারলেন যে, কাফেলাটি অন্যদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু কুরাইশরা ব্যাপক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি ভেবেছিলেন তাদেরকে কাফেলার ৪০ জনের সাথে মোকাবেলা করতে হবে কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, ১০০০ জনের বিশাল বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ওঁ শূরা ডাকলেন আর সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা এ ব্যাপারে কে কী ভাবছেন। আবু বকর দাঁড়িয়ে কিছু কথা বললেন, উমারও একই কথা বললেন। এরপর দাঁড়ালেন মিকদাদ ইবন আসওয়াদ, তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ , আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তার জন্য অগ্রসর হোন। আমরা আপনাকে কখনোই এমন কথা বলব না। আমরা যুদ্ধ করবো আপনার সামনে থেকে, আপনার পেছন থেকে, আপনার ডানে দাঁড়িয়ে এবং আপনার বামে দাঁড়িয়ে। আপনি আপনার রবকে নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হোন, আমরাও আপনার সাথে আছি। '

একথা শুনে আল্লাহর রাসূলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। তিনি উৎসাহের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

দুই বাহিনীর পরিসংখ্যান

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সঠিক সংখ্যা ছিল ৯৫০ জন। রাসূলুল্লাহর হিসাব প্রায় ঠিক ছিল। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৩০০ জনের একটু বেশি, অর্থাৎ মুসলিমরা ছিল কুরাইশদের ৩ ভাগের ১ ভাগ। তাদের মধ্যে ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির, ৬১ জন ছিলেন আল আওস গোত্রের আর ১৭০ জন ছিলেন আল খাযরাজের।

রণক্ষেত্রে অবস্থান

যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর রাসূল দাঁড়িয়ে। তিনি ভাবছেন কোন অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করলে কৌশলগত সুবিধা হবে। তিনি ভেবেচিন্তে একটি অবস্থান নির্বাচন করলেন। তখন একজন আনসারী সাহাবি, আল হাব্বাব ইবন আল মুনযির রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ কি আপনাকে ওয়াহীর মাধ্যমে এই জায়গা নির্ধারণ করতে আদেশ দিয়েছেন নাকি আপনি কৌশলগত কারণে জায়গাটি পছন্দ করেছেন?

রাসূলুল্লাহ তাঁকে বললেন, 'না, এটা ওয়াহী নয়, এটা নিছক যুদ্ধের কৌশল। আল মুনযির তখন প্রস্তাব করলেন যে, তাদের উচিত বদরের কুয়া পর্যন্ত পৌঁছানো এবং কুয়াকে পেছনে রেখে একটি জলাধার তৈরি করে কুয়ার সামনে অবস্থান করা।

বদর যুদ্ধের পূর্বরাত্রি

আলী ইবনে আবি তালিব যুদ্ধের আগের রাতের ব্যাপারে বলেছেন, সকল মুসলিমরা ঘুমিয়ে ছিল। এই ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে বারাকাহ, আল্লাহ বলেছেন, "তিনি আরোপ

"আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের নিরাপত্তা আর স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি নাযিল করেছেন উদ্দেশ্য ছিল এ পানি দ্বারা তিনি তোমাদের পবিত্র করবেন, তোমাদের মন থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করবেন, তোমাদের মনে বৃদ্ধি করবেন সাহস এবং (সর্বোপরি যুদ্ধের ময়দানে) তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের পদক্ষেপ মজবুত করবেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ১১)

আযযাওজাল ওই মুসলিমদের অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পানি বর্ষণ করে তাদের পবিত্র করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসাগলানো প্রাচীর।

(সূরা সফ-৪)

বস্তুত আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে ললচআথাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। (সূরা আলে ইমরান-১২৩)

সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী দিন ১৭ই রমাদান ২য় হিজরী

যুদ্ধমঞ্চ: বদর

রাসূলুল্লাহ তীক্ষ্ণ চোখে সৈনিকদের সারির দিকে লক্ষ্য রাখছেন। তাঁর হাতে একটি তীর। তিনি যুদ্ধে সেনাদের সারি এমনভাবে সোজা করে সাজাতেন যেন তিনি সালাতের কাতার সোজা করছেন। সারিতে দাঁড়ানো এক সৈন্যের নাম ছিল সাওয়াদ ইবন গাযিয়াহ। তিনি তাঁর সারি থেকে একটু সামনে এগিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁর পেটে আস্তে করে তীর দিয়ে একটি খোঁচা দিয়ে তাকে সারির ভেতর ঠেলে দিলেন। সাওয়াদ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে আঘাত করেছেন, আমি এর বদলা নিতে চাই।' এটা ছিল যুদ্ধের কিছুক্ষণ আগের ঘটনা। এক যোদ্ধা রাসূলুল্লাহকে বলছে সে বদলা নিতে চায়। রাসূলুল্লাহ তাঁর পেট উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন, 'বদলা নেবে! নাও!'

রাসূল রাগ করলেন না, সাওয়াদকে জেলে বন্দী করতেও বললেন না। কারণ এখানে একজন সৈনিক তার কমান্ডারের সাথে এমন আচরণ করছে। সাওয়াদ 'বদলা' নিলেন তিনি রাসূলুল্লাহকে জড়িয়ে ধরে পেটে চুমু খেলেন।

যুদ্ধের অব্যবহিত পর

আল্লাহর রাসূল বদরের যুদ্ধে নিহত ২৪ নেতার লাশকে একটি নোংরা পরিত্যক্ত কুয়ায় ফেলে দেওয়ার আদেশ করেন। এরপর সেই ২৪ জন নেতার লাশ ওই জায়গায় নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।

মদীনায় বিজয়সংবাদ প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ বদর বিজয়ের সংবাদ সবার কাছে পৌঁছে দিতে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা এবং যাইদ ইবন হারিসাকে মদীনায় পাঠান। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা গেলেন মদীনার বহির্ভাগ আওয়ালিতে। সেখানে তিনি প্রত্যেক আনসারের বাড়িতে সংবাদ পৌঁছে দিলেন।

বন্দীদের নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন। বন্দীদেরকে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হলো।

গনিমাহ: বিরোধ ও বিধান

সূরা আনফাল নাযিল হয়েছিল বদরের যুদ্ধের পর। তখন আল্লাহ আযযাওয়াজাল নাযিল করলেন নিম্নোক্ত আয়াত:

"লোকেরা আপনাকে গণিমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলে দিন, গণিমতের মাল আল্লাহ ও রাসূলের জন্য। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক অবস্থা

সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।" (সূরা আনফাল, ৮: ১)

অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহ আর তাঁর রাসূলের হাতে। বদরের যুদ্ধে প্রাপ্ত সকল সম্পদ আল্লাহর রাসূলকে দেওয়া হয়েছিল, একেবারে সব কিছুই। এই আয়াতটি মুজাহিদদের ৩টি শিক্ষা দিচ্ছে, তাক্বওয়া, ঐক্য এবং আনুগত্য।

বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনের ব্যাপারে বিধান জারি করেন।

"আর জেনে রাখ যে, তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে পেয়েছ, নিশ্চয় আল্লাহর জন্যই তার এক পঞ্চমাংশ ও রাসূলের জন্য, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং যা আমরা আমাদের বান্দার কাছে নাযিল করেছি সেই ফুরকানের দিনে, যেদিন দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪১)

অর্থাৎ, গনিমতের মালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ বা শতকরা আশি ভাগ বণ্টন করা হবে সৈনিকদের মাঝে। পদাতিক সৈন্যরা পাবে এক ভাগ, আর অশ্বারোহী সৈনিকরা পাবে তিন ভাগ।

বাকি বিশ ভাগকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে, প্রতিটি ভাগে শতকরা ৪ ভাগ। এই পাঁচটি ভাগ হলো,

১) আল্লাহর জন্য

২) রাসূলুল্লাহর জন্য

৩) রাসূলুল্লাহর নিকট আত্মীয়দের জন্য

৪) এতিম, অভাবগ্রস্তদের জন্য

৫) মুসাফিরের জন্য

এখন আল্লাহ আর তাঁর রাসূলের জন্য যে ৮ ভাগ নির্ধারিত তা ইসলামের কল্যাণের যেকোনো কাজে খরচ করা যাবে। যেমন, মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি। এই ব্যাপারে খলিফা বা ইমামের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

যুদ্ধবন্দি

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের ৭০ জন মুসলিমদের হাতে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরা পড়ে। এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে রাসূলুল্লাহ শুরা ডাকলেন। তিনি সাহাবীদের থেকে মতামত শুনলেন। দিন।'

যে যার মত দিল। বিভিন্ন জনের মত শুনে রাসূলুল্লাহ বুঝতে পারলেন না কী করবেন। তিনি নিজে একা একা কিছুক্ষণ ভাবার জন্য সময় নিলেন। এসে দেখলেন মুসলিমরা দুইটি মতে স্থির হয়েছে, আবু বকর এবং উমারের মত। তিনি তখন এই দু'জন সাহাবীর চারিত্রিক দিক সবার সামনে তুলে ধরলেন, 'আবু বকর হলো নবী ইবরাহীমের মতো। তাদের কওমের প্রতি দয়ালু ছিলেন। রাসূল এরপর বললেন উমারের কথা, 'উমার হচ্ছে নূহের মতো,

উদাহরণ হলো মুসা নবীর মতো।

যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান

যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য কী হবে তা নির্ভর করবে মুসলিম ইমামের সিদ্ধান্তের উপর। তিনি চারটি কাজের যেকোনো একটি করতে পারেন।

১) তিনি তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন

২) তাদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিতে পারেন

৩) মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তিদান করতে পারেন

৪) যুদ্ধবন্দীদের দাস বানাতে পারেন

উহুদের যুদ্ধঃ প্রেক্ষাপট ও প্রস্তুতি

উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটঃ

বদর যুদ্ধের মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা এবং পরাজয়ের গ্লানি থেকেই কুরাইশরা পুনরায় মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রত্যয় গ্রহণ করে এবং দিন দিন তাদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ বর্ধিত হয়ে বদরে পরাজয়ের এক বছরের মধ্যেই উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করে। এই ছিল মোটা দাগে উহুদ যুদ্ধের মূল প্রেক্ষাপট ও কারণ। তবে আরও কিছু বিষয় এই যুদ্ধের পেছনে কলকাঠি নেড়েছিল। সেগুলো হলঃ

> সামাজিক কারণ (Status Quo):

অর্থনৈতিক কারণঃ

রাজনৈতিক কারণঃ

* কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হত্যার প্রতিশোধঃ

কুরাইশ মুশরিকদের উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধ যাত্রাঃ

উহুদ যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্যপূরণে কুরাইশগণ ৩০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে। এই বাহিনীর সাথে ১৫ জন (মতান্তরে ২৪ জন) নারীকেও তারা যুক্ত করে, যেন নারীদের সামনে সম্মান রক্ষার্থে হলেও প্রাণপণ যুদ্ধ করতে তারা বাধ্য হয়। পুরো বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় আবু সুফিয়ানকে, ডানদিকের বাহিনীর ও ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সেনাপতি করা হয় খালিদ বিন ওয়ালিদকে এবং বাম দিকের বাহিনীর সেনাপতি করা হয় ইকরামা বিন আবি জাহলকে, পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি করা হয় সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা (ভিন্ন বর্ণনায়- আমর বিন আল আস) কে ও তীরন্দাজদের সেনাপতি করা হয় আব্দুল্লাহ বিনে আবু রাবীয়াহকে। এই পাঁচ জনের প্রত্যেকেই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। যুদ্ধের পতাকা দেওয়া হয় বনু আব্দুদ দারের হাতে। মুশরিকদের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যয় হয় প্রায় ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা। ৩য় হিজরীর ৫ই শাওয়াল, মতান্তরে ৭ই শাওয়াল, এই বাহিনী মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করে।

এই বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী হয়ে প্রথমে আক্বীক নামক স্থানে এবং অতঃপর ৩য় হিজরীর ৬ শাওয়াল- বৃহস্পতিবার, মতান্তরে ১২/১৩ ই শাওয়াল, আয়নাইন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে।

মদীনায় যুদ্ধের সংবাদ ও মুসলিমদের পরামর্শসভাঃ

কুরাইশ বাহিনী যুদ্ধযাত্রা শুরু করলে মক্কায় থাকা আব্বাস শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং তিনি মদিনায় কুরাইশ বাহিনীর যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পাঠানোর জন্য একজন দ্রুতগামী পত্রবাহক কে প্রেরণ করেন। পত্রবাহক অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মাত্র ৩ দিনে মদিনায় পৌঁছে রাসূলের হাতে সেই চিঠি তুলে দেন। উবাই ইবনে কা'ব রাসূল সাঃ কে এই চিঠি পড়ে শোনালেন। আব্বাস রাঃ এর চিঠিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য ছিল-

১। শত্রুসংখ্যা

২। অস্ত্রের বিবরণ

৩। কুরাইশদের যুদ্ধযাত্রার খবর

রাসূল সাঃ তখন মসজিদে কুবায় ছিলেন। চিঠি পেয়ে রাসূল সাঃ দ্রুত মদীনায় ফিরে আসেন এবং আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের সাথে পরামর্শে বসেন। আনসার গোত্রের নেতা সা'দ বিন রাবী'কে চিঠির ব্যাপারে জানালে তিনি কল্যাণের আশা প্রকাশ করলেন।

চিঠির আদ্যোপান্ত জানার পরে মুসলিমরা সার্বক্ষণিক আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়ে থাকা শুরু করলেন; এমনকি সালাতের সময়ও তারা অস্ত্র কাছেই রাখতেন। আর রাসূলুল্লাহকে সার্বক্ষণিক পাহারা দেওয়ার জন্য সাদ বিন মুয়াজ রাঃ, উসাইদ বিন হুযায়ের রাঃ এবং সা'দ বিন উবাদাহ রাঃ দায়িত্ব নেন। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাঃ এর নেতৃত্বে কিছু সাহাবীকে রাসূল (সা) মদিনার বিভিন্ন প্রবেশপথে নিয়োজিত করেন- যেন আকস্মিক আক্রমণের শিকার না হতে হয়। আর কিছু সংখ্যক সাহাবীকে তিনি শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করে নিয়মিত মদিনায় খবর পাঠানোর জন্য গোয়েন্দাগিরির কাজে নিযুক্ত করেন।

কুরাইশ বাহিনী মদিনার বাইরে শিবির স্থাপন করার সংবাদ রাসূল তার গোয়েন্দা বাহিনী মারফত লাভ করলেন। সাথে সাথেই তিনি সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন। এসময়

তিনি নিজের একটি স্বপ্নের কথাও সাহাবীদের জানান। তিনি বলেন, "আল্লাহর শপথ! আমি একটি ভালো জিনিস দেখেছি। আমি দেখেছি, একটি গাভী যবেহ করা হচ্ছে। আমি আমার তরবারির মাথায় কিছু ভঙ্গুরতা দেখেছি। আরোও দেখেছি যে, আমি আমার হাতটি একটি সুরক্ষিত বর্মের মধ্যে ঢুকিয়েছি।" তারপর তিনি এই গাভীর ব্যাখ্যা করেন যে, কিছু সাহাবায়ে কিরাম নিহত হবেন। তরবারির ভঙ্গুরতার ব্যাখ্যা করেন- তার পরিবারের কোন লোক শহীদ হবেন এবং সুরক্ষিত বর্মের ব্যখ্যা করেন- সুরক্ষিত বর্ম বলতে মদিনা শহর কে বুঝানো হয়েছে।

এরপর রাসূল সাঃ সাহাবাদের সামনে মত প্রকাশ করেন যে, মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা কিছুতেই সঙ্গত হবে না; বরং মদিনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করাই যৌক্তিক হবে। আরও কিছু সাহাবী তাঁর এই মতকে সমর্থন করেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী রাসূলের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেন। মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তারা জোরালো মতামত পেশ করলেন।

অবশেষে অধিকাংশের মতের সামনে রাসূল (সা) নিজের মত পরিত্যাগ করে মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলেন।

এই ঘটনা থেকে নেতৃত্ব বিষয়ক শিক্ষাঃ

১। নেতার সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা উচিত নয়।

২। সকলের মত গ্রহণ করা আদর্শ নেতার বৈশিষ্ট্য।

ফক্বীহগণ এই ঘটনা থেকে ফতোয়া দিয়েছেন, কোন নফল ও মুস্তাহাব কাজ শুরু করার পর তার হুকুম ওয়াজিবের মত হয়ে যায়।

৩। মাশোয়ারার কারণে যদি নেতার পছন্দনীয় মতের বিরুদ্ধ মতও গ্রহণ করতে হয়, তবুও নেতার উচিত নয় এজন্য তার অনুসারীদের কটাক্ষ করা কিংবা খোঁটা দেওয়া, যদিও অনুসারীদের মত ভুল হয়।

এছাড়াও এই ঘটনা থেকে সাহাবীদের উন্নত আদব-আখলাক সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।

মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ও প্রস্তুতিঃ

রাসূল তার সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করেনঃ

১। মুহাজির বাহিনী এর পতাকা দেওয়া হয় মুসআব বিন উমায়েরকে।

২। কবীলায়ে আউসের আনসার বাহিনীর পতাকা দেওয়া হয় উসাইদ বিন হুযাইর এর হাতে।

৩। কবীলায়ে খাযরাজের আনসার বাহিনীর পতাকা দেওয়া হুবাব ইবনে মুনযির এর হাতে।

মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ও প্রস্তুতিঃ

মুসলিমদের সেনাবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০।

এরপর ১৪ই শাওয়াল, শুক্রবার আসরের সালাতের পর মুসলিম বাহিনী যুদ্ধযাত্রা করে।

নাবালেগ সাহাবীদের ফিরিয়ে দেওয়া হলোঃ

তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন-

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ,

যায়েদ বিন সাবিত রাঃ,

উসামা বিন যায়েদ রাঃ,

আবু সাইদ খুদরি রাঃ,

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গীদের পলায়নঃ

সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বে রাসূল (সা) পথ চলতে শুরু করেন এবং 'শাওত' নামক স্থানে পৌঁছে ফজরের সালাত আদায় করেন। এখানে পৌঁছে মুসলিম এবং মুশরিক সেনাবাহিনী একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিল। এখানেই মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে তার তিনশ' সৈন্য নিয়ে বলতে শুরু করে, অযথা কেন জীবন দিতে যাব! তাই রাসূলের সাথে সে যুদ্ধ করতে বাধ্য নয়। এই কথা বলে সে ৩০০ জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদিনায় ফিরে আসে।

এই ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইমরানের

১২২ নং আয়াতে বলেনঃ

إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُون অর্থঃ যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১২২)

ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন-

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَو ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُ

অর্থঃ এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হল এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে বস্তুতঃআল্লাহ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৭)

অবশিষ্ট ৭০০ জন সৈন্য নিয়ে রাসূল ভিন্ন পথ অবলম্বন করে কুরাইশ সেনাবাহিনীকে পাশ কাটিয়ে উহুদ পাহাড়ের সামনে অবস্থান নিলেন।

মুসলিম বাহিনীর সৈন্যবিন্যাস এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতিঃ

৫০ জন তীরন্দাজের একটি দলকে রাসূল সাঃ 'জাবালে আয়নাইন' (বর্তমানে এটি 'জাবালে রুমাত' নামে পরিচিত) পর্বতের মাঝে গিরিপথের মোকাবেলায় নিযুক্ত করেন। সেখান থেকে কুরাইশ বাহিনীর গোপনে আক্রমণের একটি বড় সম্ভাবনা ছিল। তাই তিনি সেখানে ৫০ জন তীরন্দাজ নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর সষায় সতর্ক করে দেন তারা যেন কিছুতেই কোনোক্রমেই সেও পথ ছেড়ে না যায়।

কঠিন থেকে কঠিনতর ভাষায় সতর্ক করে দেন তারা যেন কিছুতেই কোনোক্রমেই সেই পথ ছেড়ে না যায়। মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাঃ তীরন্দাজদের অধিনায়ককে বলেন, " সাবধান! আমাদের জয়-পরাজয় যা-ই হোক না কেন তোমাদের দিক থেকে যেন আক্রমণ না হয়। তোমরা আমাদের পিছন দিক রক্ষা করবে। যদি তোমরা দেখো যে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছি তবুও তোমরা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আর যদি দেখতে পাও যে, আমরা গনিমতের মাল একত্রিত করছি তখনও তোমরা আমাদের সাথে আসবে না

বা শরিক হবে না।" তবুও তোমরা নিজেদের জায়গা থেকে সরবে না যে পর্যন্ত আমি তোমাদের কোনো সংবাদ না পাঠাই।"

মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধকরণঃ

১৫ই শাওয়াল সকালবেলা রাসূল সাঃ সাহাবীদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন।

মুশরিক বাহিনীর সৈন্যবিন্যাসঃ

মুশরিক বাহিনীর সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান। সে নিজের কেন্দ্র তৈরি করেছিল সেনাবাহিনীর ঠিক মাঝখানে। তার ডান দিকের বাহিনীর সেনাপতি ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং বামদিকের বাহিনীর সেনাপতি ছিল ইকরামা বিন আবু জাহাল। পদাতিক সৈন্যদের সেনাপতি ছিল সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া আর তীরন্দাজ বাহিনীর নেতা ছিল আব্দুল্লাহ রাবীয়াহ।

মুশরিক বাহিনীর পতাকা ছিল বনু আব্দুদ দারের হাতে।

এবং শেষ পর্যন্ত এক এক করে তাদের সবাই মৃত্যুর কবলে পতিত হয়।

কুরাইশদের রাজনৈতিক চালঃ

যুদ্ধ শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বে কুরাইশরা মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। আবু সুফিয়ান আনসারগণের নিকট প্রস্তাব পাঠায় তারা যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যায়। কারণ, কুরাইশরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসেনি বরং মুহাজিরদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে। আনসারগণ যদি ফিরে যায়, তবে কুরাইশরাও যুদ্ধ শেষে মক্কায় ফিরে যাবে এবং তারা মদিনা

আক্রমণ করবে না। কিন্তু আবু সুফিয়ানের এই প্রস্তাব শোনামাত্রই আনসার প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লেন এবং প্রচন্ডভাবে তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন।

ময়দানের ঘটনাবলী, নারীদের ভূমিকা

মুশরিকদের পতাকাসমূহের পতনঃ

মুসলিম ও মুশরিক বাহিনী মুখোমুখি হলে মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহা ইবনু আবি তালহা প্রথমে যুদ্ধ শুরু করে। সে ছিল কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বীর যোদ্ধা এবং ঘোড়সওয়ার। মুসলিম সৈন্যরা তাকে 'কাবশুল কুতায়বা' (সৈন্যদের ভেড়া) বলে ডাকতেন। যারা মুশরিকদের পতাকার হিফাজত করতে গিয়ে মারা পড়ে তারা একই পরিবারের ৬ জন ছিল। এভাবে বনু আবদুদ দারের দশজন ব্যক্তি একে একে নিহত হয়। তখন পতাকা উঠানোর কেউ না থাকলে সুওয়াব নামক তাদের এক হাবসি গোলাম তাদের পতাকা উঠিয়ে নেয় এবং প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করতে শুরু করে। পতাকা উত্তোলন করার মত আর কেউ থাকলো না"। এভাবে যুদ্ধের শুরুতেই ২২ জন কুরাইশি একে একে নিহত হয়।

আবু দুজানার বীরত্বঃ

মুশরিকদের পতাকা পতনের পর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধে সাহাবীরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। তাদের বীরত্বের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে আবু দুজনার কথা। মুশরিকদের একজন লোক ছিল যে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিল। অবশেষে সে আবু দুজনার মুখোমুখি হয়ে যায়; আবু দুজানা তাকে এত জোরে আঘাত করেন যে সে সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

হানযালাতুল গাসীল এর বীরত্ব ও শাহাদাতঃ

সাহাবী হানযালা রাঃ ছিলেন ফাসিক আবু আমের এর পুত্র। এই সেই আবু আমের, যে যুদ্ধের শুরুতে আনসারদের বিভ্রান্ত করে ফেরত নিয়ে যেতে চাইছিল। তিনি ছিলেন নববিবাহিত। উহুদ যুদ্ধের ঘোষনা যখন দেওয়া হয় তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করছিলেন। যুদ্ধের ঘোষণা শোনামাত্রই তিনি জানাবাতের অবস্থাতেই যুদ্ধে শরিক হন। যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তিনি আবু সুফিয়ানের একেবারে নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ানকে তরবারির আঘাত করতে যাবেন এমন সময় শাদ্দাদ ইবনে আওস তাঁকে আঘাত করে শহীদ করে দেন।

তাঁর স্ত্রী জানালেন যে, হানযালা রাঃ জানাবাত অবস্থায় যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। রাসূল সাঃ বললেন ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিচ্ছিল। এজন্য তাঁর নাম হয়ে যায় 'হানযালাতুল গাসীল'।

হামজা রাঃ এর শাহাদাতঃ

হামজা রাঃ অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিলেন এবং তিনি শত্রুবাহিনীর যাকে সামনে পাচ্ছিলেন তাকেই কচুকাটা করছিলেন। ওয়াহশি ইবনু হারব নামে এক গোলাম কাপুরুষের মত পেছন থেকে বর্শা মেরে তাঁকে শহীদ করে।

মুশরিকদের আপাত পরাজয় ও তীরন্দাজদের মারাত্মক ভুলঃ

মুসলিম বাহিনী নিজেদের সর্বশক্তি নিয়ে মুশরিক বাহিনীকে ধরাশায়ী করতে থাকে। মুশরিকদের মনোবল ভেঙে পড়ে এবং তাদের কাছে যুদ্ধের পরাজয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশেষে মুশরিক বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করে এবং মুসলিমদের উপর হতে প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বেমালুম ভুলে যায়।

তীরন্দাজ বাহিনী এতক্ষণ পর্যন্ত পাহাড়ের গিরিপথের উপরে বসে রাসূল সাঃ-এর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিলেন এবং মুসলিম বাহিনীকে সহায়তা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুশরিকদেরকে পালাতে দেখে তারা বিজয়ের আনন্দে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন। তারা গনিমত সংগ্রহের জন্য রাসূল সাঃ-এর নির্দেশ উপেক্ষা করে গিরিপথ ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দিকে ছুটলেন। এই সুযোগে খালিদ বিন ওয়ালিদ সেই পথ দিয়ে তার বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়লেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে মুসলিমদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করলেন।

মুসলিম বাহিনীর পলায়নপরতাঃ

উভয় দিক থেকে আকস্মিক আক্রমণের শিকার হয়ে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেন, কেউ কেউ পালিয়ে মদিনায় ঢুকে পড়েন, কিছু সাহাবী পাহাড়ের উপরে উঠে আশ্রয় নেয়। কেউ কেউ আবার মদিনায় ফিরে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর মাধ্যমে আবু সুফিয়ানের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনার চিন্তাও করতে থাকে।

মুসলিম বাহিনীর পতাকা বাহকের পতনঃ

মুসলিমদের পতাকা ছিল মুস'আব ইবনু উমায়ের রাঃ এর হাতে। তীর ও তরবারির আঘাতে তার আপাদমস্তক একেবারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। ইবনু কামিয়ার আঘাতে তাঁর ডান হাত কেটে পড়ে গেলে তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে ধরেন, এরপরের আঘাতে বাম হাত কেটে যায় এবং সাথে সাথে শত্রুর একটি তীর এসে তার বুক ভেদ করে চলে গেলে তিনি শহীদ হয়ে যান। রাসূল সাঃ-এর আকৃতির সাথে মুস'আব রাঃ এর সাদৃশ্য ছিল। তাই তাকে শহীদ করে ইবনু কামিয়া মুশরিকদের দিকে ফিরে গেল এবং ঘোষণা করল যে, মুহাম্মাদ সাঃ কে হত্যা করা হয়েছে।

রাসূল সাঃ এর শাহাদাতের গুজবঃ

এই সময়ে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা হয় তা হলো- ইবনু কামিয়ার ঐ কথার কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ নিহত হয়েছেন। আর তাঁর নিহত হওয়ার গুজব শুনে সাহাবীদের মনোবল যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তারা আর যুদ্ধ করার কোন কারণ তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে পেলেন না। উসমান রাঃ এর মতো অনেক প্রখ্যাত সাহাবীও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যাওয়ার মতো গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন। মুসলিম বাহিনীর বিক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তহীন অবস্থা রাসুলুল্লাহ সাঃ তাঁবুতে থেকে অত্যন্ত আফসোসের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

রাসূল সাঃ-এর উপযুক্ত সিদ্ধান্তে ঘুরে দাঁড়ালো মুসলিম বাহিনীঃ

এই চরম সংকটময় মুহূর্তে রাসূল সাঃ তাঁর তুলনাহীন বীরত্বের প্রকাশ দেখিয়েছিলেন। তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে সাহাবীদেরকে ডাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন, "আল্লাহর বান্দারা তোমরা এদিকে এসো"। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, "তোমরা আমার দিকে এসো, আমি আল্লাহর রাসূল"। রাসূলের ডাক শুনে সাহাবীরা যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। তাদের মাঝে নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো এবং তারা মুশরিকদের উপর পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ার নতুন উদ্যম স্পৃহা ফিরে পেলেন। সাহাবীগণ পুনরায় একত্রিত হয়ে গেলেন এবং মশরিকদের মোকাবেলায় ঝাপিয়ে পড়লেন।

রাসূল সাঃ-এর চারপাশে ঘটে যাওয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধঃ

রাসূল সাঃ-এর কণ্ঠস্বর শুনেই মুশরিকরা তাকে চিনে ফেলে এবং তারা এই সুযোগ হাতছাড়া না করার জন্য দ্রুত গতিতে রাসূল সাঃ-এর দিকে ধাওয়া করে। রাসূল সাঃ সাহাবীদেরকে

ডাক দিয়েছিলেন কিন্তু সাহাবীদের পূর্বেই মুশরিকরা রাসূল সাঃ-এর নিকট পৌঁছে যায়। এসময় রাসূল সাঃ-এর কাছে মাত্র সাতজন আনসার এবং দুইজন কুরাইশ সাহাবি ছিলেন।রাসূল সাঃ-এর কথা শুনে পরপর ৭ জন আনসারী সাহাবী যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান এভাবে তাদের সাতজনকে চোখের সামনে শহীদ হতে দেখে রাসূল সাঃ বললেন, "আমরা আমাদের সঙ্গীদের সাথে ন্যায় বিচার করলাম না"। যে দুজন কুরাইশ সাহাবী রাসূল সাঃ-এর কাছে ছিলেন তাঁরা হলেন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাঃ এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ। মুশরিকরা সুযোগ বুঝে রাসূল সাঃ-এর উপর তাদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

• উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস একটি পাথর মেরে রাসূল সাঃকে পার্শ্বদেশের ভরে ফেলে দেন আর এর ফলে রাসূল সাঃ-এর ডান দিকের রুবাঈ দাঁত ভেঙে যায় এবং রাসূল সাঃ-এর নিচের ঠোঁট আহত হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী (তিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কায় ইন্তিকাল করেন)। রাসূল সাঃ-এর ললাট বরাবর পাথর দিয়ে আঘাত করে। ফলে রাসূল সাঃ এর কপাল ফেটে রক্ত বের হতে থাকে।

আব্দুল্লাহ ইবনু কামিয়াহ নামক এক দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার রাসূল সাঃ-এর ঘাড়ের উপরে এত জোরে তরবারির আঘাত করেন যে, রাসূল সাঃ একমাসেরও বেশি সময় তার ব্যথা অনুভব করতেন। তবে লৌহবর্ম পরিহিত থাকায় তিনি বেঁচে যান। এরপর আব্দুল্লাহ দ্বিতীয়বার রাসূল সাঃকে আঘাত করেন এর ফলে রাসূল সাঃ-এর চেহারার মধ্যে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া ঢুকে যায়। রাসূল সাঃ তার চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলেন, "আল্লাহ তোকে টুকরো টুকরো করে ফেলুন"। রাসূল সাঃ-এর এই দোয়া আল্লাহ কবুল করেছিলেন।

মুশরিকদের আঘাত পাওয়ার পরে রাসূল সাঃ তার মুখমন্ডল থেকে রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন, "ওই কওম কীরূপে কৃতকার্য হতে পারে যারা তাদের নবী সাঃ এর মুখমণ্ডলে

আঘাত করেছে এবং তার দাঁত ভেঙে দিয়েছে অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকছিলেন"। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন-

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ অর্থঃ "আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা শাস্তি দেবেন এ ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই; কেননা তারা হচ্ছে জালেম"। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১২৮)

রাসূল সাঃ এর এই কথার মধ্যে দুটি শিক্ষা রয়েছে আমাদের জন্যঃ

১। একজন মুসলিম সর্বদা অপর মুসলিমকে Benefit of Doubt দিতে চেষ্টা করবে। ওসীলা

২। রাসূল সাঃ বলেছেন, "কারণ তারা জানে না", তিনি বলেন নি যে, "কারণ তারা জাহেল"। অর্থাৎ মুশরিকদের হিদায়াতের প্রতি রাসূল সাঃ এর আকাঙ্খা ও মমত্বের প্রগাঢ়তা কতটা ছিল!

রাসূল সাঃ-এর চারপাশে ফিরে এলেন সাহাবীগণঃ

রাসূল সাঃ-এর ডাক শুনে সাহাবীগণ দ্রুতবেগে তার চারপাশে ফিরে এলেন। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন আবু বকর রাঃ। আবুবকর রাসূল সাঃ-এর কাছে এসে দেখেন সেখানে একজন ভদ্রলোক রাসূল সাঃ- এর চারপাশে থেকে যুদ্ধ করছেন। তিনি হলেন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ। তাকে দেখে আবুবকর বললেন, "এই লোকটি যদি আমার গোষ্ঠীর লোক হতো তবে তা আমার কাছে খুশির ব্যাপার হতো"। রাসূল সাঃ-এর চারপাশে যে সকল সাহাবী একত্রিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন, আবু দুজানা, আবু মুসআব ইবনু উমায়ের, আলী ইবনে আবু তালিব, সাহল ইবনু হুনায়েফ, মালিক বিনু সিনান, আবু সাঈদ খুদরী এর পিতা, উম্মু

উমারাহ নুসাইবাহ বিনতু কাব, ক্বাতাদাহ ইবনু নুমান, উমার ইবনুল খাত্তাব, হাতিব ইবনু আবী বালতা'আহ এবং আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম।

মুসলিম সেনাবাহিনী নিরাপদ স্থানে চলে গেলঃ

সাহাবি মুসআব ইবনে উমায়ের রাঃ এর শাহাদাতের পর রাসূল সাঃ আলীকে পতাকা দান করেন। তিনি প্রাণপণ যুদ্ধ করতে থাকেন এবং অন্যান্য সাহাবীগণ অতুলনীয় বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমন অব্যাহত রাখেন। সর্বপ্রথম রাসূল সাঃ কে চিনতে পারলেন কা'ব বিন মালিক। তিনি খুশিতে চিৎকার করে ওঠেন, 'হে মুসলিমবৃন্দ, তোমরা আনন্দিত হও, এই যে রাসূলুল্লাহ সাঃ। তিনি তাকে ইঙ্গিত করেন, "চুপ থাকো। যাতে মুশরিকরা আমার অবস্থান ও অবস্থানস্থল টের না পায়"। কিন্তু তার এ আওয়াজ মুসলিমদের কানে পৌঁছে গিয়েছিলো। তারা রাসূল সাঃ-এর আশ্রয়ে চলে আসতে শুরু করে এবং প্রায় ৩০ জন চারপাশে একত্রিত হয়ে যান।

এই সমস্ত সাহাবিকে নিয়ে রাসূল সাঃ পাহাড়ের ঘাঁটির দিকে যেতে শুরু করেন। বাহিনী পেছনে সরতে সরতে পাহাড়ের ঘাঁটিতে অবস্থিত শিবিরে পৌঁছে যান এবং অন্যান্য মুজাহিদদের জন্য সেখানে পৌঁছার পথ পরিষ্কার করে দেন। এভাবে রাসূল সাঃ তার সকল সাহাবী কে নিয়ে নিরাপদে পৌঁছে যান এবং মুশরিকদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে যান।

আবার সেই তীর নিলাম। সেটা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় একজন ব্যক্তিকে মারলাম, সবাই মারা গেল। আর এরপর তারা সবাই নিচে চলে গেল। এরপর আমি সেই তীরটিকে বরকতময় ভেবে নিজের কাছে রেখে দিলাম। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানেরা সেই তীরটি সংরক্ষণ করেছিলেন।

মুশরিকগণ কর্তৃক শহীদগণের দেহ বিকৃতিঃ

এটি ছিল মুসলিম ও রাসূল সাঃ-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের সর্বশেষ আক্রমণ। তারা যেহেতু ধরে নিয়েছিল রাসূল সাঃ শাহাদাত বরণ করেছেন তাই তারা মক্কার দিকে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিল। মুশরিকদের কিছু লোক মুসলিম শহীদদের নাক, কান ইত্যাদি কাটায় লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে দিতে থাকে। হিন্দা বিনতে উতবা হামযার পেট চিরে কলিযা বের করে চিবাতে লাগল কিন্তু গিলতে না পেরে থুথু দিয়ে ফেলে দেয়। আনন্দের আতিশায্যে সে নিজের অলংকার ওয়াহশিকে দান করে দেয়। সে হামজার কাটা কান ও নাক দিয়ে কানের দুল ও গলার হার বানালো।

মুসলিম শিবিরে স্থিতিশীলতার পর যা ঘটলোঃ

রাসূল সাঃ যখন তাঁবুর ভেতরে কিছুটা স্থিতিশীল হন তখন আলি তার ঢালে করে পানি ভরে নিয়ে আসেন এবং রাসূল সাঃ-এর খাওয়ার জন্য তা পেশ করেন। কিন্তু পানিতে কিছুটা গন্ধ অনুভব করায় রাসূল সাঃ তা খেলেন না বরং তা দিয়ে নিজের চেহারার রক্ত ধুয়ে ফেললেন এবং মাথায় দিলেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাসূল সাঃ-এর জন্যে কোথা থেকে যেন সুস্বাদু পানি নিয়ে আসেন। নবীজি তখন তা পান করেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। ফাতিমার রাঃ রাসূল সাঃ এর ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছিলেন আর আলী তার ঢাল থেকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। অবশেষে রাসূল সাঃ সাহাবাদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করেন। তিনি বসে সালাত আদায় করেন এবং সাহাবাগণ তার পিছনে বসে বসে সালাত আদায় করেন।

তারা ঘোড়াকে দূরে রেখে উটের উপর সওয়ার হয়েছে অর্থাৎ, মক্কামুখী হয়েছে'।

নারীদের ভূমিকাঃ

উম্মে উমারাহ রাঃ নামক জনৈক মহিলার অসাধারণ বীরত্বের কথা না বললেই নয়। তিনি আয়েশা রাঃ ও অন্যান্য মহিলাদের সাথে মুসলিম সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন এবং আহত সৈনিকদের পানি সরবরাহ করছিলেন। এমন সময় শুনতে পেলেন যে রাসূলুল্লাহ সাঃ কে কুরাইশরা আক্রমণ করেছে এবং তিনি অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। এ খবর শোনামাত্র

উম্মে উমারাহ রাঃ কাঁধ থেকে পানির পাত্র ছুড়ে ফেললেন এবং তীরবর্ষণ করে বীরবিক্রমে কুরাইশদেরকে হত্যা করতে শুরু করলেন।

রাসূল সাঃ নিজে বলেছেন, "ওই বিপদের সময় আমি যেদিকেই তাকাই সেদিকে দেখি উম্মে উমারাহ আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছেন"। যুদ্ধশেষে কিছু মুসলিম মহিলা জিহাদের ময়দানে পৌছেন। আয়েশা এবং উম্মে সুলাইম তাদের পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে নিয়ে পিঠের উপর পানির মশক বহন করে আনতেন এবং পানি বের করে আহত মুসলিম যোদ্ধাদের মুখে দিতেন। উমার রাঃ বলেছেন, 'আনসারদের উম্মে সালীত উহুদের দিন আমাদেরকে মশক ভরে পানি পান করাচ্ছিল'।

উম্মে আইমান যখন দেখলেন পরাজিত ও পলায়নপর মুসলিমগণ মদিনায় ঢুকে যেতে চাচ্ছেন তখন তিনি তাদের চেহারায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং আহতদের পানি পান করাতে শুরু করেন। তখন হিব্বান ইবনে আরাকাতা তার উপর তীর নিক্ষেপ করলে তিনি পড়ে যান।

শহীদ ও কাফিরদের নিহতের সংখ্যাঃ

অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে মুসলিম শহীদদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন। এদের মধ্যে ৪১ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের, ২৪ জনের আউস গোত্রের, চারজন ছিলেন মুহাজির এবং একজন ইহুদী ছিল। আর কুরাইশদের নিহতদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। ইবনে ইসহাকের মতে, কুরাইশদের নিহতের সংখ্যা ছিল বাইশজন। তবে বিভিন্ন বর্ণনা ও সিরাতের কিতাবাদি লক্ষ করলে মনে হয় এই সংখ্যা ৩৭ জন। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

যুদ্ধবন্দীঃ

মদিনায় রাসুল সাঃ এর হাতে মুশরিকদের দুজন চোর ধরা পড়ে। তারা হল আবু ইযযা জুমাহী এবং মুয়াবিয়া ইবনে মুগীরাহ ইবনে আবিল আস। বদর যুদ্ধে রাসূল সাঃ-এর হাতে আবু ইযযা জুমাহী ধরা পড়েছিল এবং নিজের দরিদ্রতা ও কন্যা সন্তানদের কথা বলে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু পরে আবার রাসূল সাঃ-এর শত্রুদের সাথে যোগ দিলে সে রাসূল সাঃ-এর

সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যুদ্ধের পরে আবার একইভাবে নিজের জন্য প্রাণ ভিক্ষা চাইলে রাসূল সাঃ বলেন, "এখন আর তা হবে না। তুমি মক্কায় গিয়ে তৃপ্তির সাথে বলবে যে, আমি মুহাম্মাদকে দুইবার ধোঁকা দিয়েছি। সে সুযোগ তোমাকে দেয়া হবে না'। জুবায়ের রাঃ তার শিরশ্ছেদ করলে রাসূল সাঃ বললেন, "মুমিন কখনো এক গর্ত থেকে দুইবার আক্রান্ত হয় না"।

মুয়াবিয়া ইবনে মুগীরাহ ইবনে আবিল আস উহুদ যুদ্ধের পর মুশরিকেরা মক্কায় ফিরে গেলে তিনি মদীনায় উসমান রাঃ এর সাথে দেখা করতে আসেন। উসমান রাঃ তার জন্য রাসূল সাঃ এর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে রাসুল সাঃ তাকে এই শর্তে নিরাপত্তা দেন যে- মদীনায় সে ৩ দিনের বেশী অবস্থান করতে পারবে না, অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা করে ৩ দিনের বেশী মদীনায় অবস্থান করে কুরাইশদের গুপ্তচরবৃত্তি অব্যাহত রাখে। মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরে এলে সে পালাবার চেষ্টা করে। রাসূল সাঃ নির্দেশ দেন মুয়াবিয়া ইবনে মুগীরাহ ইবনে আবিল আসকে পাকড়াও করে হত্যা করার জন্য।

উহুদ যুদ্ধের তাৎপর্য ও শিক্ষাঃ

১। মুমিনদেরকে পূর্ববর্তীগণের ঘটনাগুলি স্মরণ করানো

২। মুমিনগণের উপর আপতিত বিপর্যয়ের হিকমত

৩। নেতার আদেশ লঙ্ঘন যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ

৪। দুনিয়ার উপরে আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া

৫। দ্বীনের স্থায়ীত্ব ও জিহাদের বিধান রাসূল সাঃ এর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়

৬। দুর্দশায় পতিত হওয়ার স্থান ও সময়ের সাথে বিপদের কোন সম্পর্ক নেই

আর রাজির মর্মান্তিক ঘটনাঃ

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে আজাল এবং কারাহ গোত্রের কয়েক ব্যক্তি রাসূল সাঃ কে এসে জানালেন যে, তাদের মাঝে ইসলামের কিছু কিছু চর্চা রয়েছে। পরিপূর্ণভাবে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য কয়েকজন সাহাবীকে তাদের এলাকায় পাঠানো উচিত। এজন্য রাসুল সাঃ ৬ জন (ইবনে ইসহাকের বর্ণনায়) মতান্তরে ১০ জন (সহীহ বুখারীর বর্ণনায়) সাহাবীকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন। তারা যখন রাবেগ এবং জেদ্দার মধ্যবর্তী রাজি নামক স্থানে পৌঁছে যান তখন আজল ও কারাহ এর লোকেরা বনু হুযাইলের একটি শাখাগোত্র বনু লাহইয়ানকে সাহাবীদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য লেলিয়ে দেয়। ফলে বনু লাহইয়ানের ১০০ জন তীরন্দাজ উক্ত সাহাবীদেরকে আক্রমণ করে বসে। সাহাবীগণ পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিলে তারা তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা নিচে নেমে আসলে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। আসিম রাঃ তাদের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কিন্তু অবিরাম তীর বর্ষণের ফলে ৭ জন সাহাবী সেখানেই শহীদ হয়ে গেলেন এবং বনু লাহইয়ান আরো একবার প্রতিশ্রুতি দিলে বাকি ৩ জন সাহাবী সরল বিশ্বাসে নিচে নেমে আসলেন। সাহাবীগণ নেমে আসার সাথে সাথেই তাদেরকে বেঁধে ফেলা হল ও এদের মধ্যে তৃতীয় সাহাবী তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করা হয়। যায়েদ বিন দাসীন্নাহ রাঃ এবং খুবাইব রাঃ কে নিয়ে গিয়ে মক্কায় বিক্রি করে দেওয়া হয়। তারা দুইজন বদরের যুদ্ধে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করেছিলেন।

বী'রে মা'উনার ট্রাজেডিঃ

যে মাসে রাজির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে সেই মাসেই ততোধিক বেদনাদায়ক ও অধিক মর্মান্তিক আরেকটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আবু বারা আমের বিন মালিক নামক এক ব্যক্তি

রাসূল সাঃ-এর সাথে দেখা করতে আসলেন। রাসূল সাঃ তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না আবার পরিত্যাগও করলেন না। তিনি রাসূল সাঃ কে অনুরোধ করলেন, নজদবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য কিছু সাহাবীকে প্রেরণ করতে। এরপর রাসূল সাঃ তার ৪০ জন মতান্তরে ৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবীকে আবু বারার সাথে পাঠালেন। তারা বীরে মাউনা নামক কুপের নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে শিবির স্থাপনের পর হারাম বিন মিলহানকে সাহাবীগন রাসূল সাঃ-এর পত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমির বিন তুফাইলের কাছে চিঠি পাঠালেন। কিন্তু আমের সেই চিঠি ছুয়েও দেখলো না বরং হারাম বিন মিলহান রাঃ কে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফেলল।

এরপর আমির অবশিষ্ট সাহাবাদেরকে হত্যা করার জন্য তার গোত্রকে আহ্বান জানালো। কিন্তু তারা রাজি না হলে বনু সুলাইম গোত্রকে সে আহ্বান জানাল। বনু সুলাইমের উসাইয়্যা, রি'ল এবং যাকাওয়ান তার আহবানে সাড়া দিয়ে সাহাবীদেরকে সেখানেই শহীদ করে ফেলল। কেবলমাত্র জীবিত ছিলেন কা'ব ইবনে যায়দ ইবনে নাজ্জার রাঃ। তাকে শহীদানের মধ্যে থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়।

রাজি এবং বীরে মাউনার ঘটনা মাত্র অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে সংঘটিত হয়েছিল। ফলে এই ঘটনা দুটি রাসূল সাঃ এবং সাহাবীদের মনে গভীর দুঃখ-কষ্ট এবং যন্ত্রণার সূত্রপাত করেছিল। ইবনে সা'দ লিখেছেন, আসহাবে রাজী ও আসহাবে বীরে মাউনার সংবাদ রাসূল সাঃ-এর নিকট একই রাত্রিতে পৌঁছেছিল।

ঘটনা দুটিতে রাসূল সাঃ এতই ব্যথিত করেহন যে, তিনি ফজরের সালাতে রি'ল, যাকাওয়ান, লাহইয়ান ও উসাইয়্যা গোত্রের বিরুদ্ধে একমাস যাবত কুনুতে নাজেলা পাঠ করতে থাকেন। দিয়েছিলেন।

কিন্তু রাজী অভিযান ও বীরে মাউনার ঘটনার মাধ্যমে তারা স্পর্ধার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে এবং রাসূল সাঃ কে হত্যার পরি কল্পনা গ্রহণ করে যার ফলে বনু নাযীরের সাথে যুদ্ধ অবধারিত হয়ে যায়।

বনু নাযীরের বিরুদ্ধে অভিযানের কারণঃ

কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে রাসূল সাঃ ইহুদিদের কাছে গিয়ে বনু কিলাব গোত্রের সেই দুই ব্যক্তির রক্তপণ সম্পর্কে কথা বলছিলেন যাদেরকে আমির ইবনে উমাইয়্যা যামরী ভুলক্রমে হত্যা করেছিলেন। তারা রাসলু সাঃ কে একটি স্থানে বসে থাকতে বললেন এবং রাসূল সাঃ এর প্রয়োজন পূরণের ওয়াদা করলেন। রাসূল সাঃ দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে বসে পড়লেন এবং তাদের ওয়াদা পূরণের অপেক্ষায় রইলেন।

ইহুদীরা এই সুযোগে রাসলু সাঃ কে হত্যা করার জন্য পরস্পর আলাপ-আলোচনা করতে লাগল জিবরীল আঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল সাঃ এর কাছে এসে তাদের ষডয়ন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন। রাসূল সাঃ সেখান থেকে কোন কথা না বলে দ্রুত মদিনা অভিমুখে রওনা দিলেন। সাহাবীগণ তার সঙ্গে পরে এসে মিলিত হয়। মদিনায় ফিরে রাসূল সাঃ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাঃ কে নির্দেশ দিলেন, ইহুদিদের কাছে এই নির্দেশ পৌঁছে দিতে তারা যেন ১০ দিনের মধ্যে মদিনা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। ১০ দিন পর তাদের যাকেই মদিনায় পাওয়া যাবে তার শিরচ্ছেদ করা হবে। এই নির্দেশ পাওয়ার পর তারা মদিনা ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। কিন্তু মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সালূলের পরামর্শক্রমে এবং তার বাধা দেওয়ার কারণে ইহুদিরা বেকে বসলো। সালুল তাদেরকে বোঝালো যে, তার দুই হাজার লোক রয়েছে যারা বনু নাফিরকে রক্ষা করার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবে। এই কথাতে বর্ননাজিরের নেতারা আশ্বস্ত হলো এবং সে রাসল সাঃ কে জানিয়ে দিল যে, তারা মদিনা পরিত্যাগ করে যাবে না। রাসল সাঃ চাইলে যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

বনু নাযীরের বিরুদ্ধে অভিযানঃ

বনু নাজিরের পক্ষ থেকে এই উত্তর পাওয়ার পর রাসূল সাঃ সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাঃ কে মদিনার ভারপ্রাপ্ত আমীর বানয়ে এবং আলী ইবনে আবি তালিব রাঃ এর হাতে যুদ্ধের পতাকা দিয়ে বনু নাজিরের ইহুদিদের দুর্গ অভিমুখে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তাদের দুর্গকে অবরোধ করলেন। বনু নাজির দুর্গের ভেতর থেকে তীর এবং পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। তাদের দুর্গের সামনে খেজুর বাগান ছিল যার কারণে মুসলিম বাহিনীর দুর্গ অবরোধ করতে সমস্যা হচ্ছিল। রাসূল সাঃ এই গাছগুলো কেটে ফেলার কিংবা পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ সূরা হাশরের ৫ নং আয়াত নাযিল করেন-

অর্থঃ তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন। (সূরা হাশর, ৫৯:৫)

যখন তাদের দুর্গ অবরোধ করা হলো তখন বনু কুরাইজা প্রতিশ্রুত সাহায্য করা থেকে বিরত রইল। আব্দুল্লাহ বিন উবাইও তার দেওয়া ওয়াদা রক্ষা করল না। ফলে মোট ৬ দিন মতান্তরে ১৫ দিন তারা অবরুদ্ধ হয়ে রইল। তাদের মনোবল ভেঙে পড়ল এবং তারা অস্ত্র সমর্পণ করে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হল। রাসূল সাঃ নির্দেশ দিলেন, অস্ত্র ছাড়া যেসব দ্রব্য তারা উটের পিঠে নিয়ে যেতে পারবে সেগুলো তারা নিয়ে যেতে পারবে এবং তাদের পরিবার-পরি জন ও তাদের সঙ্গে যেতে পারবে। এই শর্তের পর ইহুদিরা উটের উপর যাবতীয় মালামাল বোঝাই করে রওনা হয়ে যায়। অধিকাংশ ইহুদী এবং তাদের নেতারা খাইবারের অভিমুখে চলে যায় আর আরেকটি দল চলে যায় সিরিয়ার অভিমুখে।

বনু নাজিরের অস্ত্র জমি জমা এবং বাড়ি ঘর সবকি ছুই রাসূল সাঃ এর অধিকারে চলে আসে। আব্বাস রাঃ সূরা হাশর সম্পর্কে বলতেন, 'তোমরা এই সূরাটি কে সূরা বনু নাযির বলো!"

খন্দক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটঃ

মদিনা থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর বনু নাখির খাইবারে গিয়ে নিজেদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা শুরু করে। এজন্য তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে যুদ্ধে নামানোর পরিকল্পনা করে। কুরাইশদেরকে মদিনা আক্রমণের প্রস্তাব দিলে, কুরাইশরা সম্মতি দেয়। মদিনার ফসলের আশায় বনু গাতফান গোত্রের লোকেরাও এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে। এভাবে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীতে যোগ দেয়। ইহুদিদের প্রতিনিধিদল মক্কার মুশরিকদের বলেছিল, 'নিঃসন্দেহে তোমাদের ধর্ম মোহাম্মদের ধর্মের চেয়ে উত্তম এবং তাদের তুলনায় তোমরা সত্যের অধিক নিকটবর্তী।

গাতফান গোত্রের সাথে ইহুদিদের সম্পাদিত চুক্তির ধারাগুলি ছিল -

এক, যৌথবাহিনীতে বনু পাতফান গোত্রের ছয় হাজার সৈন্য অংশ নেবে।

দুই, ইহুদিদের পক্ষ থেকে খাইবারের এক বছরের খেজুর বনু গাতফানের গোত্রসমূহকে দেওয়া হবে।

ইহুদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে দশ হাজার সৈন্য সমবেত করতে সমর্থ হয়। মিত্র। রাসূল সাঃ এর শক্তিশালী গোয়েন্দাবাহিনী ইহুদিদের যাবতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে এবং অনতিবিলম্বে রাসূল সাঃ এর কাছে পৌঁছে দেয়। ইহুদিদের পরিকল্পনার সংবাদ পেয়ে রাসূল সাঃ সাহাবীগণকে নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক আয়োজন করেন। মদিনার রক্ষাকরণে কী কী উদ্যোগ নেওয়া যায় সে বিষয়ে সাহাবীদের থেকে পরামর্শ নেন। সালমান ফারসী রাঃ রাসূল সাঃ কে মদিনার চারপাশে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। মুসলিমগণ এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

রাসূল সা: মদিনার উত্তর দিকেই পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। পরিখা খননের বিষয়টি ছিল মুসলিমদের এক নতুন সমরকৌশল। আরবের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুসলিমরা পরিখা খনন করেন যা কাফেরদের জন্য বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের যাবতীয় যুদ্ধ পরিকল্পনাকে ধূলিসাৎ করে দেয়। কাফিরদের সমন্বিত বাহিনীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরাজিত করতে ও তাদের শক্তিকে ভেঙে দিতে পরিখা খননের পরিকল্পনা ও নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মুসলিমদের যুদ্ধ প্রস্তুতিঃ

১। প্রথমেই মুসলিম মুজাহিদগণের স্ত্রী ও সন্তানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাসূল সাঃ উদ্যোগ নেন।

২। পরিখা খননের কাজে রাসূল সা: নিজে সাহাবীদের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

৩। খন্দকের দিন সাহাবীদের ক্ষুৎপিপাসার কষ্টে রাসূল সাঃ অংশ নিয়েছিলেন। সাহাবীগণ তাকে নিজেদের পেটে পাথর বাধা অবস্থায় ক্ষুধার কথা জানালে, তিনি কাপড় তুলে দেখালেন যে, তার পেটে দুটি পাথর বাধা রয়েছে।

৪। পরীখা খননকালে রাসূল সাঃ সাহাবীদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করেন। মানসিকভাবে তাদেরকে চাঙ্গা রাখার জন্য তিনি নিজে কবিতা আবৃত্তি করতেন, সাহাবীরা তার কবিতার জবাব দিতেন। আবার সাহাবীদের কবিতার জবাব রাসূল সাঃ কবিতার মাধ্যমে দিতেন।

৫। পরিখা খননকারী সাহাবীদের যখন কোনো প্রয়োজন দেখা দিত তখন তারা রাসূল সা: এর কাছে অনুমতি চাইতেন এবং রাসূল সাঃ তাদেরকে অনুমতি প্রদান করতেন। যখন তাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে যেত তারা পুনরায় ফিরে এসে পরিখা খননের কাজে মনোনিবেশ করতেন।

৬। পরীখা খনকালে যেন কাফিররা আক্রমন করতে না পারে এজন্য রাসূল সাঃ সাহাবীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে পাহারার কাজে নিযুক্ত করেন।

পরিখা খননকালে প্রকাশিত রাসুল সাঃ এর মুজিযাসমূহঃ

১। জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ একটি বকরির বাচ্চা জবাই করলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে ১ সা গম পিষে আটা তৈরি করতে বললেন। এরপর রাসুল সাঃ কে অনুরোধ করলেন কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীকে নিয়ে তাঁর বাসায় দাওয়াত গ্রহণ করতে। রাসুল সাঃ পরিখা খননরত প্রায় ১০০০ সাহাবীকে নিয়ে তাঁর বাসায় গেলেন। এসময় রাসুল সাঃ এর একটি মুজিয়া প্রকাশিত হলো। ১০০০ সাহাবীর প্রত্যেকেই পূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে আহার করলেন অথচ গোশত এবং আটার পরিমাণ শুরুতে যতটুকু ছিল ততটুকুই থাকল এবং এই অবস্থায় আটা থেকে ক্রমাগতভাবে রুটি তৈরি হতে থাকলো।

২। নুমান বিন বাশির রাঃ এর বোন তাঁর বাবা এবং মামাকে খাওয়ানোর জন্য সামান্য কিছু খেজুর নিয়ে খন্দকের কাছে আসলেন। তখন রাসূল সাঃ তা নিয়ে একটি কাপড়ের উপরে ছড়িয়ে দিলেন এবং খন্দক খননকারী সকল সাহাবীকে খেতে বললেন। সাহাবীগণ সেখান থেকে খেতে থাকলে খেজুরের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকলো, এমনকি সমস্ত সাহাবী পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরেও সেই পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রইল যতটুকু শুরুতে ছিল।

৩। "পরিখা খনন করার সময় একটি অত্যন্ত শক্ত পাথর কাজের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। এই অবস্থায় রাসুল সাঃ সেই পাথরের উপর আঘাত হানলেন এবং তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল"।

যুদ্ধকালীন ঘটনাবলীঃ

কুরাইশ এবং তাদের মিত্রদের চার হাজার সৈন্যের বাহিনী ও বনু গাতফানের ছয় হাজার সৈন্যের বাহিনী যখন মদিনার বাহিরে সমবেত হল তখন বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে সত্যিকার মুমিন ও মুসলিমদের ঈমান বৃদ্ধি পেল।

কিন্তু মুনাফিক এবং দুর্বল ঈমানের লোকেরা এ বিশাল বাহিনী দেখে হতভম্ব হয়ে গেল এবং মৃত্যু ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপে উঠল।,

রাসুল সাঃ ৩০০০ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং সালআ পর্বতকে পিছনে রেখে শিবির স্থাপন করলেন। সামনে ছিল খন্দক যা মুসলিম বাহিনী লিম ও কাফির বাহিনীর মাঝে

প্রতিবন্ধক হিসেবে বিরাজ করছিল। এই যুদ্ধে মুসলিমদের code language ছিল- "হা মীম। লা ইউনসরুন" (হা মীম। তাদেরকে সাহায্য করা হবে না)।

আক্রমণের উদ্দেশ্যে মুশরিকগণ মদিনার দিকে অগ্রসর হয়ে পরিখার মুখোমুখি হলো। এই ধরনের রণকৌশলে তারা অভ্যস্ত ছিল না এবং অতীতে কখনোই তারা এই ধরনের কিছু প্রত্যক্ষ করেনি। তারা এমন কোন দুর্বল স্থানের অনুসন্ধান করছিল যেখান দিয়ে তারা মদিনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। এদিকে সাহাবীগণ কাফিরদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন এবং তারা যাতে খন্দকের নিকটবর্তী হতে না পারে এজন্য মাঝে মাঝে তীর নিক্ষেপ করছিলেন। এর এর উদ্দেশ্য ছিল মুশরিকদেরকে খন্দক থেকে দূরে রাখা যাতে তারা খন্দকের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়তে কিংবা এর অংশবিশেষ ভরাট করে ফেলে পথ তৈরি করতে না পারে। মুশরিকদের মধ্যে ৩ জনএকটি সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়ে খন্দক পার হয়ে মদিনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ফেলল। আলী রাঃ এবং কয়েকজন সাহাবী তাদের পথ রোধ করলেন। আলী রাঃ আমর বিন আব্দে উদ্দকে হত্যা করল এই অবস্থা দেখে অন্যান্য মুশরিকগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাইরে পলায়ন করল। শত্রুপক্ষের সাথে অব্যাহত মোকাবেলার কারণে এই দিন ৪ ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায়। সূর্যাস্তের পরে রাসুল সাহাবীগণকে নিয়ে আসর এবং মাগরিবের সালাত একসাথে আদায় করেন। উল্লেখ্য এই যুদ্ধে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় নি বরং সমগ্র যুদ্ধ দুইপক্ষের তীর নিক্ষেপ ও সামান্য সম্মুখযুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

উভয়পক্ষের তীর নিক্ষেপের ফলে মুসলিমদের ৬ জন এবং মুশরিকদের ১০ জন নিহত হয়। মুসলিমদের মাঝে সা'দ বিন মুয়ায আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি মুশরিকদের জন্য আল্লাহর কাছে বদ দোয়া করেন এবং বনু কুরাইযার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ তাঁর এই দূয়া কবুল করেছিলেন।

বনু কুরাইযার চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতাঃ

বনু নাজিরের নেতা হুয়াই বিন আখতাব বানু কুরাইজার নেতা কা'ব বিন আসাদ কুরাযীর সাথে সাক্ষাত করে। কা'ব বিন আসাদ কুরাযী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে বনু কুরাইযার পক্ষ থেকে রাসূলের সাথে সন্ধি চুক্তি করেছিল। হুয়াই বিন আখতাব কা'ব বিন আসাদ কুরাযীকে মুসলিমদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য উস্কানি দিতে থাকে কিন্তু সে বরাবরই তা প্রত্যাখান করে। অবশেষে মদিনার বাহিরে সমবেত সেনাবাহিনীর বর্ণনা দিয়ে এবং বারবার তাকে উস্কানি দিতে দিতে এক পর্যায়ে সে তাকে রাজি করতে সম্মত হয়। ফলে বনু কুরাইযার পক্ষ থেকে কা'ব বিন আসাদ কুরাযী মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

রাসুল সাঃ যখন বনু কুরাইযার অঙ্গীকার ভঙ্গের খবর পেলেন তখন তিনি খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য কয়েকজন সাহাবীকে কে পাঠালেন। তারা অনুসন্ধান চালিয়ে ঘটনার সত্যতা পেলেন এবং রাসূলের সামনে এসে ঘটনার বিস্তারিত পেশ করলেন। ঘটনার সত্যতা পেয়ে উল্লেখিত সাহাবীগন রাসূলের কাছে এসে সাংকেতিক ভাষায় বললেন- "আযাল এবং কারাহ"। এর অর্থ হল রাজি এর সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবীগণের সাথে যেমন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হয়েছিল তেমনি রাসূলের সাথেও অঙ্গীকার ভঙ্গ করা করেছে।

এই জটিল পরিস্থিতিতে কতিপয় মুনাফিকের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেল। কোন কোন মুনাফিক একথা বলতে লাগলো আমাদের ঘরবাড়িগুলো শত্রুদের সামনে খোলা পড়ে আছে সুতরাং আমাদেরকে আমাদের ঘর বাড়িতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক।

এরূপ পরিস্থিতিতে রাসুল সাঃ কাপড় দিয়ে তার মুখমন্ডল ঢেকে নিলেন এবং দীর্ঘসময় চিত হয়ে শুয়ে রইলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে সাহাবীগণ চরম দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। অবশেষে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হলেন এবং "আল্লাহু আকবার" বলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন- "হে মুসলিমগণ তোমরা আল্লাহর সাহায্যের শুভসংবাদ গ্রহণ করো"।

রাসুল সাঃ এই সময় একটি কূটনৈতিক কৌশল গ্রহণ করলেন। তিনি শত্রুদলের মাঝে ফাটল সৃষ্টির লক্ষ্যে বনু গাতফানের দুই নেতা উয়াইনাহ বিন হিসন এবং হারিস বিন আওফের সাথে মদিনার উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ দেওয়ার শর্তে একটি সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন করার চিন্তা করলেন। কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে রাসূল সাঃ এই সম্পর্কে সা'দ বিন মুয়ায এবং সা'দ বিন উবাদাহ রাঃ এর সাথে আলোচনা করলেন। তারা উভয়েই একই মত দিলেন আর তা

হলো- যদি এই চুক্তি সম্পাদন আল্লাহর নির্দেশ হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি এটি রাসুলের ব্যক্তিগত মত হয় তাহলে এই চুক্তি সম্পাদন করার কোনো প্রয়োজন নেই

এই সময় আল্লাহ গায়েব থেকে সাহায্য নাযিল করলেন। বনু গাতফান গোত্রের নুয়াইম বিন মাস'ঊদ রাসূলের কাছে হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি মুসলিম হয়ে গেছি কিন্তু আমার গোত্র জানে না। তাই আপনি আমাকে কোন আদেশ করুন"। রাসূল সাঃ তাকে বললেন, "ব্যক্তি হিসেবে তুমি একক তাই তোমার পক্ষে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয় তবে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং তাদের মনোবল নষ্ট করার মত কৌশল তুমি করতে পারো। কারন শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার ব্যাপারে এই কৌশল অনেক মূল্যবান। যুদ্ধ হচ্ছে কূটকৌশলের খেলা"।

নুয়াইন বিন মাস'ঊদ রাঃ তাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছিল।

৫ম হিজরীর শুক্রবার ও শনিবারের মধ্যরাত্রিতে কুরাইশগণ ইহুদিদের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আহ্বান জানাল। কিন্তু ইহূদীগণ যুদ্ধ করতে অস্বীকার করল এবং পুরুষদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে বন্ধক হিসেবে চেয়ে পাঠাল। অন্যথায় তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না বলেও জানাল। একথা শুনে কুরাইশগন সতর্ক হয়ে গেল তারা ইহুদীগণ কে একথা বলে খবর পাঠাল যে, "আল্লাহর কসম! আপনাদের হাতে কোন লোককে বন্ধক রাখবো না। আসুন আপনারা বেরিয়ে পড়ুন এবং আমরা উভয় পক্ষ একযোগে মুহাম্মাদের বাহিনী আক্রমণ করি"। এভাবে উভয়পক্ষের বন্ধন ভেঙে গেলো যার ফলশ্রুতিতে তাদের সাহস এবং মনোবল ভেঙে পড়ল।

রাসূল সাঃ এই দূয়া করেছিলেন আল্লাহর কাছে- "হে আল্লাহ! হে কিতাব নাযিলকারী! হে দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী! এই সেনাবাহিনীকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত এবং প্রকম্পিত করুন"।

আল্লাহ রাসুল সাঃ এবং মুসলিমদের দোয়া কবুল করে মুশরিকদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেন এবং মনোবল ভেঙে দেন। এরপর তাদের উপর উত্তপ্ত বায়ু প্রেরণ করেন যা তাদের তাবু ও

পাত্রগুলিকে উল্টে দেয়, তাঁবুর খুঁটিসমূহ উৎপাটন করে ফেলে এবং সবকিছু তছনছ করে দেন।

তীব্র শীতের রাতে রাসুল হুজাইফা বিন ইয়ামান রাঃ কে পাঠালেন মুশরিকদের খবর সংগ্রহের জন্য। তিনি সেখানে পৌছে দেখলেন- মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। রাসুল সাঃ ভোরবেলা দেখলেন ময়দান একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং কোন প্রকার সাফল্য লাভ ছাড়াই এমনকি সংঘর্ষ ছাড়াই গভীর অসন্তোষ এবং ক্রোধের সাথে তারা ফিরে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহ মুসলিমদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করলেন এবং মুসলিম বাহিনীকে ইজ্জত ও সম্মান প্রদান করলেন। মুসলিমগণ কোনরকম বড় সংঘর্ষ ছাড়াই নিরাপদ হয়ে গেলেন এবং রাসূল সাঃ মদীনায় ফিরে আসলেন।

বনু কুরাইযাহর যুদ্ধঃ

খন্দক যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরে যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু সালামাহর ঘরে গোসল করছিলেন, সেদিন যুহরের সময় জিবরাঈল (আ) আসলেন এবং বললেন, "আপনি কি অস্ত্রশস্ত্র খুলে রেখে দিয়েছেন? ফেরেশতাগণ কিন্তু এখনও অস্ত্রশস্ত্র খোলেন নি। আমিও শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে এখানেই চলে এসেছি। উঠুন! এবং আপনার সঙ্গীদের নিয়ে বনু কুরাইযার দিকে অগ্রসর হতে থাকুন। আমি সামনে গিয়ে তাঁদের দূর্গে কাঁপুনি তৈরী করে তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি সঞ্চার করে দিব।"

রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা বলার পর জিবরাঈল (আ) ফেরেশতাদের সাথে যাত্রা শুরু করলো।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা দিলেন যে, যারা শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর আছেন তারা আসরের সালাত পড়বেন বনু কুরাইযায় গিয়ে। এরপর ইবনু উম্মু মাকতুম (রা) কে মদিনার তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব দেন এবং আলী (রা) এর হাতে যুদ্ধের পতাকা দিয়ে বনু

কুরাইযাহর দিকে অগ্রসর হন। যখন তিনি বনু কুরাইযাহর দূর্গের কাছে পৌঁছলেন, তখন তারা তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা শুরু করলো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাজিরীন ও আনসারদের একটি সুসংগঠিত দল নিয়ে সামনের দিকে এগুলেন।

যে ভাবেই হোক মুসলিম সৈন্যদল বনু কুরাইযাহয় এসে পৌঁছায় এবং দূর্গকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তখন মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিলো তিনহাজার। মুসলিমদের লাগাতার অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে বনু কুরাইযাহর ইহুদিগণ যখন যুদ্ধে পরাজিত হতে যাচ্ছিলেন, তখন তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ তাদের সামনে ৩টি প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন। সেগুলো হচ্ছেঃ

১. হয় তারা মুহাম্মদ (সা) এর দ্বীনে প্রবেশ করে নিজেদের জান-মাল এবং সন্তানসন্ততিদের রক্ষা করবে।

২. অথবা, নিজ সন্তানদের নিজের হাতে হত্যা করে নবী (সা) এর দিকে এগিয়ে সর্ব শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবে।

৩. অথবা রাসূল (সা) এবং তার সাহাবাদের ধোঁকা দিয়ে শনিবার দিনে তাদের উপর আক্রমণ করবে। কিন্তু ইহুদিগণ এই তিনটি প্রস্তাবের একটিও মানলো না।

এ তিনটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর বনু কুরাইযাহর কাছে আর একটি পথ বাকি থাকলো। তা হচ্ছে- তারা আত্মসমর্পণ করবে এবং তাদের কী হবে সে বিষয়টা রাসূলুল্লাহর উপর ছেড়ে দেবে। তারা আরো চিন্তা ভাবনা করে শেষে সিদ্ধান্ত নিলো- আত্মসমর্পণের আগে তারা সাহায্য চুক্তিতে আবদ্ধ মুসলিমগণের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে। সম্ভবত এর মাধ্যমে আত্মসমর্পণের ফলাফল সম্পর্কে তারা কিছুটা ধারণা পাবে।

এ কারণে তারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে প্রস্তাব পাঠালো যে, আবু লুবাবাকে তাদের কাছে পাঠানো হোক। যখন আবু লুবাবা সেখানে গেলো, তখন সেখানের পুরুষেরা তার কাছে দৌঁড়ে এলো। নারী ও শিশুরা কান্না করতে করতে তার কাছে এলো। এই অবস্থা দেখে আবু লুবাবার

মনে কিছুটা ভাবাবেগ হলো। ইহুদিরা বললো, "আবু লুবাবা। আপনি কি এটা সঠিক মনে করেন যে. বিরোধ মেটানোর জন্য আমরা আত্মসমর্পণ করব?"

বললো, "হ্যাঁ!" কিন্তু সাথে সাথে তার হাত কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলো, যার অর্থ ছিলো হত্যা। কিন্তু তখনই সে উপলব্ধি করলো যে, ব্যাপারটি আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে খেয়ানত করা হচ্ছে।

এদিকে তার আসতে দেরী হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) বেশ মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি লক্ষ্য করছিলেন। তারপর তিনি প্রকৃত ঘটনা জেনে বললেন, "যদি সে আমার কাছে আসতো তাহলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।

এদিকে আবু লুবাবা এমন গোপন ইশারা করা সত্ত্বেও বনু কুরাইযাহ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তিনি যা উপযুক্ত মনে করবেন তা তারা মেনে নেবে বলে স্থির করে।

রাসুলুল্লাহ (সা) পুরুষদের বন্দি করার নির্দেশ দিলে কুরাইযাহর সব পুরুষদের বন্দি করা হয়। মহিলা, শিশু ও অক্ষম পুরুষদের যত্নসহকারে আলাদা রাখা হলো।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এ ব্যাপারটি সা'দ বিন মুয়াযকে দায়িত্ব দিলে তাকে ডেকে পাঠানো হয়। যখন তিনি আসলেন তখন গোত্রীয় লোকজন চারদিক থেকে তাকে ঘিরে বলতে থাকলো, "হে সা'দ! নিজের হালীফদের সঙ্গে উত্তম ও কল্যাণকর মীমাংসা করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে এজন্যই বিচারক নির্বাচন করেছেন যে, আপনি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন।"

তখন তিনি বললেন, "এখন এমন এক সময় এসেছে যখন সা'দ আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে কোনো নিন্দুকের নিন্দার চিন্তা বা ভয় করে না।" এ কথা শোনার পর অনেকেই মদীনায় আসে এবং বন্দিদের মৃত্যু নিশ্চিত বলে ঘোষণা করে।

এরপর সা'দ যখন নবী কারীম (সা) এর কাছে পৌঁছালেন। তখন তিনি বললেন, "তোমরা উঠে তোমাদের নেতার দিকে এগিয়ে যাও।" যখন তাকে নামিয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে আনা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "হে সা'দ! এ সব লোকজন আপনার মীমাংসার উপর আস্থাশীল হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।"

সা'দ বললেন, "তাহলে তাদের সম্পর্কে আমার বিচারের রায় হচ্ছে এই যে, পুরুষদের হত্যা করা হোক, মহিলা ও শিশুদের বন্দী করে রাখা হোক এবং সম্পদগুলো বন্টন করে দেওয়া হোক।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "আপনি তাদের ব্যাপারে সেই বিচারটিই করেছেন যা আল্লাহ আসমানে করেছেন।"

ছয়শ থেকে সাতশ বন্দীর শিরঃচ্ছেদ করা হয় এবং বিশ্বাসঘাতক ও ওয়াদাভঙ্গকারী বনু কুরাইযাহকে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়।

বনু মুস্তালিক্কের যুদ্ধঃ

অধিকাংশের মতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে। রাসুল সাঃ তার গোয়েন্দা বাহিনী মারফত জানতে পারেন, বনু মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারিস বিন আবী খিরার মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নিজ গোত্র এবং অন্যান্য গোত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে মদিনার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন। রাসূল সাঃ যখন এই অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত হলেন তখন তিনি যুদ্ধ প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সাহাবীদেরকে। নির্দেশ দিলেন এবং অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এই বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল শাবান মাসের ২ তারিখে। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে প্রথম কোন মুনাফিক বাহিনী অংশগ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ সাঃ মুরায়সী কূপ পর্যন্ত যখন পৌঁছলেন তখন বনু মুস্তালিক গোত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহন করছিলেন আবু বকর সিদ্দিক রাঃ এবং আনসারদের বিশেষ পতাকাটি ছিল হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাঃ এর হাতে। কিছুক্ষনের মাঝেই উভয়পক্ষের মাঝে তীর বিনিময় শুরু হয়। এরপর রাসূল সাঃ-এর নির্দেশক্রমে সাহাবিগণ সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বিজয় অর্জন করেন। মুশরিকরা পরাজিত হয় এবং কিছুসংখ্যক নিহত হয়। মহিলা ও শিশুদের বন্দি করা হয়। বকরীসহ পশুপাল শেষপর্যন্ত মুসলিমগণ গনিমত হিসেবে লাভ করেন। মুসলিমদের মধ্যে মাত্র একজন শাহাদাত বরণ করেন।

জুয়াইরিয়া রাঃ এর সাথে রাসূল সাঃ-এর বিবাহঃ

শত্রুবাহিনীর নারী ও শিশুদের মধ্যে জুয়াইরিয়া ছিলেন। তিনি ছিলেন বনু মুস্তালিকের সর্দার হারিস ইবনে আবী যিরারের কন্যা। রাসূল সাঃ তাঁর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে জুয়াইরিয়াকে মুক্ত করে দেন এবং তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। এই বিয়ের ফলে বনু মুস্তালিক গোত্রের একশ পরিবারের লোকদেরকে সাহাবীগণ মুক্ত করে দেন। তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর এর ফলে বলা হতে থাকলো যে এরা সকলেই রাসূল সাঃ-এর শ্বশুর বংশের লোক। এটাই ছিল বনু মুস্তালিক যুদ্ধের বিবরন।

ইফকের ঘটনাঃ

আয়েশা রা. বলেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের নামের ব্যাপারে লটারি করতেন। আয়েশা রা. বলেন, এমনি এক যুদ্ধে (মুরায়সীর যুদ্ধ) তিনি আমাদের মাঝে লটারি করেন। এতে আমার নাম বেরিয়ে আসে। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে বের হলাম। এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণার পর আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) পায়ে হেটে সেনাছাউনী অতিক্রম করে (একটু সামনে) গেলাম। এরপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে

হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরী করা আমার গলার হারটি ছিড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হার তালাশ করতে করতে আমার আসতে বিলম্ব হয়ে যায়'।

সৈন্যদল রওয়ানা হওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজস্ব স্থানে ফিরে এসে দেখি তাদের (সৈন্যদল) কোন আহবায়ক এবং কোন উত্তরদাতা তথায় নেই। (নিরুপায় হয়ে) তখন আমি পূর্বে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। বানু সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা. (যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন) সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি প্রত্যুষে আমার অবস্থানস্থলের কাছে পৌঁছে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকানোর পর আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহহি ওয়া ইন্না ইলায়হি

রাজিউন, রাসুল সাঃ এর স্ত্রী? একথা বললে আমি তা শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। এরপর তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সাওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিইয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি গিয়ে তাতে আরোহণ করলাম। পরে তিনি আমাকেসহ সাওয়ারীকে টেনে আগে আগে চলতে লাগলেন, পরিশেষে ঠিক দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম।

আয়েশা রা. বলেন, এরপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদীনায় আগমন করার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকরীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে লাগল। কিন্তু এসবের কিছুই আমি জানি না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়।

তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল 'তুমি কেমন আছ' জিজ্ঞাসা করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে চরম সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। আয়েশা রা.

বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছ? আয়েশা রা. বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমকে অনুমতি দিলেন।

তখন (বাড়িতে গিয়ে) আমি আমার আম্মাকে বললাম, লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। তিনি বললেন হ্যাঁ।

আয়েশা রা. বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অশ্রুবারা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও আমার আসেনি। আব্বা-আম্মা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সাথে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা ক্রন্দনরত ছিলাম ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র এবং আমি নিষ্কলুষ তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। তিনি বলেছিলেন: "সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল"। এরপর আমি মুখ ফিরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। তবে আল্লাহর কসম, আমি কখনো ধারণা করিনি যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহর ওহী নাযিল করবেন যা পঠিত হবে।। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এমন স্বপ্ন দেখানো হবে যার দ্বারা আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখনো তাঁর বসার জায়গা ছাড়েননি এবং ঘরের লোকদের থেকেও কেউ ঘর থেকে বাইরে যাননি। এমতাবস্থায় তাঁর উপর ওহী নাযিল হতে শুরু হল। আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি হাসিমুখে প্রথমে যে কথাটি বললেন, তা হল, হে আয়েশা! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা জাহির করে দিয়েছেন। আয়েশা রা বললেন, অল্লাহ (আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে) যে দশটি আয়াত নাযিল করেছেন, তা হল এই:"**(সূরা নূর, ২৪:১১-২০)**

আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবুবকর সিদ্দীক রা, মিসতাহকে সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়েশা রা. সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবু বকর সিদ্দীক রা কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক কোন সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ তায়ালা (সূরা নূর, ২৪: ২২) আয়াত নাজিল করলেন

এরপর তিনি মিসতাহ রা.-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনরায় দিতে শুরু করলেন।

সূরা নূর এর আলোকে ইফকের ঘটনা থেকে প্রাপ্ত শার'ঈ নির্দেশনাঃ

১। মুমিনদের পারস্পরিক সহমর্মিতা ও পরস্পরের প্রতি উত্তম ধারণা করার নির্দেশনা দিয়েছেন আল্লাহ। (৪ নং আয়াত)

২। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আয়েশা রাঃ এর চারিত্রিক পবিত্রতার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। (১১ নং আয়াত)

৩। সংবাদ প্রচার এর পূর্বেই যাচাই-বাছাইয়ের নির্দেশনা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (১২ ও ১৩ নং আয়াত)

৪। ভিত্তিহীন অপপ্রচার থেকে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। (১৭ নং আয়াত)

৫। মমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসারের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি জানিয়ে দেওয়া হয়। (১৯ নং আয়াত)

৬। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। (২১ নং আয়াত)

৭। নিকট আত্মীয় স্বজনদের মন্দ আচরণ সত্বেও তাদের জন্য সাদাকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। (২২ নং আয়াত)

৮। সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকা মুমিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাদের মর্যাদা রক্ষায় এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকারীদের। দুনিয়া ও পরকালে লাঞ্চনার হুমকি দেওয়া হয়। (২৩-২৫ নং আয়াত)

হুদায়বিয়ার সন্ধিঃ প্রেক্ষাপট

রাসূল সাঃ এর স্বপ্নঃ

ষষ্ঠ হিজরীতে একদিন রাসূল সাঃ স্বপ্নে দেখলেন, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ মসজিদুল হারামে প্রবেশের অধিকার লাভ করছেন। তিনি আরও দেখেন, তিনি কাবা ঘরের চাবি নিয়ে সাহাবীগণের সাথে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ এবং উমরা সম্পন্ন করেছেন। অতঃপর কিছু সংখ্যক লোক মাথা মুন্ডন করেছেন এবং কিছু সংখ্যক লোক চুল কেটেছেন। এরপর রাসূল

সাঃ সাহাবীগণকে বললেন যে, তিনি ওমরা পালন করবেন আর এরই প্রেক্ষিতে সাহাবীগণ সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন।

মক্কার পথে মুসলিম বাহিনীঃ

রাসূল সাঃ তার সাথে মক্কা যাওয়ার জন্য মদিনা এবং মদিনার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিমদের মাঝে ঘোষণা করে দিলেন। ষষ্ঠ হিজরীর ১লা যিলক্বদ মাসে তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। তার সাথে ছিলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাঃ এবং ছিলেন ১৪০০ মতান্তরে ১৫০০ জন সাহাবী।

রাসূল সাঃ এবং সাহাবীগণ জুলহুলাইফা পৌঁছে কুরবানীর পশুকে হার পরালেন। উটের পিঠের উঁচু জায়গা কেটে চিহ্নিত করলেন এবং উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন। খুযাআ গোত্রের এক গোয়েন্দা ফিরে এসে খবর দিল যে কা'ব ইবনে লুয়াইক মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার মিত্রপক্ষদের লোকসংগ্রহের চেষ্টা করছে এবং তারা মুসলিম বাহিনীকে আল্লাহর ঘরে যাওয়া থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছে।

সাহাবীদের সাথে পরামর্শঃ

এই সংবাদ পাওয়ার পর রাসূল সাঃ সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চাইলেন যে, এই অবস্থায় কি তাদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত হবে নাকি যুদ্ধ পরিহার করাই উত্তম হবে। সিদ্ধান্ত হলো তারা মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকবেন এবং যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা আসে তবেই কেবল যুদ্ধ করবেন অন্যথায় করবেন না। রাসূল সাঃ এর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর যাত্রা শুরু করলেন।

কুরাইশরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যেকোন মূল্যে মুসলিমদেরকে মক্কায় প্রবেশ থেকে বিরত রাখতে হবে। এজন্য খালিদ বিন ওয়ালিদ দুইশ সওয়ারের এক নিয়ে কুরাউল গামীম নামক স্থানে প্রস্তুত হয়ে যায়। খালিদ বিন ওয়ালিদ সিদ্ধান্ত নিলেন আসরের সালাতের সময় মুসলিমরা যখন রুকু সিজদায় যাবে তখন তাদের উপর তিনি আক্রমণ চালাবে। কিন্তু আল্লাহ ঠিক সেই সময়ই সালাতুল খাওফের আয়াত নাযিল করেন ফলে খালিদ আর সুযোগ লাভ করতে পারলেন না।

রাসূল সাঃ যুদ্ধ পরিহার করার জন্য কুরাউল গামিমের প্রধান পথ পরিহার করে ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে হতে এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী হুদায়বিয়া নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছে।

এরপর রাসূল সাঃ বললেন ঐ সত্তার শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, ওরা এমন কোন বিষয়ের দাবি না করলে যার মধ্যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুর সম্মান প্রদর্শিত হয় তবে আমি অবশ্যই তা স্বীকার করে নিব।

বুদাইল বিন ওয়ারাকার মধ্যস্থতাঃ

বুদাইল বিন ওয়ারাকা তার গোত্র খুযায়ার লোকজনকে নিয়ে রাসূল সাঃ এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তারা ছিলো মুসলিমদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তারা বলল, 'আমি কা'ব ইবনে লুওয়াইকে দেখেছি যে সে হুদায়বিয়ার পর্যাপ্ত পানির কাছে শিবির স্থাপন করেছে। তাদের সাথে শিশু এবং মহিলাগণ রয়েছে। আপনার সাথে যুদ্ধ করা এবং আল্লাহর ঘর হতে আপনাদেরকে দূরে রাখার ব্যাপারে তারা বদ্ধপরিকর। রাসূল সাঃ বললেন, "কারো সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমরা এখানে আসিনি। অন্যথায় তারা যদি যুদ্ধ চায় তাহলে তাদের ঔদ্ধত্য জনিত কৃতকার্যের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

রাসূল সাঃ এর এই কথা বুবাইল কুরাইশদের মাঝে গিয়ে বর্ণনা করলো।

এমন সময় উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফি বলল, মুহাম্মাদ তোমাদের নিকট একটি ভালো প্রস্তাব দিয়েছে। তোমরা তার প্রস্তাব গ্রহণ করে নাও এবং আমাকে তাদের নিকট পাঠাও।

এরপর উরওয়া রাসূল সাঃ এর সাথে সাহাবীদের অনবদ্য সম্পর্ক এবং আন্তরিকতার দৃশ্য দেখতে থাকলো। সে কুরাইশদের নিকট ফিরে এসে বলল, " আল্লাহর কসম, আমি কোন সম্রাটকে দেখিনি যে তাঁর অনুসারীগণ তার এত সম্মান করছে, মুহাম্মদকে তার সাহাবীগণ যত বেশি সম্মান করছে। করেন। তিনি তোমাদের জন্যে একটি উত্তম প্রস্তাব দিয়েছেন, তোমাদের উচিত তা গ্রহণ করে নেওয়া"।

এ সময় রাসূল সাঃ মুসলিমদের পক্ষ থেকেও একজন প্রতিনিধি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এরপর রাসূল সাঃ উসমান রাঃ কে কুরাইশদের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, যুদ্ধ করার জন্য আমরা আসিনি। আমি এসেছি উমরা পালনের জন্য। । হযরত উসমান রাঃ রাসূল সাঃ এর পয়গাম নিয়ে রওয়ানা হলেন। তখন সাঈদ ইবনে আস উঠে এসে উসমানকে অভ্যর্থনা জানালেন, এবং মক্কায় নিজ বাসস্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে কুরাইশ ব্যক্তিবর্গের সামনে উপস্থিত হয়ে উসমান কুরাইশদের রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বার্তা পৌঁছে দিয়ে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করলেন।

উসমান রাঃ এর মাধ্যমে রাসূল সাঃ এর প্রস্তাব পাওয়ার পর কুরাইশগণ বিষয়টি নিয়ে আরো অধিক শলাপরামর্শ করে তারা উসমান রাঃ এর মাধ্যমে একটি উপযুক্ত জবাব পাঠানোর চিন্তা করলেন। এজন্য তড়িঘড়ি না করে উসমানের প্রত্যাবর্তনকে বিলম্বিত করতে চেয়েছিলেন যেন এই সময়ে তারা নিজেরা একটি সুস্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। কিন্তু উসমানের প্রত্যাবর্তনে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ায় মুসলিমদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ে উসমানকে হত্যা করা হয়েছে। যখন রাসূল সাঃ এর কাছে সংবাদ পৌঁছায় তখন তিনি বললেন, "যুদ্ধের মাধ্যমে যতক্ষণ একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হচ্ছে ততক্ষণ আমি এই জায়গা থেকে ফিরে যাব না" এরপর রাসূল সাঃ সাহাবীগণকে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন। তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবেন না। সর্বপ্রথম রাসূল সাঃ নিজের হাত অন্যহাতে ধরে বললেন, এ হচ্ছে উসমানের হাত। ইতোমধ্যে যখন বায়াত গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়ে গেল তখন উসমান রাঃ ফিরে আসলেন এবং তিনিও অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। এই অঙ্গীকার পর্বে জুদ বিন কায়েস অংশগ্রহণ করেনি, সে ছিল মুনাফিক।

এই অঙ্গীকারের নাম হচ্ছে "বাইয়াতে রিদওয়ান"। এই বায়াত সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

অর্থঃ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (**সূরা ফাতহ, ৪৮:১৮)**

হুদাইবিয়ার সন্ধির দফাসমূহ

সুহাইল রাসূল সাঃ এর কাছে এসে দীর্ঘসময় আলোচনা করলেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিসমূহ নির্দিষ্ট করা হলো। এই চুক্তির দফাগুলো হচ্ছে-

১। রাসূল সাঃ এবছর মক্কায় প্রবেশ না করে সাহাবীগণকে নিয়ে মদিনায় ফিরে যাবেন। মুসলিমগণ আগামী বছর মক্কায় আসবেন এবং তিন দিন অবস্থান করবেন। তাদের সাথে সফরের প্রয়োজনীয় অস্ত্র থাকবে এবং তরবারি কোষবদ্ধ থাকবে। তাদের আগমনে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না।

২। দশ বছর পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

৩। যেসকল গোত্র কিংবা জনগোষ্ঠী মুহাম্মদের অংশে প্রবেশ করতে চায়, সে প্রবেশ করতে পারবে। যে গোত্র যে দলে অংশগ্রহণ করবে তাকে সেই দলের অংশ মনে করা হবে।

৪। কুরাইশদের কোন লোক অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া পালিয়ে গিয়ে মুহাম্মদের দলে যোগদান করলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে। কিন্তু মুহাম্মদের আওতাভুক্ত কোন লোক আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে পালিয়ে গিয়ে কুরাইশদের নিকটে গেলে কুরাইশগণ তাকে ফেরত দেবে না।

আবু জান্দাল এর প্রত্যাবর্তনঃ

সন্ধি চুক্ত চলাকালে আবু জাদ্দাল শিকল পরিহিত অবস্থায় এসে সেখানে উপস্থিত হল। তার অবস্থা দেখে সুহাইল বলল, এই আবু জান্দাল হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যার সম্পর্কে আপনার সঙ্গে মতবিনিময় করেছি যে, আপনি তাকে ফেরত দেবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমরা কুরাইশদের সাথে সন্ধি করেছি এবং পরস্পর আল্লাহর নামে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি। এ কারণে আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারি না"।

সন্ধি চুক্তি কার্যকর হয়ে গেল। আবু জান্দালকে তার পিতা ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

উম্মে সালামা রাঃ এর হিকমাহঃ

সন্ধি চুক্তি সম্পাদন হয়ে যাওয়ার পর রাসূল সাঃ সাহাবীগণকে কুরবানী করার আদেশ দিলেন। তিনি তিনবার একই আদেশের পুনরাবৃত্তি করলেন কিন্তু সাহাবাদের মাঝে কোন আগ্রহ দেখা গেল না। বিষয়টি তিনি তার স্ত্রী উম্মে সালামা রাঃ কে জানালে তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি চান যে সকলেই নিজ নিজ পশু কুরবানি করে মাথা মুন্ডন করুক তাহলে আর কাউকে কিছু না বলে নিজ পশু জবাই করুন এবং নাপিতকে ডেকে নিয়ে নিজের মাথা মুন্ডন করে নিন"। এরপর রাসূল সাঃ তার স্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন। তাকে দেখে সাহাবীগণ সাথে সাথে নিজেদের পশু জবাই করলেন এবং একে অন্যের মাথা মুন্ডন করে নিলেন। সে সময়ের প্রতি সাতজনের জন্য একটি গরু এবং একটি

উট জবাই করা হয়। এরপর রাসূল সাঃ মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং চুল কর্তনকারীদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

মুহাজির মহিলাদের ফেরত দিতে অস্বীকৃতিঃ

কিছুসংখ্যক মহিলা মুহাজির মুসলিমদের মাঝে আগমন করলেন। তাদের মুশরিক অভিভাবকেরা দাবি করল যে, হুদায়বিয়ার চুক্তি অনুযায়ী তাদেরকে মুশরিকদের মাঝে ফেরত দেয়া হোক। কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাদের দাবি প্রত্যাখান করে বললেন, সন্ধিচুক্তিতে পুরুষ ব্যক্তিদের ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে লেখা হয়েছিল। মহিলাদের ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে চুক্তিতে কিছু বলা হয়নি। তখন আল্লাহ তাআলা

(সূরা মুমতাহিনা, ৬০:১০) আয়াত নাযিল করলেন-

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখন কোন মহিলা হিজরত করেন তখন আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে এই আয়াতের আলোকে তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। এইসকল মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহ **(সূরা মুমতাহিনা, ৬০:১২)** আয়াত নাযিল করেন।

এই আয়াতের প্রেক্ষিতে, যে সকল মহিলাগণ এই আয়াতে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করবে বলে অঙ্গীকার করবে, আল্লাহর রাসূল তাদের বায়াত গ্রহণ করতেন।

মুসলিমগণের বিষন্নতা

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দুটি কারণে সাহাবীগণ প্রচন্ডরকম বিষণ্নতার কারণে মানসিকভাবে একেবারেই তারা ভেঙে পড়েন।

কারণ দুটি হচ্ছে-

অল্লাহর রাসূল তাদেরকে বলেছিলেন, তিনি কাবাঘরের নিকট আগমন করবেন এবং তাওয়াফ করবেন। কিন্তু পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাওয়াফ না করেই তিনি মদিনা ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরাইশদের চাপে পড়ে হুদায়বিয়ার সন্ধির দুটি শর্ত নানা সন্দেহ সংশয়ের জন্ম দিচ্ছিল।

এরপর আল্লাহ সূরা আল ফাতহ এর ১ নং আয়াত নাযিল করেন, যার মাঝে সুস্পষ্ট বিজয়ের কথা ঘোষণা দেয়া হয়েছে-

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

অর্থঃ নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট। **(সূরা ফাতহ, ৪৮:১)**

হুদায়বিয়ার সন্ধিকে যে কারণে সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয়েছেঃ

১। হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রথম শর্তটি আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য অপমানকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল মুসলিমদের সাফল্যেরই প্রতীক।

২। সন্ধির দ্বিতীয় দফাও প্রকাশ্য বিজয়েরই অংশ কারণ, মুশরিকগণ বারংবার মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। প্রতিবার যুদ্ধ আরম্ভ করার ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল।

মুশরিকগণ নিজেরাই মুসলিমদের সাথে দশ বছর ব্যাপী যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি করে পিছু হটলো।

৩। তৃতীয় দফা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ধর্মীয় ব্যাপারে কুরাইশদের যে নেতৃত্ব এবং শীর্ষস্থান ছিল তা যেন তারা ভুলেই গিয়েছিল।

৪। এই সন্ধির চতুর্থ দফা এই ধারাটি আপাতভাবে অপমানজনক মনে হলেও বাস্তবতা তো এটাই যে, মুসলিমদের মধ্যে একমাত্র মুরতাদ এবং মুনাফিক ব্যতীত আর কেউই আল্লাহর রাসূল এবং সাহাবীদের সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাফির-মুশরিকদের সমাজে কুরাইশদের মাঝে আশ্রয় নিতে চাইবে না।

বিশিষ্ট কুরাইশ নেতাদের ইসলাম গ্রহণঃ

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর সপ্তম হিজরীর প্রথমদিকে আমর বিন আল আস, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং উসমান বিন তালহা রাঃ ইসলাম গ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নবীজির চিঠি

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর আল্লাহর রাসূল সাঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাদের নিকট পত্র পাঠাতে শুরু করেন। রাসূল সাঃ জানতে পারলেন, বাদশাহগণ সেই অবস্থায় পত্র গ্রহণ করেন যখন তার উপরে সিলমোহর অঙ্কিত থাকে। এজন্য রাসূল সাঃ একটি রুপার আংটি তৈরি করে নিলেন, যার উপরে মুদ্রিত ছিল মুহাম্মদ, রাসূল ও আল্লাহ। এরপর বিচক্ষণ, সুশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাহাবীগণকে কূটনৈতিক বার্তাবাহক মনোনীত করে তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্রাটদের কাছে পত্র পাঠাতে শুরু করলেন।

হাবশার সম্রাট নাজাশির কাছে পত্র

মিশরের সম্রাট মুকাওকিস এর নামে পত্র

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট পত্র

রোমান সম্রাট কায়সারের নিকট পত্র

মুনযির বিন সাভীর নিকট পত্র

ইয়ামামার গভর্নর হাওযাহ বিন আলীর নিকট পত্র

আম্মানের সম্রাটের কাছে পত্র

খাইবারের যুদ্ধঃ কারণ, যুদ্ধের ঘটনাবলী ও ফলাফল

খাইবার যুদ্ধের কারণঃ

১। খাইবার ছিল ষড়যন্ত্রকারী ও কোন্দলকারীদের আড্ডা, দাবানল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। তাই মদিনার স্থায়ী শান্ত প্রতিষ্ঠায় সবার আগে মুসলিমদের এই দিকে মনোযোগ দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

২। খাইবারের অধিবাসীরা খন্দক যুদ্ধে সব মুশরিক শক্তিগুলোকে একত্রিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য এবং উৎসাহিত করেছিল।

৩। খাইবার মুসলিমদের জন্য হুমকির কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় রাসূল (সাঃ) ইহুদিদের একটা চূড়ান্ত শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

খায়বারের পথে যাত্রার ঘোষণাঃ

হুদাইবিয়ার থেকে ফেরার পর যিলহজ্জ মাসের পুরোটা এবং মুহাররম মাসের কয়েকদিন রাসূল সাঃ মদিনায় অবস্থান করেন। এরপর মুহাররম মাসের শেষ ভাগে তিনি খাইবার অভিমুখে যাত্রা করেন। খাইবারের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাঃকে যে ওয়াদা করেছিলেন তা **(সূরা আল ফাতহ, ৪৮:২০**) আয়াতে উল্লেখ আছে

তারা সংখ্যায় ছিলেন মাত্র ১৪০০ জন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর ষড়যন্ত্রঃ

রাসূল সাঃ যখন খাইবার অভিযানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই খাইবারের ইহুদিদের নিকটে রাসূল সাঃ এর এই অভিযানের সংবাদ পাঠায় এবং তাদেরকে উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করে নির্ভয় থাকতে বলে। সে ইহুদীদেরকে জানায় মুসলিম বাহিনীর অভিযানে তার মুনাফিক বাহিনী সর্বাত্মকভাবে খাইবারের ইহুদিদের সহায়তা করবে।

খাইবারের পথে মুসলিম বাহিনীঃ

রাসূল সাঃ এর ইচ্ছা ছিল সাধারণ পথে না গিয়ে ভিন্ন পথ দিয়ে খাইবারে প্রবেশ করা। তিনি চেয়েছিলেন মদিনার পরিবর্তে উত্তর দিক দিয়ে সিরিয়ার পথ ধরে খাইবারে প্রবেশ করতে যাতে শাম রাজ্যের দিকে ইহুদিদের পালানোর পথরোধ করা যায় এবং বনু গাতফান থেকে ইহুদিদের সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করে দেয়া যায়।

রাসূল সাঃ এর অভিজ্ঞ রাহবার সেই পথেই রাসূলকে নিয়ে চললেন। এক পর্যায়ে এসে তিনি দেখলেন সেখান থেকে একাধিক পথ বের হয়ে গেছে।

মারহাব নামক পথ দিয়ে রাসূল (সাঃ) যাওয়াটাই পছন্দ করলেন।

খাইবার অভিমুখে পথিমধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনা

আমি বিন আকওয়া (রাঃ) একজন কবি ছিলেন। তিনি বাহন থেকে অবতরণ করে নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা করে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। রাসূল সাঃ জিজ্ঞেস করলেন, "এই কবিতা আবৃত্তিকারী কে?" লোকেরা বলল, আমির বিন আকওয়া। আল্লাহর রাসূল বললেন,

"আল্লাহ তার উপর রহম করুন"। তখন তার গোত্রের একজন বলল, 'এখন তো আমিরের শাহাদাত অনিবার্য হয়ে গেল।

খাইবারের দুর্গ সমূহঃ

খাইবারের জনবসতি ২ অঞ্চলে বিভক্ত ছিল-

১। নাতাত্ব ও শাক অঞ্চল

২। কাতিবাহ অঞ্চল

নাতাত্ব অঞ্চলে ছিল ৩ টি দুর্গ-

১। নাঈম দুর্গ

২। সা'ব বিন মুয়াজ দুর্গ ৩। যুবাইর দুর্গ

শারু অঞ্চলে ছিল ২ টি দুর্গ-

৪। উবাই দুর্গ

৫। নিযার দুর্গ

কাতিবাহ অঞ্চলে ছিল ৩টি দুর্গ-

১। কামুস দুর্গ

২। ওয়াতীহ দুর্গ

৩। সুলালিম দুর্গ

খাইবারের যুদ্ধ প্রথম অঞ্চলের দুর্গগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় অঞ্চলের দুর্গগুলিতে যোদ্ধাদের সংখ্যা অধিক থাকা সত্ত্বেও কোনরকম যুদ্ধ ছাড়াই তারা সেগুলো মুসলিমদের হাতে তুলে দিয়েছিল।

আল্লাহর রাসূল আলী রাদিয়াল্লাহু এর হাতে যুদ্ধের পতাকা দিলেন। খাইবার যুদ্ধে যেসব দূর্গ বিজয় হয়েছিল সেগুলো নিম্নে দেওয়া হল ঃ

নাঈম দুর্গ বিজয়

সা'ব বিন মুয়াজ দুর্গ জয়

যুবাইর দুর্গ জয়

উবাই দুর্গ জয়

নিজার দুর্গ জয়

খাইবারের দ্বিতীয় অর্ধেক বিজয়

সন্ধির প্রস্তাবনা

আবুল হুকাইক সর্বপ্রথম রাসূল সাঃ এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। রাসূল সাঃ এর পক্ষ থেকে হ্যাঁ বোধক উত্তর লাভের পর তিনি এই শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি করলেন যে-

* দুর্গের মধ্যে যে সকল সৈন্য অবস্থান করছে তাদের জীবন রক্ষা করতে হবে এবং তাদের পরিবারবর্গকে তাদের সাথে থাকতে দিতে হবে।

* পরিবার-পরিজনসহ তাদের খাইবার জমিন ছেড়ে বাইরে যেতে দিতে হবে।

* তাদের সম্পদ, বাগবাগিচা, সোনাদানা, ঘোড়া, লৌহবর্ম রাসূল সাঃ এর নিকট সমর্পণ করবে।

সন্দীর শর্ত ভঙ্গ করার জন্য আবুল হুকাইকের দুই ছেলেকে হত্যা করা হয়।

নির্দিষ্ট কিছু শর্তে ইহুদীগণ খায়বারে থেকে গেল

গনিমতের মাল বন্টনঃ

প্রাপ্ত গনিমতের মাল ৩৬ অংশে ভাগ করা হয়। এর প্রতি অংশ পুনরায় ১০০ অংশে বিভক্ত করা হয়। এভাবে মোট সম্পদ ৩৬০০ ভাগ করা হয়। ৩৬০০ অংশের মধ্যে ১৮০০ অংশ ছিল রাসূল সাঃ এবং সাহাবীদের। সাধারণ মুসলিমদের মত রাসূল সাঃ-ও একটি অংশ গ্রহণ

করতেন। অবশিষ্ট ১৮০০ অংশ রাসূল সাঃ মুসলিমদের সামাজিক প্রয়োজন এবং বিপদকালীন সময়ের জন্য পৃথক করে রাখেন।

বুখারী শরীফে ইবনে ওমর রাঃ এর এক হাদীস থেকে খাইবারের গনিমতের প্রাচুর্যের কথা আন্দাজ করা যায়। খাইবার থেকে এত বিপুল পরিমাণ গনিমত লাভ করেছিলেন যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, "যে পর্যন্ত না খাইবার বিজয় করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম সেই পর্যন্ত আমরা খাওয়ায় পরিতৃপ্ত হতে পারেনি"।

আবু হুরাইরা রাঃ যখন রাসুল সাঃ এর কাছে উপস্থিত হয় তখন খাইবারের বিজয় সমাপ্ত হয়েছে। রাসূল সাঃ সাহাবাদের সাথে আলোচনা করে আবু হুরায়রা রাঃ এবং তার সঙ্গীদেরকেও গনিমতের অংশ প্রদান করেন।

জাফর বিন আবি তালিব এবং আবিসিনিয়ায় মুহাজির সাহাবীদের প্রত্যাবর্তন

জাফর রাঃ যখন রাসূলের কাছে উপস্থিত হলেন তখন রাসূল সাঃ তার কপালে চুম্বন করে বললেন, "অল্লাহর কসম, আজ আমি অধিক আনন্দিত। আমি জানিনা এ আনন্দ খাইবার বিজয়ের জন্য নাকি জাফরের আগমনের জন্য"।

খাইবার যুদ্ধঃ কিছু টুকরো ঘটনা, খায়বার পরবর্তী সামরিক অভিযানসমূহ এবং কাযা উমরাহ্ পালন

সাফিয়া রাঃ এর সাথে বিবাহঃ

হযরত সাফিয়ার স্বামী কিনানা বিনা আবুল হুকাইক অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে মুসলিমদের হাতে নিহত হয়েছিল। এরপর তার স্ত্রী সাফিয়াকে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।এরপর রাসুল সাঃ তাকে বিবাহ করেন।

আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ এর সারা রাত জেগে পাহারা দেওয়ার ঘটনাঃ

যেই রাতে রাসূলুল্লাহ সাঃ সাফিয়ার সাথে বাসর রাত্রিযাপন করলেন সেই রাতে আবু আইয়ুব আনসারী সারারাত তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে থেকে এই দম্পতিকে পাহারা দেন। সকালে উঠে রাসুল সাঃ আবু আইয়ুব রাঃ কে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন- তার এখানে অবস্থানের কারণ কী। আবু আইয়ুব রাঃ বললেন, "আমি এই মহিলাকে নিয়ে আপনার জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করছিলাম। আমি আশঙ্কা করছিলাম যদি প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে তিনি আপনার কোন ক্ষতি করতে চান! তাই আমি আপনাকে সারা রাত পাহারা দিয়েছি"।

বিষাক্ত বকরির গোশত পরিবেশনের ঘটনাঃ

খাইবার বিজয়ের পর যখন রাসুল সাঃ ইহুদিদের কুটকৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে গেলেন তখন সাল্লাম বিন মিশকামের স্ত্রী যয়নাব বিনতে হারিস উপঢৌকন হিসেবে বকরির ভুনা

গোশত রাসূল সাঃ এর নিকট পাঠায়। রাসুল সাঃ নিজের পছন্দের অংশ উঠিয়ে তার কিছু অংশ চিবানোর পর মুখ থেকে বের করে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "এই হাড্ডি আমাকে বলছে যে, এর সাথে বিষ মাখানো হয়েছে। রাসূল সাঃ যখন সেই মহিলাকে এর বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন তখন সে বিষ প্রয়োগের কথা স্বীকার করে বলল, 'আমি চিন্তা করলাম যদি আপনি বাদশা হন তাহলে আপনার কাছ থেকে আমরা মুক্তি পাব আর যদি নবী হন তাহলে বিষ মেশানোর সংবাদ আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং আপনি বেঁচে যাবেন'। এ কথা শুনে রাসূল সাঃ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু এ সময় রাসূলের সাহাবী হযরত বিশর বিন বারা বিন মারূর এর বিষক্রিয়ায় ফলে তার মৃত্যু হয়। তাঁর কিসাস হিসেবে এই মহিলাকে হত্যা করা হয়।

খায়বার পরবর্তী কতিপয় সামরিক অভিযান

ফাদাক অভিযান

ওয়াদিল কুরা অভিযান

তাইমা অভিযান

মদিনা প্রত্যাবর্তনঃ

তাইমার ইহুদীদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের পর রাসূল সাঃ মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ফিরে আসার সময় লোকেরা একটি উপত্যকার নিকট পৌঁছে সকলে উচ্চস্বরে "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলতে থাকেন। এ কথা শুনে রাসূল সাঃ বললেন, "নিজ আত্মার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করো। তোমরা কোন বধির কিংবা অনুপস্থিতে স্বত্ত্বাকে ডাকছো না বরং তাকে ডাকছো যিনি শুনছেন এবং নিকটেই রয়েছেন"।

খাইবার অভিযান শেষে রাসূল সাঃ সফর মাসের শেষ ভাগে কিংবা রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে মদিনায় ফিরে আসেন।

কাযা উমরাহ পালন

মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রাঃ

৭ম হিজরীর যুল ক্বাদাহ মাসের চাঁদ দেখা দেওয়ার পর রাসূল সাঃ সাহাবীদের মাঝে ঘোষণা করে দিলেন, প্রত্যেকে যেন বিগত বছরের কাজা উমরা আদায় করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রাসূল সাঃ এর নির্দেশ হিল হুদাইবিয়ায় যারা উপস্থিত ছিলেন তারা কেউই উমরা আদায় থেকে পিছিয়ে থাকবেন না। রাসূল সাঃ এর আদেশের প্রেক্ষিতে হুদাইবিয়ার পরের অভিযানসমূহের শহীদগণ ব্যতীত বাকি সকলেই যাত্রা করেন। হুদায়বিয়ায় ছিলেন না এমন কিছু অতিরিক্ত সাহাবিরাও উমরা আদায় করার উদ্দেশ্যে বের হন। মহিলা এবং শিশু ছাড়া সাহাবীদের উমরা পালনের উদ্দেশ্যে বহির্গত লোক সংখ্যা ছিল ২০০০।

কুরাইশগণ যখন খবর পেল যে মুসলিমগণ ২০০০ জনের বাহিনী নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় মক্কার দিকে আসছে তখন তারা মিকরায বিন হাফস কে প্রতিনিধি হিসেবে রাসূল সাঃ এর কাছে পাঠাল। মিকরায রাসূল সাঃ এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে হুদায়বিয়ার চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিল যে. মুসলিমদের নিরস্ত্র অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করার কথা ছিল। রাসূল সাঃ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন যে চুক্তি ভঙ্গ করা হবে না। মূলত কুরাইশদের অঙ্গীকার ভঙ্গের আশংকায় কাফেলার লোকজনদের সাথে অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধ সম্পর্কে পারদর্শী লোকদের সাথে নেওয়া হয়েছিল। ইয়াজুজ নামক উপত্যকায় পৌঁছার পর বর্ম, ঢাল, তরবারি, তীর রেখে জুলহুলাইফা পৌঁছে সাহাবীগণ ইহরাম বেধে নিলেন ও লাব্বাইক ধ্বনি দিতে লাগলেন।

মক্কায় প্রবেশ ও উমরাহ সম্পাদনঃ

মক্কায় প্রবেশের সময় রাসূল সাঃ তাঁর কাসওয়া নামক উটের পিঠে আরোহিত ছিলেন। মুসলিমগণ তলোয়ার কোষবদ্ধ অবস্থায় রেখেছিলেন এবং রাসূলকে সকলের মধ্যস্থলে রেখে লাব্বাইক ধ্বনি দিচ্ছিলেন। কাফেররা বলাবলি করছিল 'তোমাদের নিকট এমন একটি দল আসছে যারা ইয়াসরিবের জ্বরে কাবু হয়ে আছে অর্থাৎ মদিনার জ্বর যাদের একদম নষ্ট করে দিয়েছে'। একথা রাসূল সাঃ এর কানে গেলে রাসূল সাঃ সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন প্রথম তিনটি চক্কর যেন তারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে শেষ করেন। তবে রুকনে ইয়ামানী ও হায়রে আসওয়াদ এর মধ্যবর্তী স্থান স্বাভাবিক অবস্থায় অতিক্রম করবে। সাহাবীদের দৌড় পালন করার নির্দেশ শুধুমাত্র প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে দেননি বরং উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশরা যেন রাসূল এবং সাহাবীদের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে। এছাড়া সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাওয়াফের সময় কাঁধ খোলা রাখা এবং চাদরখানা ডান বগলের নীচ দিয়ে অতিক্রম করে সামনে- 'পিছনে উভয় দিক হতে দ্বিতীয় কোনটি বাম কাঁধের উপর নেওয়া। যাতে সাহাবীদের শারীরিক শক্তিমত্তা কুরাইশগণ দেখতে পারে।

রাসূল সাঃ একটানা 'লাব্বাইক' (তালবিয়া) উচ্চারণ করেছিলেন। এরপর হারামে শরীফে পৌঁছে তিনি ছড়ি দ্বারা হাযরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন এবং কাবা তাওয়াফ করলেন। মুসলিমগণ রাসূলের সাথে কাবা তাওয়াফ করলেন। রাসূল সাঃ এবং সাহাবীগণ দ্রুততমভাবে তাওয়াফ শেষ করলেন। তা দেখে মুশরিকগণ বলতে থাকলো, 'তোমরা যে ধারণা করেছ মুসলিমরা সকল শক্তি হারিয়ে ফেলেছে - তা সঠিক নয় বরং এরা সাধারণ লোকজন হতে অধিক শক্তিশালী'।

তাওয়াফ শেষ করে রাসূল সাঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করলেন। এ সময় রাসূল সাঃ এর কুরবানীর পশু মারওয়া পর্বতের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সা'ঈ শেষে তিনি বললেন, "এটা হচ্ছে কুরবানীর জায়গা এবং মক্কার সমস্ত জায়গাই তাই। এরপর সবাই মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে কুরবানীর পশুগুলোকে কুরবানী করেন। কুরবানির পর সেখানেই মাথা মুন্ডন করলেন। সাহাবীগণও তার অনুসরণ করলেন। এরপর কিছু সংখ্যক লোককে অস্ত্রশস্ত্রের হেফাযতের জন্যে ইয়াজুজে পাঠিয়ে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য ছিল, তারা সেখানে গিয়ে অস্ত্রগুলো তত্ত্বাবধান করবেন এবং যারা এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন তারা উমরা পালন করবেন।

রাসূল সাঃ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করলেন। চতুর্থ দিন সকালে মুশরিকগণ আলী রাঃ এর নিকট এসে বলল, "তোমাদের সঙ্গীরা যেন এখান থেকে চলে যান। কারণ, তিনদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে"। রাসূল সাঃ মক্কা থেকে বেরিয়ে এসে সারেফ নামক স্থানে অবতরণ করলেন।

জাফার রাঃ কে উমারা বিনতে হামযা এর অভিভাবকত্ব দানঃ

মক্কা থেকে বেরিয়ে আসার সময় রাসূল সাঃ এর পিছনে পিছনে হযরত হামজা রাঃ এর কন্যা উমারা বিনতে হামযাহ "চাচা, চাচা" বলতে বলতে বেরিয়ে আসল। আলী রাঃ তাকে কোলে তুলে নিলেন। এরপর তাকে লালন-পালন সম্পর্কে আলি রাঃ, হযরত জাফার রাঃ এবং হযরত যায়দ রাঃ এর মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকেই দাবি করছিল যে, তিনিই হামযা রাঃ এর কন্যাকে লালন পালনের জন্য অধিক হকদার। অবশেষে রাসূল সাঃ হযরত জাফরের অনুকূলে মীমাংসা করলেন। কারণ জাফরের স্ত্রী ছিলেন এই মেয়েটির খালা।

মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ এর সাথে রাসূল সাঃ এর বিবাহ ও মদীনায় ফেরাঃ

উমরা পালন কালে রাসূল সাঃ মাইমুনা বিনতে হারিস রাঃ কে বিবাহ করেন। এটি ছিল তাঁর সর্বশেষ বিবাহ।

এরপর মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে যিলহাজ্ব মাসে রাসূল সাঃ সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

এই উমরাকে কাযা উমরা বলার কারণঃ

১। এই উমরা ছিল হুদাইবিয়া সন্ধির সময় থেকে যাওয়া উমরা। তাই একে উমরায়ে কাযা বলা হয়।

২। হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই উমরা পালন করা হয়। এই ধরনের সন্ধিকে আরবিতে কাযা বা মুকাযাত বলা হয়।

সেখান থেকেই এই উমরাকে উমরায়ে কাযা বলা হয়।

উল্লেখ্য, এই উমরাহ ৪ টি নামে প্রসিদ্ধ- উমরায়ে কাষা, উমরায়ে কাযিয়্যা, উমরায়ে কিসাস, উমরায়ে সুলহ।

উমরাতুল কাযা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহঃ

১। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল আর আত্মরক্ষার পদক্ষেপ নেওয়া বিপরীতমুখী নয়।

২। প্রকৃত ঈমানদারের কাছে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা তার আপন পরিবারের প্রতি ভালোবাসার চাইতেও বড় হতে পারে। ইসলামের প্রতি এই ভালোবাসা থেকেই উমারা বিনতে হামযার মত ৬-৭ বছরের ছোট্ট শিশু পর্যন্ত নিজ পরিবার ছেড়ে মুসলিমদের সাথে মদীনায় থাকতে চেয়েছে।

৩। ইসলাম নারীদের কতটা সম্মান দিয়েছে তাও উমারা বিনতে হামজা এর প্রতিপালনের ব্যাপারে আলী রাঃ, যায়দ বিন হারিসা রাঃ এবং জাফার রাঃ এর প্রতিযোগীতা থেকে আন্দাজ করা যায়।

৪। কাফির মুশরিকদের সামনে মুসলিমগণ নিজেদের দুর্বলতা কিংবা হীনমন্যতা প্রকাশ করবে না, বরং নিজেদের শক্তিমত্তা ও সামর্থ্যের প্রকাশ করবে।

মুতাহর যুদ্ধঃ প্রেক্ষাপট, ফলাফল ও শিক্ষা,

মুতাহ যুদ্ধের কারণঃ

রাসূলুল্লাহ সাঃ হারিস বিন উমাইর আযদী রাঃ কে বুসরার শাসকের নিকটে দাওয়াতি চিঠি দিয়ে পাঠান। তৎকালীন রোম সম্রাটের গভর্নর শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানী রাসূল সাঃ এর দূতকে বন্দি করার পর শক্ত করে বেঁধে হত্যা করে। ওই সময়ে রাষ্ট্রদূত এবং সংবাদ বাহকদেরকে হত্যা করা ছিল একটি নিকৃষ্ট অপরাধ এবং যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। রাসূল সাঃ যখন জানতে পারলেন যে, তার পত্রবাহককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তখন তিনি তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন। ইতিপূর্বে খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধে মুসলিমদের এত বড় বাহিনী সমাবেত হয়নি।

রাসূল সাঃ এর ওসীয়তঃ

এই বিশাল সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় যায়েদ বিন হারিস রাঃ কে। রাসূল সাঃ প্রথমবারের মতো এই সেনাবাহিনীকে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ওসিয়ত করেন। তিনি বললেন যে, "যদি জায়েদকে শহীদ করা হয় তবে জাফর সেনাপতি হবে এবং জাফরকে শহীদ করা হলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাঃ সেনাপতি হবে। যদি আব্দুল্লাহ নিহত হয় তাহলে মুসলিমরা যাকে খুশি আমীর বানিয়ে নিবে"। এজন্য এই লড়াইকে গাযওয়া জাইশুল উমারা' বা 'আমীরদের বাহিনীর যুদ্ধ' বলা হয়।

সেনাদলের জন্য সাদা পতাকা বেঁধে তিনি জায়েদ বিন হারিসা রাঃ এর হাতে দিলেন। এরপর তিনি সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে যে উপদেশ দিলেন তা হচ্ছে-

"যে জায়গায় হারিস বিন উমায়ের রাঃ কে শহীদ করা হয়েছে সেখানে উপস্থিত হয়ে সেখানকার অধিবাসীদের নিকটে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সেটা হবে উত্তম অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে আল্লাহর সাথে কুফর কারীদের সাথে যুদ্ধ করো। সাবধান! অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আমানতের খেয়ানত করা, শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ এবং গির্জায় অবস্থানরত

পুরোহিতদের হত্যা করো না। খেজুর কিংবা অন্য কোনো বৃক্ষ কর্তন করো না এবং বাড়িঘর, দালানকোঠা বিনষ্ট করো না'।

মুসলিম বাহিনীর পরামর্শসভাঃ

মুসলিম বাহিনী মাআন নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করে। এই স্থানটি ছিল হিজাজের সন্নিকটে জর্ডানের আশেপাশে অবস্থিত। মুসলিম বাহিনীর গোয়েন্দা খবর নিয়ে আসে যে, রোমান কায়সার বালকা অঞ্চলের মায়াব স্থানে এক লক্ষ (১,০০,০০০) সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছে এবং শুরাহবিল বিন আমর গাসসানীর নেতৃত্বে অতিরিক্ত এক লাখ (১,০০,০০০) সৈন্য তাদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। মুসলিমদের এমন চিন্তা মোটেই ছিল না যে, যুদ্ধপ্রিয় এমন এক বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হতে হবে। তারা চিন্তা করতে শুরু করলেন যে দুই লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর সাথে মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে তারা মোকাবেলা করবেন কিনা।

কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাঃ বললেন- "আল্লাহর কসম, যে ব্যাপারটিকে আপনারা ভয় করছেন সেটি হচ্ছে সেই শাহাদাত, যার খোঁজে আপনারা বের হয়েছেন। কাজেই চলুন, আমরা এগিয়ে যাই।

অবশেষে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার এই প্রস্তাবের উপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল।

শত্রুদের উপর ইসলামী সৈন্যদলের আক্রমণঃ

ইসলামী সেনাবাহিনী মাআন নামক স্থানে দুই রাত অতিবাহিত করার পর বালকার মাশারিফ নামক জায়গার একটি বস্তিতে হিরাক্লিয়াসের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হন। এরপর শত্রুবাহিনী আরও নিকটবর্তী হলে মুসলিমগণ মুতাহর দিকে অগ্রসর হয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন।

এরপর মুসলিম বাহিনীর সাথে শত্রুদলের মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়।

রাসূল সাঃ এর পরমপ্রিয় হযরত জায়েদ বিন হারিসা যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে শত্রুপক্ষের শাহাদাতের পেয়ালা পান করে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর সেনাপতির দায়িত্ব নেন জাফর বিন আবী তালিব। একটা পর্যায়ে তাকে শহীদ করে দেয়া হলো।

এরপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাঃ পতাকা উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। শত্রুদের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একপর্যায়ে শহীদ হয়ে গেলেন।

ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি হলেন খালিদ বিন ওয়ালিদঃ

যখন একে একে তিনজন সেনাপতি শহীদ হয়ে গেলেন তখন বনু আজলান গোত্রের সাবিত বিন আরকাম নামক এক সাহাবী পতাকা উঁচিয়ে ধরে বললেন, 'হে মুসলিমগণ 'এ দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়'। এই প্রেক্ষিতে সাহাবীগণ খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ কে সেনাপতি মনোনীত করলেন।

মদীনায় রাসূল সাঃ এর কাছে সেনাপতিদের শাহাদাতের সংবাদঃ

মু'তাহ-র যুদ্ধ একমাত্র যুদ্ধ যেখানে রাসূল সাঃ কে মদীনায় বসেই সবকিছু দেখানো হয়েছিল।

খালিদ বিন ওয়ালিদ সেনাপতিত্বের দায়িত্ব নিলে তিনি বললেন, "এরপর আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্য থেকে একটি তলোয়ার পতাকা গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জয়যুক্ত করেছেন"।

এই ৩ জন বিশিষ্ট সাহাবী ও সেনাপতি শহীদ হওয়ার পর তাই দুঃখ-কষ্টে রাসূল সাঃ ৩ দিন পর্যন্ত মসজিদে ছিলেন, বাসায় থাকতে পারেন নি।

সম্মানের সাথে ফিরে আসল মুসলিম বাহিনীঃ

মুতাহর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকা থেকে সম্মানের সাথে বের করে আনার ব্যাপারে খালিদ বিন ওয়ালিদ যে রণ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন ইসলামের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মরু অঞ্চলের যুদ্ধের রণকৌশল সম্পর্কে তেমন কিছু জানতো না। এজন্য রোমান বাহিনী মুসলিমদেরকে নিজ অঞ্চলে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে তারাও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজ দেশের উদ্দেশ্যে ফিরে যায়। এভাবে মুসলিম বাহিনী নিরাপদে সম্মানের সাথে মদিনায় ফিরে আসে। কিন্তু মদীনায় প্রবেশের সময় লোকজন মুসলিম বাহিনীর দিকে মাটি নিক্ষেপ করে বলছিল, "হে পলাতক বাহিনী! তোমরা আল্লাহর আরস্তা থেকে পালিয়ে এসেছ। রাসুল সাঃ তাঁদের থামিয়ে বলেন, "তাঁরা পলাতক নয়; বরং তাঁরা পুনরায় আক্রমণকারী হিসেবে প্রমাণিত হবে ইনশা আল্লাহ"।"

মুতাহ যুদ্ধের বিশেষত্বঃ

১। এটাই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে রাসূল সাঃ সরাসরি অংশ না নিলেও এটিকে গাযওয়া বলা হয়।

২। এই যুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত দৃশ্য রাসূল সাঃ কে দেখানো হচ্ছিল এবং তিনি সাহাবীগণকে তা বর্ণনা করে শোনাচ্ছিলেন।

৩। একমাত্র এই যুদ্ধেই রাসূল সাঃ ৩ জন সেনাপতি নির্বাচন করেছিলেন।

মুতাহ যুদ্ধের শিক্ষাঃ

১। নেতৃত্ব কোন চেয়ে নেওয়ার বিষয় নয় বরং যে নেতৃত্ব চেয়ে নেয় ইসলাম তাকে নেতৃত্ব দিতে নিরুৎসাহিত করে।

২। আমরা জানি জিহাদ হতে পারে নিজের জীবন দিয়ে, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ দিয়ে অথবা জ্ঞান কিংবা মুখের কথা দিয়ে। এই হাদিসকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে অনেকে বর্তমান সময়ে স্বশরীরের জিহাদকে অস্বীকার করে বসে এবং বলে- 'বর্তমান সময়ে বিশ্বের কোথাও স্বশরীরে জিহাদ সম্ভব নয়'। তাদের যুক্তি হল তারা জ্ঞান কিংবা কথার জিহাদে ব্যস্ত রয়েছে কিন্তু এটি ঠিক নয়। সাহাবীদের মাঝে যারা আলেম ছিলেন অথবা ওই সময়ে মিডিয়াযোদ্ধা ছিলেন তারা জিয়াহদের ডাক শুনে মদিনায় বসে থাকতে পারতেন কিন্তু তা হয়নি।

৩। ইসলাম বিধবা কিংবা স্বামীহারা স্ত্রীদের বিবাহ করতে উৎসাহিত করে। মুতার যুদ্ধে জাফর রাঃ শহীদ হলে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাউস রাঃ কে আবু বকর রাঃ বিবাহ করেন। আবু বকরের ইন্তেকালের পর আলী রাঃ তাঁকে বিবাহ করেন। এভাবে আমরা দেখেছি যে, আসমা রাঃ রাসুলের অত্যন্ত প্রিয় এবং কাছের তিনজন সাহাবীর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

মক্কা বিজয়ঃ প্রেক্ষাপট ও অভিযান

অভিযানের কারণঃ

হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, কেউ যদি চায় তবে মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। আবার কেউ চাইলেই কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। এই শর্তে খুযায়া গোত্র মুসলিমদের সাথে এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মিত্রতা করে। বনু বকর এক পর্যায়ে এই চুক্তি লঙ্ঘন করে ফেলে। ৮ম হিজরীর শাবান মাসে বনু বকরের নওফেল ইবনে মুয়াবিয়া দিলি নামে এক ব্যক্তি কিছু মানুষ নিয়ে রাতের অন্ধকারে বনু খুযাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করে বসে।

আকস্মিক হামলায় বনু খুযায়া গোত্রের অনেক লোক নিহত হয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, কুরাইশরা সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে অস্ত্র দিয়ে বনু বকর গোত্রকে সাহায্য করে। এমনকি রাতের আধারে কুরাইশের যোদ্ধাগণ এই আক্রমণে অংশ নেয়।

এরপর 'আমর বিন সালিম খুযাঈ সেখান থেকে বের হয়ে তৎক্ষণাৎ মদীনার দিকে রওনা দেন।

সবকিছু শুনে রাসূল সাঃ বললেন, "হে আমর বিন সালিম, তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে"। এরপর রাসূল সাঃ আকাশের একটি মেঘমালার দেখে বললেন, "এই মেঘমালাতে বনু খুযা'আর সাহায্যের শুভসংবাদ চমকাচ্ছে"।

কুরাইশদের আতঙ্ক এবং আবু সুফিয়ানের মদীনায় আগমনঃ

যদিও কুরাইশগণ চুক্তি ভঙ্গ করে বনু বকরের পক্ষ নিয়ে আক্রমণ করেছিল কিন্তু তাদের মনে এই ভয় ঠিকই ঢুকে গিয়েছিল যে, মুসলিমরা নিশ্চয়ই এই অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে। মুসলিমদের প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কায় তারা একটি পরামর্শ বৈঠকের

আয়োজন করল এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিল যে, চুক্তির পুনরুজ্জীবনের জন্য আবু সুফিয়ানকে অনতিবিলম্বে মদিনায় পাঠানো হোক।

আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌঁছে নিজ কন্যা উম্মে হাবিবার ঘরে গেল। আবু সুফিয়ান বিছানায় বসতে গেলে উম্মে হাবীবা বিছানা উঠিয়ে নিয়ে বললেন, 'এটি হচ্ছে রাসূল সাঃ এর বিছানা। আর আপনি হচ্ছেন অপবিত্র, মুশরিক'।

এরপর আবু সুফিয়ান সেখান থেকে বের হয়ে রাসূল সাঃ এর নিকট গেল এবং কথাবার্তা বলল। কিন্তু রাসূল সাঃ তার কোনো কথার উত্তর দিলেন না। এরপরে আবু সুফিয়ান আবু বকর রাঃ, আলী রাঃ এর কাছে এর কাছে গেল। তারা সকলে বলল রাসূলের উপস্থিতিতে অন্য কেউ এই ঘোষণা দিতে পারবে না'।

এরপর আবু সুফিয়ানের সামনে যেন পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। এরপর আবু সুফিয়ান মসজিদে নববীর মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'হে জনগণ সকল, তোমাদের মাঝে আমি আশ্রয়ের ঘোষণা করছি'। অতঃপর সে উটের পিঠে আরোহন করে মক্কার দিকে রওনা হয়ে গেল।

এরপর সে যখন কুরাইশদের নিকট গিয়ে পৌঁছলো তখন তারা পিছনের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল। আবু সুফিয়ান বলল, 'আমি মুহাম্মদের নিকটে গিয়ে কথাবার্তা বললাম। কিন্তু আল্লাহর কসম তিনি কোনো উত্তর দেননি।

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতিঃ

অঙ্গীকার ভঙ্গের তিনদিন পূর্বেই রাসূল সাঃ আয়েশাকে সফরের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য গোপনে নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু এই খবর কেউ জানত না। আয়েশা রাঃ যখন প্রস্তুতি

নিচ্ছিলেন তখন আবু বকর রাঃ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'কিসের প্রস্তুতি? উত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি জানিনা'।

তখন রাসূল সাঃ প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'মক্কায় যেতে হবে'।

কুরাইশদের নিকটে হাতিব বিন আবী বালতাআ রাঃ এর পত্রঃ

এদিকে হাতিব বিন আবি বালতাআ রাঃ কুরাইশদের নিকট একটি পত্র লিখে পাঠালেন যে, রাসূল সাঃ মক্কা আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। বিনিময় প্রদানের প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে তিনি এক মহিলার মাধ্যমে পত্রটি পাঠালেন। মহিলাটি তার চুলের খোপার মধ্যে চিঠিটি লুকিয়ে মক্কার দিকে চলছিল। কিন্তু আল্লাহ তার প্রিয় রাসুলকে চিঠির ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন। এই প্রেক্ষিতে রাসূল সাঃ হযরত আলী রাঃ, যুবায়ের রাঃ, মিকদাদ রা:কে পাঠালেন চিঠি উদ্ধার করার জন্য। সাহাবিগণ রওজায়ে খাখ নামক স্থান থেকে চিঠিটি উদ্ধার করলেন। তারা পত্রখানি নিয়ে রাসূলের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন।

চিঠি পাওয়ার পর রাসূল সাঃ হাতিবকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন তুমি এমন গুরুতর কাজ করেছ?" তিনি বললেন,

"হে আল্লাহর রাসূল, আমার ব্যাপারে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং আমার পরিবারের সদস্য এবং সন্তানরা সেখানেই আছে। যদিও এটা সম্পূর্ণ বেআইনি, অধিকার বহির্ভূত। মাত্র ওই এক উদ্দেশ্যেই আমি কুরাইশদের জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। যার বিনিময়ে তারা আমার আত্মীয় স্বজনদের প্রতি যত্নশীল হবে"।

রাসূলুল্লাহ সাঃ সফর অব্যাহত রাখেন। এই সফরকালে রাসুলুল্লাহর সাহাবীগণ রোজাদার অবস্থায় ছিলেন। আসফান এবং কুদাইদ নামক জলাশয়ের নিকটে পৌঁছে রাসূল সাঃ এবং

সাহাবীগণ রোজা ভঙ্গ করে ফেললেন। এরপর আবার সফর অব্যাহত রাখেন। এভাবে রাত্রির পূর্বভাগ সফর করেন এবং মাররুয যাহরান উপত্যকায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে তার নির্দেশক্রমে লোকেরা পৃথক পৃথক আগুন জ্বালালো। এভাবে ১০,০০০ স্থানে আগুন জ্বালানো হয়। রাসূলুল্লাহ সাঃ হযরত উমার রাঃ কে পাহারার কাজে নিযুক্ত করলেন।

আবু সুফিয়ান বিন হারবের ইসলাম গ্রহণঃ

, আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম কবুল করলেন এবং সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। আব্বাস বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আবু সুফিয়ান সম্মানিত লোক, তাই তাকে সম্মান দান করুন। রাসূল সাঃ বললেন, "ঠিক আছে। যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে, যে নিজ ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে নেবে সে নিরাপদ থাকবে এবং যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ থাকবে"।

ইসলামী বাহিনীর মক্কায় প্রবেশের প্রস্তুতিঃ

৮ম হিজরীর ১৭ রমজান রাসুল সাঃ মাররুয যাহরান থেকে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। এরপর যখন মুহাজির ও আনসারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে আগমন করলেন তখন আবু সুফিয়ান বললেন, 'সুবহানাল্লাহ, এরা কারা?? হযরত আব্বাস বললেন, 'আনসার ও মুহাজির গণের জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থার মধ্যে দিয়ে রাসূল সাঃ আগমন করছেন'। আবু সুফিয়ান বললেন, 'এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা কারও আছে?'

আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদা রাঃ বহন করছিলেন।

আল্লাহর রাসূল বললেন, " আজকের দিন হবে সেই দিন যেদিন কাবাঘরের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শিত হবে। আজকের দিনে হবে সেদিন, যেদিন আল্লাহ তাদের সম্মান দান করবেন'। এরপর রাসূল সাঃ একজন সাহাবিকে পাঠিয়ে হযরত সা'দের নিকট থেকে পতাকা নিয়ে তার পুত্র কায়েসের হাতে দান করলেন। উদ্দেশ্যে ছিল, তাকে বুঝতে দেয়া যে পতাকা তার হাতেই রইল, তার থেকে বের হলো না।

রাসুল সাঃ যখন আবু সুফিয়ানের নিকট থেকে চলে গেলেন তখন আব্বাস রাঃ বললেন, 'আবু সুফিয়ান, শীঘ্রই মক্কায় ফিরে যাও'। আবু সুফিয়ান দ্রুত মক্কায় গিয়ে ঘোষণা দিলেন, "রাসূল সাঃ বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছেন যার মোকাবেলা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ"। মুহাম্মাদ এত বড় বাহিনী নিয়ে তোমাদের জন্য আগমন করেছেন যে, এর মোকাবিলা করার সাধ্য কারও নেই। লোকেরা বলল, 'আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক। তোমার বাড়িতে আমাদের কতজনের আশ্রয় হবে?? আবু সুফিয়ান বললেন, 'আরো কথা আছে, যারা ভেতর থেকে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে তারাও নিরাপদ হবে। যারা মসজিদুল হারামে গিয়ে প্রবেশ করবে তারাও নিরাপদ হবে'। একথা শুনে লোকেরা সকলেই নিজ নিজ ঘর, মসজিদুল হারামে পলায়ন করতে থাকলো। মুসলিমগনের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সকল মাস্তান ও উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা প্রস্তুত হলো।

মক্কায় প্রবেশের প্রাক্কালে সেনাবাহিনীর বিন্যাসঃ

অগ্রগমনের একপর্যায়ে রাসূল সাঃ এর বাহিনী মাররুজ জাহরান থেকে গিয়ে যি-তুওয়ায় পৌঁছলেন। রাসূল সাঃ তার সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বিন্যাস করলেন। ডানপাশের বাহিনীতে নিযুক্ত করলেন খালিদ বিন ওয়ালিদকে।

হযরত যুবাইর বিন আওয়ামকে বামদিকে রাখলেন। তার সাথে ছিল রাসূলের পতাকা।

পদাতিক সৈন্যদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবাইদা।

মক্কা বিজয়ঃ বিজয়, সাধারণ ক্ষমা ও কালো তালিকা

মসজিদুল হারামে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর প্রবেশ এবং মূর্তি অপসারণঃ

রাসূলুল্লাহ সাঃ তার সামনে ও পেছনে এবং ডানে ও বামে আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের পরিবেষ্টিত অবস্থায় অত্যন্ত জাকজমক অথচ বিনয়ের সাথে মসজিদুল হারামে আগমন করলেন। দিনটি ছিল ৮ম হিজরীর ২০ রমযান। মসজিদুল হারামে আগমনের পর সর্বপ্রথম তিনি হাযরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ অতিক্রমকালে সর্বদা তিনি তাঁর লাঠি ছড়ি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করছিলেন। ওই সময়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর হাতে একটি ধনুক ছিল। আল্লাহর ঘরের আশেপাশে ও ছাদের উপরে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। রাসূল সাঃ মূর্তিগুলোকে আঘাত করছিলেন। রাসূল সাঃ এর আঘাতে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে পড়ছিল। আঘাত করতে করতে তিনি বলছিলেন-

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

অর্থঃ সত্য এসেছে, বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হবেই"। **(সূরা ইসরা, ১৭:৮১) এবং**-

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

অর্থঃ বলুন, সত্য আগমন করেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পূনঃ প্রত্যাবর্তিত হতে। **(সূরা সাবা,৩৪:৪৯)**

তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর উসমান বিন তালহা রাঃ কে ডেকে নিয়ে তার কাছ থেকে কাবা ঘরের চাবি গ্রহণ করেন। এরপর রাসূল সাঃ এর নির্দেশক্রমে কাবা ঘর খোলা হয় এবং এরপর তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন। এরপর যমযমের পানি দিয়ে কাবার অভ্যন্তর পরিষ্কার করা হয়।

কাবা ঘরের ভিতরে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সালাত আদায়

" এরপর বললেন, "হে কুরাইশগণ, তোমাদের কী ধারনা, তোমাদের সঙ্গে আমি কীরূপ ব্যবহার করব বলে মনে করো?" সবাই বলল "খুব ভালো ব্যবহার করবেন।

কাবা ঘরের চাবি পেলেন উসমান বিন তালহাঃ

এরপর রাসূল সাঃ মসজিদুল হারামে বসে পড়লেন। হযরত আলী রাঃ এর হাতে কাবাঘরের চাবি ছিল। তিনি রাসূলের খিদমত উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের (বনু হাশিম) জন্য হাজীদের পানি পান করানোর সম্মানের সাথে কাবা ঘরের চাবি সংরক্ষণের সম্মানও দান করুন। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন'। রাসূল সাঃ বললেন, 'উসমান বিন

তালহা কোথায়?' তিনি ছিলেন বনু আব্দুদ দার গোত্রের। তাকে ডাকা হলে রাসূল সাঃ বললেন, "এই নাও চাবি। চাবি দেয়ার সময়ে রাসূল সাঃ আরও বলেছিলেন, "সর্বক্ষণের জন্যই তুমি এই চাবি গ্রহণ করো।

রাসূল সাঃ এর মদীনায় ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিঃ

রাসুল সাঃ তাওয়াফ শেষ করে সাফা পাহাড়ে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় বাইতুল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে দোয়া এবং আল্লাহর প্রশংসায় মগ্ন থাকলেন। সে সময় একজন আনসারী সাহাবী রাসূলকে বললেন, "আল্লাহ আপনার শহর ও মাতৃভূমির উপর আপনাকে বিজয় দান করেছেন। এমন যেন না হয় যে মদীনায় না গিয়ে আপনি মক্কায় থেকে গেলেন"। "হে আনসারগণ! তোমরা কি একথা বলেছ?" তারা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ আমরা বলেছি"। তিনি বললেন, "মনে রেখো- এরূপ কখনো হবে না। তোমাদের জীবন আমার জীবন, তোমাদের মৃত্যু আমার মৃত্যু"।

শোকরানা সালাতঃ

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাঃ উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব রাঃ এর ঘরে গেলেন। সেখানে তিনি গোসল করেন এবং তার ঘরে আট রাকাত সালাত আদায় করেন। এটি ছিল মক্কা বিজয় উপলক্ষে শোকরানা সালাত।

কাবা ঘরের ছাদে বিলাল রাঃ এর আযানঃ

সালাতের সময় হয়ে গেলে রাসুলুল্লাহ সাঃ বিলাল রাঃ কে নির্দেশ দিলেন কাবার ছাদে উঠে আযান দিতে।

পুরুষ ও নারীদের বাইয়াত গ্রহণঃ

রাসুল সাঃ সাফা পাহাড়ে উপবেশন করলেন এবং লোকজন বাইয়াত দেওয়ার জন্য সেখানে একত্রিত হল। রাসুল সাঃ ইসলাম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর লোকজনের থেকে বাইয়াত নিলেন। পুরুষদের নিকট থেকে শুধু ইসলাম ও সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর বাইয়াত নেওয়া হয়। পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পর রাসুল সাঃ মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করতে থাকেন।

বড় বড় অপরাধীদের কালো তালিকা প্রস্তুতকরনঃ

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাঃ বড় বড় অপরাধীদের মধ্যে থেকে নয়জন ব্যক্তির রক্ত মূল্যহীন সাব্যস্ত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, যদি তারা কাবা ঘরের পর্দা আঁকড়ে ধরে থাকে তবুও তাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা হচ্ছে-

১। আবদুল উযযা ইবনে খাতাল

২। মাকিস বিন সাবাবাহ

৩। হুয়াইরিস বিন নাকিস

৪,৫। ইবনে খাতালের দুই দাসী- ফারতানা ও আরনাব

৬। আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সারাহ

৭। ইকরামা বিন আবু জাহল

৮। হাব্বাব বিন আসওয়াদ

৯। সারাহ

আবদুল উযযা ইবনে খাতাল এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। রাসূল সাঃ তাকে সাদাকা আদায় করার জন্য এক স্থানে পাঠান। তার সাথে একজন গোলাম ও একজন আনসার ছিল। পথিমধ্যে এক স্থানে পৌঁছে সে ঐ গোলামকে খাবার তৈরি করার জন্য নির্দেশ দেয়। গোলাম খাবার তৈরি না করে ঘুমিয়ে পড়লে সে রাগের বশে সেই গোলামকে হত্যা করে। এরপর রাসূল সাঃ কর্তৃক কিসাসের ভয়ে সে মুরতাদ হয়ে মক্কায় পালিয়ে যায় এবং মুশরিকদের সাথে থেকে যায়। যাওয়ার সময় উট চুরি করে নিয়ে যায়। সে মক্কায় গিয়ে রাসুলের নামে কুৎসা রটনা করে কবিতা আবৃত্তি করত এবং বাদীদেরকে এই সমস্ত কবিতা দিয়ে গান গাওয়ার নির্দেশ দিত। সে তিনটি জঘন্য অপরাধ করেছিল-

১। অন্যায় ভাবে রক্তপাত করা

২। মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং

৩। রাসুলের নামে দুর্নাম ও কুৎসা রটনা করে কবিতা লেখা।

৩। রাসুলের নামে দুর্নাম ও কুৎসা রটনা করে কবিতা লেখা।

মাকিস বিন সাবাবাহ-র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হল

হুয়াইরিস বিন নাকিস এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হল

ইবনে খাতালের এক দাসী ক্ষমা লাভ ও ইসলাম গ্রহণ, আরেকজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হল

আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সারাহ-র ক্ষমা লাভ ও ইসলাম গ্রহণ

ইকরামা বিন আবি জাহলের ক্ষমা লাভ ও ইসলাম গ্রহণ

হাব্বাব বিন আসওয়াদের ইসলাম গ্রহণ

সারাহ-র ক্ষমা লাভ ও ইসলাম গ্রহণ

১। আবু মাশ'আর হারিস বিন জ্বালাতিল খুযায়ী। হযরত আলী রাঃ তাকে হত্যা করেন)

২। কা'ব বিন যুহাইর (ইমাম হাকিম তার নাম কালো তালিকায় উল্লেখ করেছেন। কা'বের ঘটনা প্রসিদ্ধ ছিল। পরে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলের প্রশংসা করেন)

৩। ওয়াহশী বিন হারব। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

কাব বিন জুহায়ের এর ইসলাম গ্রহণ ও ক্ষমা লাভ

ওয়াহশী বিন হারব এর ইসলাম গ্রহণ ও ক্ষমা লাভ

আব্দুল্লাহ ইবনে যিবআরা এর ইসলাম গ্রহণ ও ক্ষমা লাভ

হিরাত ইবনে আবু ওয়াহাব মাখযুমির পলাতক ও কাফির অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

হিন্দা বিনতে উতবা এর ইসলাম গ্রহণ ও ক্ষমা লাভ

কুরাইশ নেতাদের ইসলাম গ্রহণ, মূর্তি ভাঙতে প্রতিনিধি প্রেরণ ও মক্কা বিজয় থেকে শিক্ষা

সাফওয়ান বিন উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণ

সুহাইল বিন আমর এর ইসলাম গ্রহণ

লাহাবের পুত্র উতবা ও মাতাবের ইসলাম গ্রহণ

মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান এর ইসলাম গ্রহণ

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিনে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর ভাষণঃ

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন খুযাঈ গোত্রের এক লোক হুযাইল গোত্রের এক লোককে হত্যা করেন। এই সংবাদ রাসূল সাঃ এর কাছে এলে পুনরায় ভাষণ দেয়ার জন্য তিনি জনতার সম্মুখে আসলেন। ভাষণের প্রারম্ভে আল্লাহর প্রশংসা স্তুতি বর্ণনা করার পর তিনি বললেন,

"হে মানুষ, যেদিন আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন সেই দিন মক্কাকে হারাম ও সম্মানিত করেছেন। অতঃপর কেয়ামত পর্যন্ত তা হারাম ও সম্মানিত থাকবে। সুতরাং, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তার জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে মক্কায় রক্তপাত ঘটাবে। এখানে কোনো গাছ কাটা বৈধ নয়। আমার পূর্বে মক্কায় রক্তপাত করা কারো জন্য হালাল হয়নি। আমার পরও কারো জন্য তা হালাল হবে না। আমার জন্য শুধু একটিমাত্র মুহূর্তের জন্য রক্তপাত হালাল করা হয়েছে মক্কাবাসীদের নাফরমানি ও অবাধ্যতার কারণে। অতঃপর এর মর্য্যদা পূর্বের মতোই বলবৎ রয়েছে। সুতরাং, তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছ, তারা অনুপস্থিত লোকদের নিকট এ খবর পৌঁছে দেবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এটা বলে যে, 'রাসূল মক্কায় হত্যাকাণ্ড করেছেন'; তোমরা তাদেরকে এটা বলে দাও, আল্লাহ শুধু তার রাসূলের জন্য কিছু সময় মক্কাকে হালাল করেছিলেন। কিন্তু তোমাদের জন্য হালাল করেননি। হে খুযাআ গোত্রের লোকেরা, তোমরা হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকো। তোমরা বনু লাইসের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, আমি তার অর্থ পরিশোধ করব। এই দিনের পর যখন কেউ কাউকে হত্যা করবে তখন নিহত ব্যক্তির স্বজনদের দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের অধিকার থাকবে। হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীদেরকে একই ভাবে হত্যা করবে অথবা নিহত ব্যক্তির রক্তপণ গ্রহণ করবে"।

এরপর রাসূল সাঃ নিজের পক্ষ থেকে ১০০ উট ওই ব্যক্তির রক্তপণ হিসেবে আদায় করেন যাকে খুযায়া গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল। গাছ না কাটার আদেশ শুনে আব্বাস রাঃ ইযকির নামের একটি গাছ কাটার অনুমতি চাইলেন। এই গাছটিকে মৃতদের জন্য সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। রাসূল সাঃ কেবল এই একটি গাছ কাটার অনুমতি দেন।

রক্তপণ আদায় করে দেন। এই প্রেক্ষিতেই তিনি বলেছিলেন- "আল্লাহ শুধু তাঁর রাসূলের জন্য কিছু সময় মক্কাকে হালাল করেছিলেন"।

মক্কায় রাসূল সাঃ এর অবস্থান এবং গৃহীত কর্মপন্থাঃ

আল্লাহর রাসূল সাঃ ১৯ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে ইসলামের পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ায় তিনি তৎপর থাকেন এবং মানুষকে ক্রমাগত হিদায়াত ও তাকওয়ার আদেশ দিতে থাকেন। এই সময়ের মধ্যেই রাসূলের নির্দেশে আবু উসায়িদ খুযায়ি রাঃ নতুনভাবে হারামের সীমানায় দুটি স্তম্ভ খাড়া করেন। রাসূল সাঃ এ সময়ে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন ও মক্কার পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে কয়েকটি সারিয়্যা অর্থাৎ, ছোট সেনাদল প্রেরণ করেন। এভাবে সকল মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। এরপর রাসূল সাঃ এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণা করতে থাকেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে সে যেন নিজ গৃহে কোনো মূর্তি না রাখে। যদি ঘরে মূর্তি থাকে অবশ্যই তা ভেঙে ফেলতে হবে"।

মূর্তি ভাঙতে রাসূল সাঃ এর প্রতিনিধি দল প্রেরণঃ

৮ম হিজরীর ২৫ শে রমজান উযযা নামক মূর্তি বিনষ্ট করার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাঃ এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠানো হলো। উযযা মূর্তিটি ছিল নাখলায়। কুরাইশ ও সমগ্র বনু কিনানা গোত্র এ মূর্তির পূজা করতো। এটি ছিল তাদের সবচেয়ে বড় মূর্তি। হযরত খালিদ ত্রিশজন সওয়ারী সৈন্যসহ নাখলায় গিয়ে এটি ভেঙে ফেলেন।

এরপর রমজান মাসেই রাসূল সাঃ আমর ইবনুল আসকে সুওয়া নামক মূর্তি ভাঙার জন্য পাঠালেন। এই মূর্তিটি ছিল মক্কা থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। রেহাত নামক স্থানে বনু হুজাইল গোত্র এর পূজা করত। এরপর তিনি মূর্তির নিকটে গিয়ে তা ভেঙে ফেললেন এবং সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন, মূর্তিঘরও ভেঙে ফেলতে। কিন্তু সেখান থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। এরপর তিনি মন্দিরের প্রহরীকে বললেন, 'বলো, কেমন হল?' এই দৃশ্য দেখে প্রহরী বলে উঠলো, 'আমি আল্লাহর দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করলাম'।

৮ম হিজরীর ২৬ রমজান সাদ বিন জায়েদ আশহালীর নেতৃত্বে ২০ জন সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠানো হয়। তারা মানাত মূর্তি ধ্বংসের জন্য গেলেন। কুদাইদের কাছে মাশাল নামক স্থানে এর অবস্থান ছিল। গাসসান, আওস এবং খাযরায গোত্রের লোকেরা এর পূজা করত। সা'দ রাঃ একজন উলঙ্গ বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট মহিলাকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন। সে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে "হায় হায়" উচ্চারণ করছিল। তাকে লক্ষ্য করে পুরোহিত কালো, 'মানাত, তুমি এদের ধ্বংস করো'। কিন্তু এমন সময় হযরত সা'দ তাকে হত্যা করলেন। এরপর মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলেন।

মক্কা বিজয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাঃ

১। হাতিব রাঃ এর মক্কার নেতাদের কাছে রাসূল সাঃ এর মক্কা অভিযানের চিঠি পাঠানোর ঘটনাই প্রমাণ করে যে, মুমিনের অন্তরে যদি দুষিত ও বিষাক্ত উপকরণ না থাকে তাহলে বাহ্যিক ভুল ত্রুটি বা গুনাহর দ্বারা ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যায় না বরং তার আন্তরিক ঈমানী শক্তি তাকে শীঘ্রই তাওবা-ইস্তিগফার করতে উদ্বুদ্ধ করে।

২। একজন মানুষকে শুধুমাত্র একটি কাজের উপর বিচার করে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা যায় না বরং তার অতীতের চরিত্র এবং

পূর্বজীবনে তার কর্মকাণ্ড বিবেচনায় এনে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

৩। হাতিব রাঃ এর বিচার করতে গিয়ে রাসূল সাঃ একজন আদর্শ বিচারকের ভূমিকা দেখিয়ে দিয়েছেন। একজন আদর্শ বিচারক সর্বদাই দুই পক্ষের কথা শুনবে।

৪। যে কুরাইশরা এতদিন দাপটের সাথে এতগুলো যুদ্ধ করেছে, আঞ্চলিক শক্তি গুলোর সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে তারাও এক সময় মুসলিমদের অসীম ধৈর্যের কাছে হাল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

৫। ইসলাম ক্ষমা ও মহানুভবতার দ্বীন। ইসলামের শিক্ষা হল-ক্ষমা করার বিষয়টি নিজের দুর্বল কিংবা সবল অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণার্থেই ক্ষমা অথবা শাস্তির বিধান করতে হবে।

৬। কঠিন ও দুর্যোগের মুহূর্তে যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সবর করে আল্লাহ তাঁকে দুনিয়াতেই একসময় সম্মানিত করেন, আর আখিরাতের সম্মান ও পুরস্কারতো আছেই।

৭। আমলের প্রতিদান যেমন আমলের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল তেমনি ঈমান ও ইখলাসের উপরও নির্ভরশীল।

হুনাইনের যুদ্ধঃ প্রেক্ষাপট, প্রস্তুতি ও কিছু ঘটনা

হুনাইন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটঃ

মুসলিমদের আকস্মিক মক্কা অভিযানের ফলে আরবের বিভিন্ন গোত্রগুলি হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তারা মুসলিমদের এই অভিযানকে প্রতিহত করতে পারত না বিধায় মুসলিমদের নিকট নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ করেছিল। তবে বনু হাওয়াযিন এবং বনু সাকিফের মতো কিছু জেদি এবং অপরিণামদর্শী গোত্র ছিল যারা তখনও মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার

পাঁয়তারা করছিল। তারা মুসলিমদের কাছে পরাজয় স্বীকার করাকে অপমানজনক মনে করছিল। এই কারনেই মালিক বিন আউফ নাসরীর নেতৃত্বে প্রায় ২০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী একত্রিত হয়ে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। বনু সাকিফ ও বনু হাওয়াযিন আন্দাজ করছিল যে, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাঃ তায়েফ অভিমুখে জোরদার বিজয়ী অভিযান চালাবেন। কারণ, ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনায় সেটাই হত সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত। তাই মুসলিমদের আগেই তারা নিজেরাই মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করো

শত্রুপক্ষের প্রস্তুতিঃ

মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে মালিক বিন আউফ নাসরীর নেতৃত্বে তারা যাত্রা করল। তাদের যাবতীয় সম্পদ, গবাদিপশু, নারী এবং শিশু সন্তানদেরকেও তাদের সাথে নিয়েছিল। সামনে অগ্রসর হয়ে তারা আওতাস উপত্যকায় শিবির স্থাপন করল। এখানে অবতরণের পর লোকজনেরা তাদের নেতা মালিক ইবনে আউফের নিকট একত্রিত হলো। এদের মধ্যে প্রবীণ সমর বিশারদ দুরাইদ ইবনে সুম্মাও ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়স্ক এক ব্যক্তি। পরামর্শদান ছাড়া আর কোনো কাজই তিনি করতে পারতেন না। গোত্রের লোকেরা বলল, 'আমরা তোমার আনুগত্য করছি'। দুরাইদ বললো, 'তাহলে এমন যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ তো করবোই না বরং মনে করব যে, যুদ্ধ আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে'।

মক্কা থেকে হুনাইনের পথে মুসলিম বাহিনীর যাত্রাঃ

৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল রোববার রাসূল সাঃ মক্কা থেকে হুনাইনের পথে রওনা হলেন। এটি ছিল তার মক্কায় আসার ১৯ তম দিন। রাসূলের সাথে ছিল ১২ হাজার সৈন্য। এদের মধ্যে মদিনা থেকে মক্কায় এসেছিলেন ১০ হাজার আর মক্কার নও মুসলিমদের মাঝে থেকে আরও দুই হাজার সৈন্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

হুনাইন অভিযানে মুসলিমদের স্মরণকালের সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনী ছিল। তাই কিছু সাহাবী অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলতে লাগলেন, "সৈন্য সংখ্যার কমতির জন্য আজ আমরা পরাজিত হব না, আমাদের সৈন্যসংখ্যা আজ অনেক"।

ইসলামী সেনাবাহিনীর উপর আকস্মিক আক্রমণঃ

মঙ্গল ও বুধবার পথ চলার পর ১০ ই শাওয়াল মধ্যরাতে মুসলিম বাহিনী হুনাইনে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু মালিক বিন আউফ আগে থেকেই তোর বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায় এরা রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত সংগোপনে তার বাহিনীর বিভিন্ন অংশকে পাহাড়ের গিরিখাদের বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়, মুসলিম বাহিনী আসামাত্র যেন তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করা হয় এবং একযোগে আক্রমণ চালানো হয়।

মুসলিম বাহিনী এসে পৌঁছামাত্রই গিরিপথে অবস্থানকারী শত্রুরা তাদের উপর তীরনিক্ষেপ শুরু করল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দলে দলে শত্রুরা তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। আকস্মিক শত্রুবাহিনীর আক্রমণের প্রচণ্ডতা সামলাতে না পেরে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তারা এমনভাবে দৌড়ে পালাতে লাগল যে কেউ কারো প্রতি লক্ষ্য করল না।

এভাবে যখন মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তখন রাসূল সাঃ চিৎকার করে সাহাবীদের ডাকলেন, "হে লোকেরা, আমার দিকে এসো, আমি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ"। এই সময় কিছুসংখ্যক মুহাজির এবং অ্যানসার ছাড়া রাসূলের সাথে আর কেউ ছিলনা। এই সংকটময় সময়ে রাসূল সাঃ তেজোদ্দীপ্ত বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। মুসলিম বাহিনীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ততায় তিনি ছিলেন অটল-অবিচল এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি শত্রুদের উত্তেজিত করে বলছিলেন-

আমি সত্যই নাবী, মিথ্যা নই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।

এই সময় আবু সুফিয়ান বিন হারিস রাসূলের খচ্চরের লাগাম টেনে ধরে রেখেছিলেন এবং হযরত আব্বাস তাকে ধরে থামিয়ে রেখেছিলেন যাতে খচ্চর দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে না যায়। কারণ খচ্চর দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে গেলে রাসূলের সমূহ বিপদে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

রাসূল সাঃ এর গোত্রীয় পূর্বপুরুষের নাম ধরে ডাকার কারণঃ

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, রাসুল সাঃ বিক্ষিপ্ত সাহাবীগণকে ডাকার জন্য কেন আব্দুল মুত্তালিবের নাম নিয়েছিলেন। কেন তিনি তাদেরকে গোত্রীয় শ্রেষ্টত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন? এর কারণ হল-

* রাসূল সাঃ আব্দুল মুত্তালিবের নাম ধরে তাদের গোত্রীয় চেতনাকে উস্কে দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কোন গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা রাসূল সাঃ এর উদ্দেশ্য ছিল না।

* আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কুরাইশদের অবিসংবাদিত নেতা। মক্কার সকল গোত্র ও উপগোত্রগুলি একবাক্যে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। তাই আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর পরিচয় দিয়ে রাসূল সাঃ তাদেরকে আহ্বান করেছিলেন যেন, তারা যেভাবে আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল এখন সেভাবেই রাসূল সাঃ এর নেতৃত্ব মেনে নিক ও যুদ্ধের ময়দানে ফিরে আসুক।

সাহাবীগণের ফিরে আসা ও প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ শুরুঃ

রাসূল সাঃ তার চাচা হযরত আব্বাসকে নির্দেশ দিলেন, সাহাবীগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডেকে পাঠাতে। হযরত আব্বাস উচ্চ স্বরে বললেন, 'হে বৃক্ষ তলের ব্যক্তিবর্গ, তোমরা কোথায় আছো?' তাঁর কণ্ঠস্বর শোনামাত্র সাহাবীগণ এমনভাবে ফিরে এলো যেমন গাভীর ডাক শুনে বাচ্চুর ফিরে আসে। এই সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে, কোনো ব্যক্তি তার উটকে ফেরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে নিজে লোহার বর্ম নিজের গলায় পরে ঢাল-তলোয়ার সামলে নিয়ে উটের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল এবং উটকে ছেড়ে দিয়ে আব্বাসের চিৎকার অনুসরণ করে দৌড়াতে থাকল। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে রাসূলের চারপাশে ১০০ মুসলিম সৈন্যের সমাবেশ ঘটে গেল। এরপর শুরু হল আনসারদের প্রতি আহ্বান। এই আহ্বান বনু হারিস বিন খাযরাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

এভাবে মুসলিম সৈন্যগণ যে গতিতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেই গতিতে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসলেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। এই অবস্থায় রাসূল সাঃ মাটি থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে শত্রুদের প্রতি নিক্ষেপ করে বললেন, "শাহাতিল উজুহ" অর্থাৎ "মুখমণ্ডল বিকৃত হোক"। রাসূল সাঃ এর নিক্ষিপ্ত ধুলো এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে শত্রুপক্ষের এমন কোন লোক ছিল না যার চোখে মাটি প্রবেশ করেনি। এরপর যুদ্ধের উম্মাদনা স্তিমিত হতে থাকে এবং শত্রুদের পরাজয় নিশ্চিত হতে থাকে। মাটি নিক্ষেপের কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুবাহিনী পরাজিত হয়ে গেল। সাকিফ গোত্রের ৭০ জন কাফির যুদ্ধে নিহত হয়। তাদের সাথে যা কিছু ছিল সমস্ত কিছুই মুসলিমরা গনিমত হিসেবে লাভ করল।

শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনঃ

উভয়পক্ষের মুকাবিলা হওয়ার পর শত্রুদের একটি দল তাইফের পথে চলে যায়। আরেকটি দল নাখলার দিকে এবং তৃতীয় একটি দল আওতাসের দিকে পালিয়ে যায়। রাসূল সাঃ আওতাস এর দিকে পালিয়ে যাওয়া দলকে ধাওয়া করার জন্য আবু আমির আশআরী রাঃ কে পশ্চাদ্ধাবনকারী দলের নেতা হিসেবে পাঠালেন। উভয় দলের মধ্যে সামান্য সংঘর্ষের পর শত্রুরা একেবারেই পালিয়ে গেল। তবে সংঘর্ষে হযরত আবু আমির আশআরী রাঃ শহীদ হয়ে যান। মুসলিমদের একটি দলকে নাখলার দিকে পালিয়ে যাওয়া মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন

করতে পাঠানো হয় এবং এই বাহিনী দুরাইদ বিন সিম্মাহকে পাকড়াও করে। হযরত রাবিয়া বিন রাফি রাঃ তাকে হত্যা করেন। মুশরিকদের তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় দল তাইফের দিকে পালিয়ে যায়। রাসূল সাঃ গনিমতের সম্পদ জমা করেন এবং তাইফের অভিমুখে নতুন করে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। তাইফ জয় করার পূর্বে তিনি গনিমতের মাল বন্টণ করা পছন্দ করলেন না।

গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদঃ

।

হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের মালের মধ্যে ছিল প্রায় ৬০০০ বন্দী, ২৪ হাজারের বেশি উট, ৪০ হাজারেরও বেশি বকরি এবং প্রায় ৪০০০ উকিয়া স্বর্ণ যার তৎকালীন মূল্য ছিল এক লক্ষ ৬০ হাজার দিরহাম।

হুনাইন যুদ্ধের কিছু টুকরো ঘটনাঃ

রাসূল সাঃ এর দুধবোন শায়মা ও দুধ-মা হালিমার সাথে সাক্ষাৎ

শায়মা বিনতে আল হারিস ছিলেন হালিমা-র কন্যা এবং রাসূল সাঃ এর দুধবোন। তিনি শায়মাকে দুটির একটি বেছে নিতে বললেন-

* ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল সাঃ ও মুসলিমদের সাথে সম্মানের সাথে থাকবে অথবা

* নিজ গোত্রের কাছে সসম্মানে ফিরে যাবে।

শায়মা পরেরটি বেছে নিলেন। রাসূল সাঃ তাকে একজন দাসী, তিনজন দাস, বেশকিছু উট আর ভেড়া উপহার দিয়ে নিজ গোত্রের কাছে ফেরত পাঠালেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা নিশ্চিত নয়।

উম্মে সুলাইম রাঃ এর সাহসিকতাঃ

উম্মে সুলাইম রাঃ ছিলেন আনসারী সাহাবী আবু তালহার স্ত্রী। যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে দেখা গেল একটা ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর স্বামী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী?" তিনি বললেন, "কোন কাফের আমার কাছে দিয়ে গেলে আমি তার পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলব”। একথা শুনে রাসূল সাঃ হেসে ফেললেন। উম্মে সুলাইম রাঃ বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনাকে ফেলে পালিয়ে যাওয়া 'তুলাকা'দের (মক্কা বিজয়ের পর যেসকল নও মুসলিম হুনাইনে গিয়েছিলেন তাদের বলা হত- তুলাকা) আমি হত্যা করব"। রাসুল সাঃ তখন তাকে শান্ত করে বললেন, "মহান আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট” (অর্থাৎ তুমি চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের বিজয় দিয়েছেন। তাদের হত্যা করার কোন প্রয়োজন নেই) হুনাইন যুদ্ধের সময় উম্মে সুলাইম ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। তালহা রাঃ তখন তাঁর গর্ভে।

দুরাইদ বিন সিম্মাহ-র মৃত্যুঃ

রাবিয়া ইবনে রাফি নামে এক সাহাবী দুরাইদকে পালাবার সময় ধরে ফেললেন।, রাবিয়া নিজেও হাওয়াজিন গোত্রের ছিল। কিন্তু পার্থক্য হলো তিনি ছিলেন মুসলিম আর দুরাইদ ছিল কাফের। শেষ পর্যন্ত রাবিয়া রাঃ তাকে তার কথামতই আঘাত করে হত্যা করলেন।

তাবুকের যুদ্ধঃ পটভূমি ও যুদ্ধ প্রস্তুতি

মক্কা বিজয়ের দীর্ঘ সফর শেষে রাসুল সাঃ মদিনায় ফিরে দীর্ঘদিন অবস্থান করলেন। এই সময়ে তিনি মদিনায় আসা বিভিন্ন প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। দ্বীনের দা'ঈ গনকে বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াতের জন্য পাঠাতে থাকেন। বিভিন্ন গোত্রের জন্য যাকাত আদায়ের কর্মচারী নির্ধারণ করেন এবং ছোটখাটো কিছু অভিযান তিনি প্রেরণ করেন। কোন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল সাঃ তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করতেন। কারণ, নওমুসলিমদের জন্য ইসলামী আক্বীদা ও আমল বিশেষভাবে শেখা অত্যন্ত জরুরি।

৯ম হিজরীর মুহাররম মাসের শুরু থেকে রাসুল সাঃ বিভিন্ন গোত্রের কাছে সাদাকা ও যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে কর্মচারী প্রেরণ করেন। ো বিভিন্ন গোত্রের কাছে তিনি সাহাবীদেরকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

তাবুক যুদ্ধ

কারণ ও প্রেক্ষাপটঃ

মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর এক বছর না যেতেই রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসী, রোমের অধীনস্থ গোত্রগুলো অর্থাৎ অন্যান্য গোত্রের সৈন্য সমাবেশের কাজ শুরু করে দিল। মুসলিমদের সাথে এক চূড়ান্ত ফয়সালা কারীর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলো।

মুসলিম শিবিরে যুদ্ধের সংবাদঃ

সিরিয়া থেকে আগমনকারী তেলবাহী দলের মাধ্যমে জানা গেল রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ৪০ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে এক বিশাল ও শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেছে। এই খবর শোনার পর মদিনার মুসলিম সমাজে আতঙ্কের শিহরন বয়ে গেল।

মুনাফিকদল কর্তৃক মসজিদে দ্বিরার নির্মাণঃ

মুসলিমদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কূটকৌশল করার উদ্দেশ্যে তারা মসজিদের আকার-আকৃতিতে একটি আড্ডাখানা তৈরি করল। তাদের এই অসৎ উদ্দেশ্য ঢেকে রাখার জন্য কৌশলে তারা তাদের আড্ডাখানাকে 'মসজিদে দ্বিরার' নাম দিয়ে সেখানে সালাত আদায়ের জন্য রাসূলকে

অনুরোধ জানালো। তারা ভেবেছিল, রাসূলকে সালাত আদায়ের অনুরোধ করার মাধ্যমে মুসলিমরা বুঝতে পারবে না যে তারা কি গভীর ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র তৈরি করছে! তাছাড়া এই মসজিদে যাতায়াতকারীদের ব্যাপারে যেন ঘুণাক্ষরেও অমুসলিমদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি না হয়- এটাও ছিল অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। রাসূল সাঃ মসজিদে সালাত আদায় করার বিষয়টি যুদ্ধ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। কারণ, যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য তাকে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধ থেকে ফেরার পূর্বেই আল্লাহ আয়াত নাজিল করে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র উন্মোচন করে দিলেন। কাজেই, রাসুল সাঃ যুদ্ধ থেকে ফেরার পর এই মসজিদে সালাত আদায় না করে তা বিধ্বস্ত করে দেন।

যুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতিঃ

এই সময়টা ছিল অত্যন্ত গরম। মানুষ ছিল অসচ্ছল এবং দুর্ভিক্ষের কারণে যানবাহনের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। বাগবাগিচা ফলমূলে কেবল পরিপক্কতার সময় এসেছিল। ফল সংগ্রহ এবং ছায়ার জন্য বাগবাগিচার কাছাকাছি অবস্থান করা ছিল মানুষের কাছে অধিক পছন্দনীয়। এইসব কারণে তাৎক্ষনিক যুদ্ধযাত্রার জন্য মুসলিমগণ মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। এছাড়াও তাবুকের অবস্থান ছিল মদীনা থেকে ৭৭৮ মাইল দূরত্বে। এত বিশাল পথের দূরত্ব এবং দুর্গমতা তাদের মনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সবমিলিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধের জন্যওনা দেওয়া ছিল মুসলিমদের জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত।

মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধযাত্রার জন্য রাসূলের নির্দেশঃ

এমন এক পরিস্থিতিতে রাসুল সাঃ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই মুহূর্তে যদি রোমানদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো গড়িমশি করা হয় কিংবা রোমানরা অগ্রসর হয়ে মদিনার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয় তবে তা মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হবে এক বিশাল

হুমকি। আর এটা হবে ইসলামী দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারের জন্য ক্ষতিকর ও অবমাননাকর। পেছনে থাকবে মুনাফিক শত্রুদল আর সামনের দিক থেকে বিধর্মী রোমক সৈন্যদল। এমনিভাবে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসার কল্পে এতদিনে রাসুল সাঃ ও সাহাবাদের সকল প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থতায় পরিণত হয়ে যাবে। তাই রাসূল সাঃ রোমকদেরকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রবেশ তো দূরের কথা, এর সীমানায় প্রবেশের সুযোগ না দেয়ার কথা চিন্তা করলেন। এজন্য তিনি রোমকদের সাথে এক চূড়ান্ত ফয়সালা করে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং সাহাবীদের মাঝে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ ঘোষণা করলেন। এছাড়াও মক্কার বিভিন্ন গোত্র এবং অধিবাসীদের নিকট রাসুল সাঃ সংবাদ পাঠালেন, রোমানদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করার জন্য।

এই সময়ে সাহাবিদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে সূরা তাওবার একটি অংশ অবতীর্ণ হয় এবং জিহাদের জন্য বেশি বেশি অর্থ ব্যয় করতে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।

মুসলিমদের যুদ্ধ প্রস্তুতিঃ

রাসুলের যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোষণার সাথে সাথে বিভিন্ন গোত্র এবং মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা মদিনায় আসতে শুরু করলেন। একমাত্র মুনাফিকরা ব্যতীত এই যুদ্ধে বিরত থাকার কথা কারো মনে আসেনি। তবে তিনজন নিষ্ঠাবান মুসলিম এর বাইরে ছিলেন। একনিষ্ঠ ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও তারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

গরীব অসহায় ব্যক্তিবর্গ রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করা হলে তারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন। রাসুল সাঃ তখন তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন'। সূরা তাওবা ৯২ নং আয়াত নাজিল হয় যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য মুসলিমদের মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। দান-সাদাকা কে কত বেশি করতে পারে তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে।

অন্যান্য সাহাবীগণ নিজেদের সাধ্যমত যা পারেন তাই নিয়ে এসে দান করতে থাকেন। কেউ কেউ এক মুঠো, কেউ দুই মুঠো করে যার কাছে যা দ্রব্য ছিল তাই দান করেন। মহিলাগণ

তাদের গলার মালা, হাতের চুড়ি, পায়ের অলংকার, কানের রিং, আংটি ইত্যাদি যা যা ছিল সব কিছু রাসুলের খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

মুনাফিকদের ভূমিকাঃ

মুনাফিকেরা যুদ্ধ প্রস্তুতিতে কোনভাবেই অংশ নেয়নি। শুধু তাই নয়, যে সকল মুসলিম দান-খয়রাতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন তাদেরকে তারা খোঁচা দিতে শুরু করে। তারা বলতে থাকে যে এসকল সাহাবীরা লোক দেখানোর জন্যই এত দান-খয়রাত করছে।

অপরপক্ষে যাদের শ্রম ছাড়া আর কিছুই দেবার মত ছিল না তাদের উদ্দেশ্যে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলল, 'একটা দুটো খেজুর দিয়ে এরা রোমান সাম্রাজ্য জয়ের স্বপ্ন দেখছে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

অর্থঃ সে সমস্ত লোক যারা ভৎসনা-বিদ্রূপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্দ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। **(সূরা তাওবা, ৯:৭৯)**

এছাড়াও মুসলিমদের মনোবল ধ্বংস করার জন্য তারা বলে বেড়াতে থাকে, "এই প্রচণ্ড গরমে তোমরা যুদ্ধযাত্রা করো না'। তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় রাসুল সাঃ জনৈক মুনাফিক জাদ বিন কায়েস কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "জাদ, তুমি কি এই বছর রোমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছ?" সে জবাব দিল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দেবেন নাকি সমস্যায় ফেলে দেবেন? আল্লাহর কসম! আমার গোত্রের প্রতিটি মানুষ জানে যে, আমি নারী আসক্ত। আমি রোমান নারীদের সামনে গেলে নিজেকে সংযত রাখতে পারব না"। তখন রাসূল সাঃ বললেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি”। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন-

অর্থঃ আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শোনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। **(সূরা তাওবা, ৯:৪৯)**

এছাড়াও অনেক মুনাফিক বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে রাসূলের কাছে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাইলে রাসুল তদেরকে অনুমতি দেন। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ এই অনুমতি প্রদানের কারণে রাসূল সাঃ কে সতর্ক করেন। আল্লাহ বলেন-

আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। (সূরা তাওবা, ৯:৪৩)

রাসূল সাঃ জানতে পারেন কিছু লোক সুয়াইলিম নামক এক ইহুদির ঘরে বসে যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। এই সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে রাসুল সাঃ তাদের ঐ ঘর ধ্বংস করে দেওয়ার আদেশ দেন।

মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল।

আল্লাহর রাসুল তাবুক থেকে ফিরে আসার পর মুনাফিকেরা যে তাঁর কাছে শপথ করতে আসবে এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

তাবুকের পথে ইসলামী সেনাবাহিনীঃ

৯ম হিজরীর রজব মাসে রাসূল সাঃ তাবুক অভিমুখে রওনা দেন। পরিবারের লোকজনদের দেখাশোনার জন্য আলী রাঃকে নির্দেশ প্রদান করে তাকে মদীনায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। যাওয়ার সময় নির্দেশ দিয়ে বললেন, "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার সাথে তোমার তেমন সম্পর্ক রয়েছে যেমন ছিল হারুনের সাথে মুসার। তবে এটা জেনে রেখো যে, আমার পরে কোনো নবী আসবে না"।

মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। এই বিশাল বাহিনী এবং সাধ্যমত অর্থ সম্পদ ব্যয় করা সত্ত্বেও সৈন্যদের পুরোপুরি প্রস্তুত করে নেওয়া সম্ভব হয়নি। যানবাহনের যথেষ্ট অভাব ছিল। ১৮ জনের প্রতিটি দলের জন্য মাত্র ১টি করে উট ছিল, যার উপর তারা পর্যায়ক্রমে সওয়ার হতেন। খাওয়ার জন্য প্রায়ই গাছের পাতা ব্যবহার করতে হতো। যার ফলে তাদের ঠোঁট ফুলে গিয়েছিল। উটের অভাব থাকা সত্ত্বেও উট জবেহ করতে হতো যাতে পাকস্থলী এবং নাড়িভুঁড়ির মধ্যে সঞ্চিত পানি পান করা যায়। এই কারণেই এই বাহিনীর নাম রাখা হয়েছিল যা 'জায়শে উসরাত' অর্থ অভাব অনটনের বাহিনী। স্বয়ং আল্লাহ কুরআনে তাবুক অভিযানকে 'সা'আতিল উসরাহ' বা 'কঠিন মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছেন-

لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুনাময়। (সূরা তাওবা, ৯:১১৭)

যাত্রাপথে মুসলিম বাহিনীর 'হিজর' অর্থাৎ সামুদ সম্প্রদায়ের অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। সামুদ জাতি ছিল সেই সম্প্রদায় যারা 'ওয়াদিউল কুরা' উপত্যকার ভেতর পাথর কেটে ঘর বাড়ি তৈরি করেছিল। সাহাবীগণ সেখানকার কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করলে রাসূল সাঃ বললেন, "তোমরা এখানকার পানি পান করো না। এই পানি ওযুর জন্যেও ব্যবহার করো

না। এই পানি দ্বারা যে খামির তৈরি করেছ তা পশুদের খাইয়ে দাও, নিজেরা খেয়ো না"। তিনি এ নির্দেশ দিলেন যে, "হযরত সালেহ আঃ যে উটনী থেকে পানি পান করেছিল, তোমরা সেই কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করবে'।

পথের মধ্যে সৈন্যদের তীব্র পানির প্রয়োজন দেখা দিল। লোকজন পিপাসার কষ্ট সম্পর্কে রাসূলের কাছে অভিযোগ করলে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। সাহাবারা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন এবং প্রয়োজনমতো পানি সংগ্রহ করলেন।

রাসূল সাঃ তাবুকের নিকট পৌঁছে বললেন, "ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা তাবুকের বারনার নিকটে গিয়ে পৌছাবো। রাসুলের নেতৃত্বে মুসলিমগণ 'সানিয়াতুল বিদা' প্রান্তরে একত্রিত হলে সেখানে রাসুল সাঃ সেনাবিন্যাস করেন। সবচেয়ে বড় পতাকা দেওয়া হয় আবু বকর সিদ্দিক রাঃ এর হাতে রাসুল সাঃ আনসারদের প্রতিটি গোত্রকে আলাদা আলাদা নেতার অধীনে সারিবদ্ধ হওয়ার আদেশ দেন। পাহারাদারির দায়িত্ব দেন আব্বাদ বিন বিশর রাঃ কে।

তাবুকের ময়দানে মুসলিম সৈন্যবাহিনীঃ

মুসলিম বাহিনী তাবুক নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। এরপর রাসুল সাঃ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে সারগর্ভ ও উৎসাহ মূলক ভাষণ প্রদান করেন। এবং তার রহমতের শুভ সংবাদ প্রদান করেন। রাসূলের এই ভাষণ সাহাবীদের মধ্যে এক অসাধারণ মানসিক শক্তি সৃষ্টি করে এবং খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতিজনিত যে আশঙ্কা তাদের মনের মধ্যে ছিলো তা পুরোপুরি চলে যায়। মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে রোমান বাহিনী ও তাদের গোত্রগুলির মধ্যে এতটাই ভয় এবং ভীতি ছড়িয়ে পড়ে যে, তারা মুসলিমদের সাথে মোকাবিলা করার সাহস হারিয়ে ফেলে। তারা বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

এ অবস্থা দেখে রোমকদের অধীনে থাকা ক্রীড়নক গোত্রসমূহ পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে পারল। তারা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই তখন মুসলিমদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মুসলিমদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। এভাবে ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃতি লাভ করে রোম সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ফলে রোমকদের শক্তি ও আধিপত্য একদম নিঃশেষ হয়ে গেল।

মদিনায় ফিরে আসাঃ

বড় রকমের কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষ ছাড়াই মুসলিম বাহিনী বিজয়ীর বেশে মদিনায় ফিরে আসেন। পথের মধ্যে এক জায়গায় একটি গিরিপথের কাছে ১২ জন মুনাফিক রাসূলকে হত্যার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালায়। সে সময়ে রাসুল সাঃ গিরিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সাথে ছিলেন শুধু হযরত আম্মার রাঃ। তিনি উটের মুখের লাগাম ধরেছিলেন এবং হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান উটকে সামনে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পেছন দিক থেকে মুনাফিকদের পায়ের শব্দ রাসুল সাঃ শুনতে পান। রাসূল সাঃ হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানকে তাদের দিকে পাঠালেন। তিনি ঢালের সাহায্যে মুনাফিকদের বাহনগুলোর মুখের উপর প্রবলভাবে আঘাত করতে শুরু করলেন। এর ফলে তারা ভীত হয়ে পালিয়ে গেল এবং নিজেদের লোকদের সাথে মিলে গেল। এরপর রাসুল সাঃ তাদের নাম বলে দিলেন এবং তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে দিলেন। এজন্য হুজাইফাকে বলা হয় 'সিররু রাসূল' বা 'রাযদান' অর্থাৎ, রাসূলের গোপনীয়তা রক্ষাকারী। এই ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ নাযিল করেন- সূরা তাওবার ৭৪ নং আয়াত।

রাসূল সাঃ যখন দূর থেকে মদিনার দৃশ্য দেখতে পেলেন তখন তিনি ত্বাবা এবং উহুদ পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করে বললেন, "এগুলো হচ্ছে সেই পাহাড়, যা আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও যাকে ভালোবাসি"। এরপর যখন মদিনায় রাসুল সাঃ মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পৌঁছে গেল তখন মহিলা ও কিশোরেরা ঘর থেকে বের হয়ে এসে রাসূল সাঃ এবং সাহাবীগণকে খোশ আমদেদ জানিয়ে গান গাইতে শুরু করলেন। রাসুল সাঃ রজব মাসের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন এবং রমজান মাসে ফিরে এসেছিলেন। এই সফরে পূর্ণ ৫০

দিন অতিবাহিত হয়েছিল এবং এর মধ্যে ৩০ দিন তাবুক অভিযানের যাত্রাপথে লেগেছিল। এটাই ছিল আল্লাহর রাসূলের জীবনের শেষ যুদ্ধ অভিযান যাতে তিনি স্বশরীরে অংশ নিয়েছিলেন।

যারা যুদ্ধ থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিলঃ

তাবুকের যাত্রায় লেগেছিল অত্যন্ত দীর্ঘপথ, সময়টা ছিল অত্যন্ত কঠিন। এ কারণে তাবুক যুদ্ধ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈমানদার ও মুনাফিকদের পৃথক করার জন্য একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা। মূলত, তাবুক যুদ্ধে উপস্থিত ছিল সকলেই ছিল একনিষ্ঠ মুমিন। তবে তিনজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন ছিল এবং কোনো কারণ ছাড়াই যুদ্ধে শরিক হওয়া থেকে বিরত ছিল। আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত করেন এবং পুনরায় তাদের তওবা কবুল করেন।

তারা হলেন কা'ব বিন মালিক, মুরারা বিন রাবি' এবং হিলাল বিন উমাইয়া রাঃ। তারা সত্যবাদিতা অবলম্বন করলেন এবং রাসূলের কাছে গিয়ে অকপটে স্বীকার করলেন যে, কোনো রকম অসুবিধা কিংবা বৈধ কারণ ছাড়াই তারা যুদ্ধে শরিক হওয়া থেকে বিরত ছিলেন। এই প্রেক্ষিতে রাসুল সাঃ তাদের সাথে কথাবার্তা না বলার জন্য এবং সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য অন্যান্য সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন। যখন বয়কটের সময়সীমা ৫০ দিন পূর্ণ হলো তখন আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন এবং তওবার সুসংবাদ প্রদান করে আয়াত নাযিল করলেন।

যারা অপারগতার কারণে যুদ্ধে শরিক হতে পারেননি, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করলেন-

(সূরা তাওবা, ৯:৯১-৯২)

কা'ব বিন মালিকের ঘটনা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাঃ

১। আল্লাহর সাথে সততা

২। সত্যবাদীদের সঙ্গ গ্রহন করা

৩। যুগে যুগে কাফিরদের একই কর্মকৌশলঃ

আবু বকর রাঃ এর নেতৃত্বে হজ পালনঃ

৯ম হিজরীর যিলক্বদ কিংবা যিলহজ মাসে হজ্জের বিধি-বিধান কায়েম করার উদ্দেশ্যে রাসুল সাঃ আবু বকর রাঃ কে আমিরুল হজ্ব অর্থাৎ হজ্বযাত্রী দলের নেতা হিসেবে মক্কায় পাঠালেন। এরপর সূরা তাওবার প্রথ দিকের কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে মুশরিকদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামা সমতার ভিত্তিতে শেষ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল সাঃ আলী রাঃ কে এই সম্পর্কিত ঘোষণা দেওয়ার জন্য মক্কায় প্রেরণ করেন। যেহেতু রক্ত এবং সম্পদ সংশ্লিষ্ট চুক্তিনামার প্রশ্নে আরবের নিয়ম ছিল যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই ঘোষণা করবে কিংবা পরিবারের কোনো সদস্যের মাধ্যমে তা করানো হবে। পরিবার বহির্ভূত কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে প্রদত্ত ঘোষণা গৃহীত হবে না। তাই আল্লাহর রাসুল আলী রাঃ কে পাঠালেন।

আবু বকর সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে ঘোষণা দিলেন যে, আগামীতে কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না এবং কোন ব্যক্তি নগ্ন হয়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না। এই ঘোষণার মাধ্যমে আরব ভূখণ্ডে মূর্তিপূজার কফিনে শেষ পেরেকটি ঠোকা হয়ে গেল।

সীরাতে নববীর আলোকে একজন আদর্শ নেতৃত্বের গুণাবলী

যোগাযোগ দক্ষতা (Communication skill)

অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতি এবং সুবিবেচনা

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া (Training Methodology)

কথা ও কাজের সামঞ্জস্যতা

অনুসারীদের প্রত্যেককে সমান চোখে দেখা

নিছক অনুসারী নয়, বরং যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা

স্বল্পমেয়াদী/ব্যক্তিগত চিন্তা বাদ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

অনুসারীদের মাঝে পারস্পরিক বিরোধ নিরসন (Conflict Management skill)

আস্থা এবং বিশ্বাস

অনুসারীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা

সাহসিকতা এবং বীরত্ব

শৃঙ্খলা

সীরাতে নববীর আলোকে একজন দা'ঈর কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইখলাস

সর্বপ্রথম যে গুণটি একজন দা'ঈর মাঝে থাকতে হবে তা হলো 'ইখলাস'। অর্থাৎ, দা'ঈ যা কিছু করবে তা শুধু আল্লাহকে রাজিখুশি করার জন্য করবে। দা'ঈর নিয়ত থাকবে, শুধু আল্লাহকে খুশি করা।

উম্মতের দরদঃ

আল্লাহর নবী (সাঃ) এর সিফাত সম্পর্কে হিন্দ ইবনে হালা বলেন, 'নবী (সাঃ) সর্বদা উম্মাহর ফিকির করতেন, উম্মাহর জন্যে দরদ রাখতেন।" উম্মাতের ফিকির আল্লাহপাকের কাছে খুব-ই মাহবুব একটি জিনিস। পূর্ববর্তী উম্মত যারা-ই উম্মতের প্রতি দরদ প্রকাশ করেছেন আল্লাহ তাদের নাম কুর'আনের মাঝে এনেছেন।

আখিরাতের ফিকিরঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি সিফাত সম্পর্কে শামায়েলে তিরমিযীতে হিন্দ ইবনে হালা বর্ণনা দিয়েছিলেন। তা হলো, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন সর্বদা আখিরাতের চিন্তায় চিন্তিত"। আল্লাহর নবী (সাঃ), যাকে জান্নাতবাসী হিসেবে পূর্বেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তিনি আখিরাতে চিন্তা করতেন!

আরামপ্রিয় না হওয়াঃ

একজন দা'ঈ কখনো আরামপ্রিয় হবে না। এটা নবী (সাঃ) এর সুন্নাহ।

অন্যের প্রতি দয়াশীল হওয়াঃ

নবীজি (সাঃ) এর একটি অন্যতম গুণ ছিল, দয়া। একজন দা'ঈ হবেন দয়াবান, অন্যের প্রতি মুহব্বত, ভালোবাসা তাঁর থাকবে। যখন একজন মানুষ দয়াশীল হয় তখন তাঁর জন্যে অন্যকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সহজ হয়ে যায়।

সার্বিক কার্যক্রমে সুন্নাহর অনুসরণঃ

দা'ঈর যে গুণটি নিয়ে আজকে কথা বলবো তা নবী (সাঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত। একজন দা'ঈর কথাবার্তা, চলাফেরা, মানুষের সাথে সাক্ষাৎ অর্থাৎ, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ হবে রাসূল (সাঃ) এর অনুকরণে।

কথা বলার ধরণ হবে সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও মার্জিতঃ

একজন দা'ঈ যখন মাদ'উ বা যাকে দাওয়াত দেয়া হয় সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলবে তখন সে শুধু তার মুখ ওই ব্যক্তির দিকে ফিরিয়ে রাখবে না বরং তাঁর পুরো শরীর তার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলবে। যেন, মাদ'উ বোঝে, আমার সাথে যিনি কথা বলছেন, তিনি আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছেন। এর এটাই ছিলো রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সিফাত।

দৃষ্টির হিফাযতঃ

বৃষ্টি দুই প্রকার, এক হলো সুদৃষ্টি বা ভালো দৃষ্টি, আরেকটি হলো কুদৃষ্টি বা খারাপ দৃষ্টি। কুদৃষ্টি হলো কবিরা গুনাহ। আল্লাহপাক যে দিকে। তাকাতে নিষেধ করেছেন, সেদিকে তাকানো। আর সুদৃষ্টি হলো জায়েজ। একজন দা'ঈর নজর বা দৃষ্টি থাকবে নিচের দিকে।

অপ্রয়োজনীয় কথা নয়ঃ

আজকে আমরা একটি গুণ নিয়ে আলোচনা করবো, তা হলো, দা'ঈর কথাবার্তা। দা'ঈ অপ্রয়োজনীয় কোনো কথাবার্তা বলবে না। দা'ঈ প্রতিটি কথা হিসেব করে বলবে। করতে হবে। অনেকসময় কথার মাধ্যমে গুনাহ হয়ে যায়, মিথ্যা বলা হয়ে যায়, গীবত করা হয়ে যায়, ফ্যাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক রোগ এর মাধ্যমে তৈরি হয়।

নীরবতাঃ

দা'ঈর একটি গুণ হবে সে অধিকাংশ সময়ে চুপ থাকবে। মহানবী (সাঃ) বলতেন, "যে ব্যক্তি চুপ থাকবে সে নাজাত পাবো" নবীজির সিফাত বর্ণনা করতে যেয়ে হিন্দ ইবনে হালা বলেন, "রাসূল (সাঃ) অধিকাংশ সময়ে চুপ থাকতেনা'

আল্লাহর অবাধ্যতাকে প্রশ্রয় না দেওয়াঃ

দা'ঈ অবশ্যই ধৈর্যশীল, দয়াশীল হবে কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করলে সেখানে দা'ঈ কিছুতেই তাঁকে প্রশ্রয় দিবে না। এক্ষেত্রে, রাসূল (সাঃ) যেহেতু আমাদের আদর্শ তাই তাঁকেই আমরা অনুসরণ করবো।

দুনিয়াবী ব্যাপারে রাগান্বিত না হওয়াঃ

রাসূল (সাঃ) দুনিয়াবি কোনো বিষয়ে কখনো রাগান্বিত হতেন না। দ্বীনি বিষয়ে হস্তক্ষেপ হলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হতেন এবং সে বিষয়ের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত তিনি শান্ত হতেন না।

বিদায় হজ্ব ও এর শিক্ষা

রাসুল সাঃ বুঝতে পারছিলেন যে, এই দুনিয়ায় তার মিশন সম্পন্ন হয়েছে। যে শিরকের অস্তিত্ব আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন তার প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই মিশনকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য মৌলিক দিক নির্দেশনাবলী দেওয়া হয়ে গিয়েছে। অচিরেই আল্লাহ তার প্রিয় হাবিবকে নিয়ে যাবেন।

আল্লাহর রাসুল সাঃ ঐতিহাসিক হজ পালনের জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। তখন আরবের মুসলিমগণ দলে দলে সমবেত হতে আরম্ভ করলেন।

এরপর যিলকদ মাসের চার দিন বাকি থাকতে   শনিবার রাসুল সাঃ মক্কা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।   যোহরের সালাত আদায় করে রওনা হয়ে গেলেন। আসরের পূর্বেই ফুল হুলাইফা পৌঁছে সেখানে তিনি আসরের দু রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং সারারাত সেখানে অবস্থান করলেন।

এরপর যোহরের সালাতের পূর্বে রাসূল সাঃ ইহরামের জন্য গোসল করলেন।   যোহরের দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। পরে মুসাল্লায় বসে একই সাথে হজ্জ ও ওমরার তালবিয়া উচ্চারণ করলেন।

রাসুল সাঃ মক্কার নিকটবর্তী স্থান 'যি তুওয়া'য় পৌঁছে যাত্রাবিরতি করলেন। সেখানে রাত্রিযাপন করে, ফজরের সালাত আদায় করে, আবার গোসল করলেন। এরপর সকালে মক্কায় প্রবেশ করলেন। দিনটি ছিল ১০ হিজরীর ৪ঠা যিলহজ্জ রবিবার। মসজিদুল হারামে পৌঁছে রাসূল সাঃ প্রথমে কাবাঘর তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন। এরপর তিনি মাকামে ইব্রাহীমকে সামনে রেখে ২ রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং পুনরায় হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন।

এরপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সা'ঈ করলেন। কিন্তু তিনি ইহরাম খোলেননি। কারণ, তিনি হজ এবং ওমরার ইহরাম একই সাথে বেঁধেছিলেন।

৮-ই যিলহাজ্ব রাসুল সাঃ মিনায় গেলেন। সেখানে ৯ই যিলহজ্জ তারিখ সকাল পর্যন্ত অবস্থান করলেন। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেন। এরপর সূর্যোদয়ের পরে আরাফার দিকে রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে নামিরা প্রান্তরে তাবু স্থাপন করলেন। তিনি বাত্বনে ওয়াদিতে চলে গেলেন। ওই সময়ে রাসুল সাঃ এর সাথে ছিলেন ১,২৪,০০০ কিংবা ১,৪৪,০০০ জনতার ঢল। এই বিশাল জনতার উদ্দেশে তিনি এক ঐতিহাসিক, মর্মস্পর্শী এবং কালজয়ী ভাষণ প্রদান করলেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেনঃ

হে সমবেত লোকেরা, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ, আমি জানি না এরপর আর কোনোদিন তোমাদের সঙ্গে এই স্থানে মিলিত হতে পারব কিনা। তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের ধন-সম্পদ অনাদের জন্য তেমনিভাবে হারাম যেমনটি তোমাদের আজকের দিন, আজকের মাস এবং এই বরকতপূর্ণ শহর হারাম করা হয়েছে। শুনে রাখো, জাহেলিয়াত যুগের সবকিছু আমার পদতলে পিষ্ট হয়ে গেল। জাহেলিয়া যুগের রক্তপাতের সমাপ্তি ঘটলো। আমাদের মধ্যে প্রথম যে রক্ত আমি শেষ করছি তা হচ্ছে রাবিয়া ইবনে হারিসের রক্ত। এই সন্তান বনি সা'দ গোত্রে দুধ পান করছিল, এমন সময়ে হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। অন্ধকার যুগের সুদ শেষ করা হলো। আমাদের মধ্যে প্রথম যে সুদ আমি শেষ করছি তা হচ্ছে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সকল প্রকার সুদ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হলো।

মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। আমি কি তোমাদের তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছি?" সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল সাঃ বললেন, "হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো। যে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিতদের নিকট এই কথাগুলো পৌঁছে দেয়। কারণ, অনুপস্থিতদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকবে, যারা উপস্থিত লোকদের কিছুসংখ্যকের তুলনায় অধিকমাত্রায় দ্বীন সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারবে"।

এরপর রাসুল সাঃ **১১, ১২, ১৩** ই যিলহজ্জ মিনায় অবস্থান করেন। রাসুল আইয়ামে তাশরীকে একটি ভাষণ প্রদান করেন। । রাসূলের আজকের ভাষণও ছিলো কুরবানির দিনের ভাষণের অনুরূপ। এই ভাষণ দেওয়া হয়েছিল সূরা নাসর নাযিল হওয়ার পরে।

১৩ই ফিলহাজ্ব রাসূল সাঃ মীনা থেকে রওনা হয়ে যান এবং ওয়াদীয়ে আবতাহয় খাইফে বনু কিনানাহয় অবস্থান করেন। দিনের অবশিষ্ট সময় সেখানে অতিবাহিত করেন এবং যুহর, আসর, মাগরিব, এশা সেখানেই আদায় করেন। তারপর বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করেন। সকল মানুষ যখন হাজ্বের কার্যাবলী থেকে ফারেগ হয়ে গেল তখন রাসুল সাঃ মদিনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

বিদায় হাজ্জের ভাষণ থেকে শিক্ষাঃ

১। দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয় নিজের ঘর থেকেঃ

যেকোন ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য নিজের ঘর ও পরিবার থেকে শুরু করতে হয়। নিজের ঘরের মধ্যে আদর্শের চর্চা না থাকলে মুখে যতই সেই আদর্শ প্রচার করা হোক না কেন, মানুষের অন্তরে তা প্রভাব ফেলবে না।

২। মুসলিমদের ঐক্যের গুরুত্বঃ

রাসূল সাঃ মুসলিমদের ঐক্যের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছিলেন এই ভাষণে। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে বিদায় হাজ্জের মত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তিনি মুসলিমদের পারস্পরিক ঐক্যের তাগিদ দিয়েছেন।

৩। ন্যায় পরায়ন, মুসলিম শাসকের আনুগত্য বাধ্যতামূলকঃ

রাসূল সাঃ এই ভাষণে বলেছিলেন, যদি বিকলাং কৃষ্ণাঙ্গ দাসকেও নেতা মনোনীত করা হয় এবং সে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা শাসন করে তবে তার আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক।

৪। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি তাকওয়াঃ

রাসূল সাঃ মুসলিমদের মধ্য থেকে বর্ণ বা গোত্রভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের বোধকে মুছে ফেলতে চেয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, এই দ্বীন যারা পালন করবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে।

৫। গুনাহ থেকে সতর্কতা কাম্যঃ

রাসূল সাঃ এই ভাষণে গুনাহ থেকে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। বর্তমানে সচেতন মুসলিমগণ খুব সহজে কুফর কিংবা শির্কে লিপ্ত হয় না কিন্তু গুনাহে খুব সহজেই লিপ্ত হয়ে যায়।

৬। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহ মানবজাতির মুক্তির সংবিধানঃ

রাসূল সাঃ বলেছেন, যতদিন মানুষ কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তারা বিপথগামী হবে না। রাসূল সাঃ এখানে কোন নির্দিষ্ট সময় বা জনগোষ্ঠীর জন্য কুরআন ও সুন্নাহকে নির্ধারণ করেন নি। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ হল সর্বকালের, সর্বযুগের, সকল মানুষের মুক্তির দিশারি ও হিদায়াতের পাথেয়।

৭। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারঃ

রাসূল সাঃ তাঁর ভাষণে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং বিশেষভাবে স্বামীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন স্ত্রীদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে। বিদায় হাজ্বের ভাষণে এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে রাসুল সাঃ ইসলামে নারীদের বিশেষ সম্মান নিশ্চিত করেছেন।

সর্বশেষ সামরিক অভিযানঃ

রোমান সম্রাটের সীমাহীন পক্ষপাতিত্ব এবং অর্থহীন অহংকারের প্রেক্ষিতে রাসুলুল্লাহ **১১**ই হিজরীর সফর মাসে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং উসামা বিন যায়েদ রাঃ কে সেই বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করলেন। বালকা এলাকা এবং দারুমের ফিলিস্তিনি আবাসভূমিকে ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা পদদলিত করার নির্দেশ দিলেন। এর কারণ হল, যাতে রোমানদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়।

এ সময় কিছু সংখ্যক লোক বাহিনী প্রধানের স্বল্পতার কারণে হযরত উসামা রাঃ এর নেতৃত্বের ব্যাপারে আপত্তি জানালেন। তখন রাসূল সাঃ বললেন, " আল্লাহর কসম, যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে যায়েদ ছিল খুবই উপযুক্ত।

এরপর সাহাবীগণ হযরত উসামা রাঃ এর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। যাত্রার এক পর্যায়ে তারা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে ফুরফ নামক স্থানে তাবু স্থাপন করলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর রাসূলের অসুস্থতাজনিত দুশ্চিন্তার কারণে তারা অগ্রযাত্রা স্থগিত করলেন। আল্লাহর মীমাংসার জন্য সেই বাহিনী সেখানে অপেক্ষমান থাকলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাঃ এর খিলাফতের প্রথম সামরিক অভিযান হিসেবে তিনি এই অভিযান সমাপ্ত করেন।

জীবনসায়াহ্নে নবীজি (সা) ও তাঁর ইন্তিকাল

যখন আল্লাহর দ্বীন ও ইসলামের দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করল এবং আরবের সমগ্র নিয়ন্ত্রণ মুসলিমদের আয়ত্তে এসে গেল তখন অস্থায়ী দুনিয়ার অধিবাসীদের বিদায়- সম্ভাষণ জানানোর প্রস্তুতি রাসূল সাঃ নিতে শুরু করেছেন। তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

সাধারণভাবে রমজান মাসের শেষ দশ দিন তিনি ইতেকাফ করতেন। কিন্তু দশম হিজরীর রমযান মাসে তিনি বিশদিন ইতেকাফ করলেন। এছাড়াও এবছর জিবরীল আঃ রাসূলকে দুইবার কুরআন পাঠ করে শুনালেন। এছাড়াও রাসুল সাঃ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন- "আমি জানিনা এই বছরের পরে এই স্থানে তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারব কিনা"। এছাড়াও আইয়ামে তাশরীকের মধ্যদিনে রাসূলের নিকট সূরা নাসর অবতীর্ণ হয় এবং এর মাধ্যমে রাসুল সাঃ উপলব্ধি করেন যে, পৃথিবী থেকে তাঁর যাওয়ার সময় অত্যন্ত সন্নিকটে।

১১ হিজরীর সফর মাসের প্রথমদিকে রাসুলুল্লাহ সাঃ উহুদ প্রান্তরে যান। সেখানে তিনি আল্লাহর কাছে উহুদের শহীদদের জন্য এমনভাবে দোয়া করেন যেন তিনি জীবিত এবং মৃত সকলের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করছেন। এরপর সেখান থেকে ফিরে মসজিদের মিম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে বলেন, "আমি তোমাদের যাত্রীদলের প্রধান এবং তোমাদের উপর সাক্ষী। আল্লাহর কসম, আমি এখন আপন হাউজে কাউসার দেখছি। আমাকে পৃথিবী এবং পৃথিবীর খাজানা সমূহের চাবি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার ভয় হয় না যে, আমার পর তোমরা শিরক করবে। বরং আমার আশংকা হচ্ছে, পৃথিবী সম্পর্কে তোমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে"।

অসুস্থতার সূচনাঃ

১১ হিজরীর ২৯শে সফর, সোমবার, রাসুল সাঃ একটি জানাজার উদ্দেশ্যে বাকি কবরস্থানে গেলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তার মাথাব্যাথা শুরু হয়ে যায় এবং জ্বরের উত্তাপ এতই বৃদ্ধি পায় যে, মাথায় বাধা পট্টির উপর দিয়েও উত্তাপ অনুভূত হতে থাকে। এই অসুস্থতাই ছিল তাঁর ওফাতকালীন রোগের সূচনা। এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১১ দিন পর্যন্ত সালাতে ইমামতি করেন।

জীবনের অন্তিম পর্যায়ঃ

রাসুলের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, "আমি আগামীকাল কোথায় থাকব? আমি আগামীকাল কোথায় থাকব?" তাঁর বিবিগন এই জিজ্ঞাসার কারণ বুঝতে পেরেছিলেন এবং তারা বলেছিলেন, "আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারেন"। তাদের এই কথার প্রেক্ষিতে রাসুল সাঃ আয়েশার গৃহে গমন করলেন। জীবনের শেষ সপ্তাহ তিনি সেখানেই অতিবাহিত করলেন। রাসূলের যন্ত্রণা কিছুটা কমলো এবং তিনি মসজিদে গেলেন। তখন তার মাথায় পট্টি বাধাঁ ছিল। তিনি মিম্বরের উপর উঠে বসলেন এবং সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "ইয়াহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। তারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে"।

এরপর রাসূল সাঃ নিজেকে পেশ করে বললেন, "আমি যদি কারো পিঠে চাবুকের আঘাত করে থাকি তাহলে সে যেন এই পিঠে চাবুক মেরে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়। আর যদি কারো ইজ্জতের উপর কটাক্ষ করে থাকি তাহলে আমি উপস্থিত আছি, সে যেন তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়"। এ কথা বলে রাসুল সাঃ মিম্বর থেকে নিচে নামলেন এবং যোহরের সালাতের ইমামতি করলেন। একজন বললেন, আপনার দায়িত্বে আমার তিন দিরহাম পাওনা আছে। রাসূল সাঃ ফযল ইবনে আব্বাস রাঃ কে বললেন, "তাকে পরিশোধ করে দাও"।

এরপর রাসূল সাঃ আনসারদের সম্পর্কে ওসিয়ত করে বললেন, "আমি তোমাদেরকে আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, তারা ছিল আমার অন্তর এবং কলিজা। তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে। কিন্তু তাদের প্রাপ্য অধিকার অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তাদের মধ্য হতে সৎ লোকদের হতে গ্রহণ করবে এবং খারাপ লোকদের ক্ষমা করবে"।

রাসূল সাঃ এরপর বলেন, "এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা এ অধিকার দিয়েছে যে, সে পৃথিবীর চাকচিক্য এবং জাঁকজমকের মধ্য থেকে যা ইচ্ছে চাইতে পারবেন। আল্লাহ তাকে তা প্রদান করবেন। সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তা গ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে"। হযরত আবু সায়িদ খুদরি রাঃ বর্ণনা করেছেন, "এ কথা শুনে আবু বকর রাঃ কাঁদতে কাঁদতে

বললেন, 'আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক'। তার এ আচরণে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। লোকেরা বলল, 'এই বুড়োকে দেখো, রাসূল সাঃ তো একজন বান্দা সম্পর্কে কথা বলছেন। অথচ, এই বুড়ো বলছেন যে, আমার আপন পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক'। কিন্তু কয়েকদিন পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল, যে বান্দাকে সে অধিকার দেয়া হয়েছিল, তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাঃ। সেদিম এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আবুবকর রাঃ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি"।

এরপর রাসূল সাঃ বললেন, "বন্ধুত্ব এবং ধন-সম্পদের ত্যাগ স্বীকারে আমার উপর সর্বাধিক দাক্ষিণ্যের মালিক ছিলেন আবু বকর। মসজিদের কোনো দরজা অবশিষ্ট রাখা হবে না বরং তা অবশ্যই বন্ধ করে দেয়া হবে, একমাত্র আবু বকরের দরজা ছাড়া"।

ইন্তিকালের চারদিন পূর্বেঃ (বৃহস্পতিবার]

ইন্তিকালের চারদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার, পুনরায় রাসুলের রোগযন্ত্রণা বেড়ে গেল। তিনি বললেন, "তোমরা আমার নিকট কাগজ-কলম নিয়ে এসো। আমি তোমাদের জন্য একটি লেখা লিখে দেই যাতে তোমরা আমার মৃত্যুর পরে কোনোদিন পথভ্রষ্ট না হও"। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উমার রাঃ বললেন, 'আপনি অসুখে খুব কষ্ট পাচ্ছেন এবং আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব রয়েছে। আল্লাহর কিতাব কুরআন আমাদের জন্য যথেষ্ট'। এই নিয়ে ঘরে উপস্থিত সাহাবাদের মাঝে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ বললেন, কাগজ আনা হোক এবং রাসূল সাঃ যা বলবেন তা লিখে দেওয়া হোক। অন্যেরা এই মত সমর্থন করলেন না। লোকজনদের মধ্যে যখন বিতর্ক চলতে লাগল তখন রাসূল সাঃ রাগান্বিত হয়ে বললেন, "আমার নিকট থেকে তোমরা উঠে যাও”।

কঠিন অসুস্থতা সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল মৃত্যুর চারদিন আগ পর্যন্ত ইমামতি করলেন। সেদিনের মাগরিবের সালাতেও তিনি ইমামতি করলেন এবং সেই সালাতে সূরা মুরসালাত পাঠ করলেন।

কিন্তু এশার সালাতের সময় তার অসুস্থতা এতই বেড়ে গেল যে, মসজিদে যাওয়ার মত সামর্থ্য তিনি হারিয়ে ফেললেন। অবশেষে তিনি আবু বকর রাঃ কে সালাতে ইমামতি করার জন্য বললেন। রাসূলের কথার প্রেক্ষিতে তাঁর অসুস্থতার দিনগুলোতে হযরত আবু বকর রাঃ ইমামতি করলেন। রাসুলের জীবদ্দশায় আবু বকর রাঃ এর ইমামতিতে ১৭ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাসূল সাঃ এর এই কথার মাঝে আবু বকর রাঃ কে ১ম খলিফা হিসেবে নির্ধারণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। রাসূল সাঃ স্পষ্টভাবে আবু বকরের নাম খলিফা হিসেবে উচ্চারণ করেন নি কারণ, এতে প্রত্যেক খলিফার জন্য পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ত। কিন্তু রাসূল সাঃ চেয়েছিলেন খলিফা নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি খোলা রাখতে। এর বাস্তব উপকারিতা দেখা গিয়েছিল খুলাফায়ে রাশেদার প্রত্যেকের খলিফা হিসেবে নির্ধারণের সময়।

ইন্তেকালের তিন দিন পূর্বেঃ (শুক্রবার।

জাবির রাঃ বলেন, "আমি রাসূল সাঃ কে তার ইন্তেকালের তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, "তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা না নিয়ে মৃত্যুবরণ না করে"।

ইন্তেকালের দুদিন পূর্বেঃ [শনিবার]

শনিবার কিংবা রবিবারে রাসুল সাঃ কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন। কাজেই তিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে যোহর সালাতের জন্য মসজিদে আসেন। ঐসময় সাহাবীগণ সালাত আদায় করছিলেন, সালাতের জামাতে ইমামতি করেছিলেন আবু বকর রাঃ। তিনি রাসুলের আগমনের আভাস পেয়ে পিছনের সারিতে আসার চেষ্টা করলে রাসূল সাঃ তাকে ইশারায় সালাত আদায়

চালিয়ে যেতে বললেন এবং নিজেকে আবু বকরের ডান পাশে বসিয়ে দেয়ার জন্য বললেন। আবু বকর রাঃ এর ডানপাশে তাকে বসিয়ে দেয়া হলে আবু বকর রাঃ রাসূলের অনুসরণ করেছিলেন এবং সাহাবীগণ আবু বকরকে অনুসরণ করেছিলেন।

ইন্তেকালের একদিন পূর্বেঃ । রবিবার।

একদিন আগে রবিবারে তিনি তাঁর সমস্ত দাস দাসীদের মুক্ত করে দিলেন। তার নিকট তখন সাতটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, যা তিনি সদকা করে দিলেন। তার অস্ত্রগুলোকে মুসলিমদের মাঝে দান করে দিলেন। রাতের বেলা গৃহে বাতি জ্বালানোর জন্য আয়েশা রাঃ প্রতিবেশিদের নিকট থেকে তেল ধার করে আনলেন। রাসূলের একটি লৌহবর্ম এক ইহুদির নিকট ৭৫ কেজি যবের পরিবর্তে বন্ধক রাখা ছিল। সেসময় রাসূল সাঃ এর বাড়িতে একটি ছোট্ট কাপে সামান্য কিছু ময়দা ছিল। আয়েশা রাঃ বলেন, "রাসূল সাঃ এর ইন্তিকালের সময় আমার ঘরে একটি ছোট্ট কাপে সামান্য কিছু ময়দা ছিল। আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেই ময়দা ব্যবহার করতাম। একসময় আমার মনে হল এই ময়দা কখনই শেষ হবে না। তখন আমি তা পরিমাপ করলাম এবং দ্রুতই তা ফুতিয়ে গেল"।

পবিত্রতম জীবনের সর্বশেষ দিনঃ সোমবার]

হযরত আনাস রাঃ বর্ণনা করেছেন, সোমবার দিন ফজরের ওয়াক্তে আবু বকরের ইমামতিতে সাহাবায়ে কেরাম যখন সালাতরত ছিলেন তখন রাসূল সাঃ তার ঘরের পর্দা সরিয়ে সাহাবীগণের দিকে তাকালেন। এরপর মৃদু হাসলেন। আবু বকর রাঃ কিছুটা পিছনে সরে গেলেন এবং কাতারে শামিল হয়ে গেলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, রাসুল সাঃ হয়তো সালাতে শরিক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। হঠাৎ করে রাসূল সাঃ কে দেখে সাহাবীগণ এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তারা সালাত ভেঙে দেওয়ার উপক্রম করলেন। কিন্তু রাসুল

সাঃ হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং ঘরের ভিতরে গিয়ে পর্দা নামিয়ে দিলেন।

এরপর রাসূল সাঃ আর কোনো ওয়াক্তের সালাতের জামাতে শরিক হতে পারেননি। সকাল গড়িয়ে যখন চাশতের সময় হল তখন রাসূল সাঃ তাঁর কন্যা ফাতিমার কানে কিছু কথা বললেন। পিতার কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি আবারও ফাতিমার কানে কানে কিছু কথা বললেন। পিতার কথায় এবারে তিনি হাসতে লাগলেন।

ফাতিমা রাঃ বলেছিলেন, "রাসুল সাঃ আমাকে প্রথমবার কানে কানে বললেন যে, এই অসুখেই আমার ইন্তিকাল ঘটবে, যা শুনে আমি কাঁদলাম। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে কানে কানে বললেন যে, রাসূল সাঃ এর পরিবারের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম আমি তার সাথে মিলিত হব, এই কারণে আমি হাসলাম"। "। এই সময়ে রাসূল সাঃ যে কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা দেখে ফাতিমা কোনো চিন্তাভাবনা না করে চিৎকার করে উঠলেন, 'হায় আব্বাজানের কষ্ট। একথা শুনে রাসুল সাঃ বললেন, "আজকের পরে তোমার আব্বার আর কোনো কষ্ট নেই"।

রাসুল সাঃ হাসান ও হুসাইন রাঃ কে চুম্বন করলেন এবং তাদের সম্পর্কে ভাল উপদেশ দিলেন। সহধর্মিনীদের ডাকলেন এবং তাদেরকে কল্যাণের নসিহত করলেন। এদিকে প্রত্যেক মুহূর্তে রাসুলের যন্ত্রনা বাড়তে শুরু করল। বিষের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল, যা তাকে খাইবারে দেয়া হয়েছিল।

পেরেশানি বেড়ে গেলে তাঁর চেহারা মুবারক চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। "। এরপর সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "আস্ সালাত, আস্ সালাত ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম"। অর্থঃ "সালাত, সালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসী"। এই শব্দগুলো রাসুল সাঃ বারবার বলতে থাকলেন। এটিই ছিল মানুষের উদ্দেশ্যে রাসূল সাঃ এর সর্বশেষ নসীহত।

অব্যাহত মৃত্যু যন্ত্রণাঃ

রাসুলের চূড়ান্ত মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলে আয়েশা রাঃ রাসূলকে নিজ দেহের উপর ভর করেই স্থির হয়ে রইলেন। হযরত আয়েশা রাঃ বলেছেন, "আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হচ্ছে, রাসুল সাঃ আমার ঘরে, আমার বিছানায়, আমার গৃহে, আমার বুকের মাঝে। মৃত্যুবরণ করেছেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাঃ রাসূলের নিকট আসলেন। তার হাতে ছিল মিসওয়াক। এসময়ে রাসূল সাঃ আয়েশা রাঃ এর বুকের ওপর হেলান দিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসুল সেই মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করে অস্থির হয়ে গেলেন। আয়েশা রাঃ বুঝে নিলেন যে, রাসূল সাঃ মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। এরপর আয়েশা রাঃ একটি মেসওয়াক দাঁত দিয়ে নরম করে রাসূলকে দিলেন এবং রাসূল সাঃ খুব সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন। রাসূলের সামনে ছিল একটি পানির পাত্র। তিনি হাত ভিজিয়ে মুখ মুহতে মুহতে বলছিলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মৃত্যুযন্ত্রণা একটি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার"।

এই সময় উসামা বিন যায়েদ রাসূল সাঃ কে দেখার জন্য ঘরে আসলেন। কিন্তু রাসূল সাঃ তখন কথা বলতেও পারছিলেন না। তিনি আঙ্গুল আকাশের দিকে উঁচু করে এরপর উসামার দিকে ফেরালেন। মনে হচ্ছিল যেন তিনি উসামার জন্য দূয়া করলেন।

মেসওয়াক করা শেষ হলে রাসুল সাঃ হাত অথবা আঙ্গুল উত্তোলন করলেন। ছাদের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বললেন। তার ঠোট দুটি নড়ে উঠলো। আয়েশা রাঃ কান পেতে শুনছিলেন। এসময় রাসুল সাঃ বলছিলেন, "হে আল্লাহ, নবীগণ, সিদ্দিক, শহীদগণ, এবং সৎ ব্যক্তিগণ যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, আমাকে তাদের দলভুক্ত করো। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি অনুগ্রহ করো। হে আল্লাহ আমাকে 'রফিকে আলায় পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ রাফিকে আলা।"

রাসূল সাঃ এই কথাটি তিনবার বললেন। এরপরই তাঁর রুহ এই নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে চিরস্থায়ী আখিরাতের দুনিয়ায় যাত্রা শুরু করল। এই মহান মানুষ এবং সর্বকালের সর্বযুগের

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এই দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এই দিনটি ছিল **১১**ই হিজরীর **১২**ই রবিউল আউয়াল, সোমবার- সূর্য হেলে যাওয়ার ঠিক পরেই। এই সময় রাসুলের বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর ৪ দিন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আনাস রাঃ বর্ণনা করেছেন, "রাসুল সাঃ যেদিন আমাদের নিকট আগমন করেছিলেন, সেই দিনের মতো উজ্জ্বলতা মদিনায় কখনো দেখিনি। আর যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, সেই দিনের মত এত অন্ধকার দিন আর কখনো দেখিনি"।

উমার রাঃ এর অবস্থাঃ

আল্লাহর রাসুলের ইন্তিকালের সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেলে উমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তার হুঁশ বুদ্ধি সাময়িকভাবে লোপ পেয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, "কিছুসংখ্যক মুনাফিক মনে করছে, আল্লাহর রাসুল মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু আসল   বলা হতো যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহর কসম, রাসুলুল্লাহ ফিরে আসবেন। আর ঐ সকল লোকের হাত পা কেটে দেবেন, যারা মনে করে যে প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে"।

আবু বকর রাঃ এর বিচক্ষণ জবাব ও নেতৃত্বঃ

আল্লাহ রাসুলের ইন্তেকালের খবর পেয়ে আবুবকর নিজ বাড়ি সুনহ থেকে ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে নববীতে আসলেন। এরপর মানুষের সাথে কোনো কথাবার্তা না বলে সরাসরি আয়েশার ঘরে চলে গেলেন। রাসুলের দেহ মোবারক তখনও ইয়ামানী চাদরে ঢাকা ছিল। আবু বকর রাসূলের পবিত্র মুখ থেকে চাদর সরিয়ে তাতে চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। এরপর বললেন, "আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আল্লাহ আপনার জন্য দু'বার মৃত্যু দেবেন না। যে মৃত্যু আপনার ভাগ্যে ছিল তা এসে গেছে"।

এরপর তিনি সেখান থেকে বাইরে বের হয়ে আসলেন। আবুবকর রাঃ উমর রাঃকে বললেন, 'উমার, বসো'। কিন্তু উমার রাঃ বসতে অস্বীকার করলেন।

আবু বকর রাঃ বললেন, "আল্লাহর রাসূলের প্রস্থানের পর তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদের পূজা করছিল, তারা জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করছিল, তারা জেনে রাখুক, আল্লাহ সর্বদা জীবিত। তিনি কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না"। এরপর তিনি এই আয়াতটি (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪৪)তিলাওয়াত করলেন-

যে সাহাবায়ে কেরাম এতক্ষণ সীমাহীন দুঃখ বেদনায় কাতর হয়ে গিয়েছিলেন, আবু বকরের এই ভাষণ শোনার পর তারা নিশ্চিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ প্রকৃতই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

সাইয়্যেদ বিন মুসাইব রাঃ বলেছেন, 'উমার রাঃ বলেছেন, আল্লাহর কসম, আমি যখন আবু বকরকে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতে শুনলাম, তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করলাম।

রাসুল সাঃ এর ইন্তিকালের মুহূর্তে এই আয়াত উপস্থাপন করা আবু বকর সিদ্দিক রাঃ এর বীরত্ব, সাহসিকতা এবং নেতৃত্বগুণের এক অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ। মূলত নেতৃত্বের যোগ্যতা পরীক্ষিত হয় বিপদের মুহূর্তে আর রাসুলের ইন্তেকাল এর চেয়ে ভয়াবহ বিপদ এই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কখনোই আসা সম্ভব নয়। তখন আবু বকর সিদ্দিক রাঃ সবার সামনে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

খলিফা নির্বাচন ও কাফন-দাফনঃ

রাসুলের কাফন দাফনের পূর্বে রাসুলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। সাকীফা বনু সাঈদায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে আলোচনা চলতে

লাগল। অবশেষে আবু বকর রাঃ এর খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হল এবং রাত চলে আসলো। এই অবস্থায় সোমবার দিবাগত রাত অতিবাহিত হলো, মঙ্গলবার সকাল চলে আসলো। এই সময় পর্যন্ত রাসুলের দেহ একটি চাদরে আবৃত অবস্থায় ছিল। ঘরের মানুষেরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ রেখেছিল।।

মঙ্গলবার দিন রাসূলকে কাপড়সহ গোসল দেয়া হলো। গোসল দেওয়ার কাজে অংশ নিলেন হযরত আব্বাস, হযরত আলী, হযরত আব্বাসের দুই পুত্র ফযল ও কুসাম এবং রাসূলের আজাদকৃত দাস শুরুরান, হযরত উসামা বিন যায়েদ ও আওস ইবনে খাওলা রাঃ।

রাসূলকে তিনবার বরইপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দেয়ানো হয়। কুবায় অবস্থিত সাদ বিন খায়সামা রাঃ এর 'গারস' নামক কূপের পানি দিয়ে গোসল দেওয়া হয়। রাসুল সাঃ এই কূপের পানি পান করতেন। গোসলের পর তিনটি সাদা চাদর দিয়ে রাসুলের কাফনের ব্যবস্থা করা হয়। এসবের মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না।

রাসুলের অন্তিম শয্যার স্থান সম্পর্কে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন আবুবকর রাঃ বললেন, "আমি রাসূল সাঃ কে বলতে শুনেছি, এমন কোনো নবীকে পৃথিবী থেকে উঠানো হয়নি যাকে সেই স্থানে দাফন করা হয়নি যেখানে তার মৃত্যু হয়েছে"। এরপর যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেই বিছানার নিচে কবর খনন করা হলো।

সাহাবীগণ পালাক্রমে দশজন দশজন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযার সালাত আদায় করলেন। নির্ধারিত কোনো ইমামের ব্যবস্থা ছিলনা। মঙ্গলবার দিন পুরোটাই অতিবাহিত হয়ে যায় জানাযার সালাত আদায়ে। মঙ্গলবার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বুধবার রাতের মধ্যভাগে রাসূল সাঃ এর দেহ মোবারক কবরস্থ করা হয়।

রাসূল সাঃ এর দাফনের সময় ফাতিমা রাঃ আবেগাপ্লুত হয়ে আরও বলেন, "হে মানুষেরা! তোমাদের আত্মা কীভাবে স্থির আছে যখন তোমরা আল্লাহর রাসূলের উপর মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছ"? (সহীহ বুখারি)

আনাস ইবনে মালিক রাঃ বলেন, "আমরা আল্লাহর রাসূল সাঃ কে দাফন করতে নিজেরা স্বশরীরে অংশ নিয়েছিলাম। রাসূল সাঃ কে দাফন করে আমরা তখনও হাত মুছিনি কিন্তু আমরা আমাদের অন্তরে পরিবর্তন অনুভব করছিলাম"।

তথ্যসূত্র

1. আর রাহীকুল মাখতুম
2. সিরাতে মোহাম্মাদ
3. সিরাতের কাননে
4. IOM এর সীরাত এর পিডিএফ
5. সামায়েলে তিরমিজি